মেঘে মাটিতে মাখামাখি

সমরেশ মজুমদার

bengaliboi.com

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.bengaliboi.com
Click here

মেঘে মাটিতে মাখামাখি

সমরেশ মজুমদার

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মেঘে মাটিতে মাখামাখি

এরকম পাজির পা-ঝাড়া মহিলা জীবনে দ্যাখেনি সপ্তম। প্রায় তিন ঘণ্টা রিসেপশনে বসিয়ে রেখে জানিয়ে দিল বিছানা থেকে উঠতে পারছে না, মাইগ্রেনের যন্ত্রণা একটুও কমছে না। যে খবরটা জানাতে এল সে তিন ঘণ্টা আগেও বলেছিল, 'ম্যাডামের মাইগ্রেনের পেইন হচ্ছে, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, কমলেই ডেকে পাঠাবেন।'

মাইগ্রেন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই সপ্তমের। মাথা তারও ধরে এবং দুটো ডিসপ্রিন খেলেই কমে যায়। কিন্তু ধর্মতলা এলাকার প্রায় দু-তারা হোটেলের মালিকানের যদি অল্পে না কমে তাহলে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। সুভাষদা বলেছিলেন, শোনো সপ্তম, কখনও মেজাজ হারাবে না। এখন পৃথিবীটা আর রাগী লোকদের পকেটে নেই। কেউ যদি তোমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলে গালাগাল দেয় তাহলে ফিক্ করে হাসবে। দেখো লোকটা খুব ঘাবড়ে গিয়ে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করবে। তাকে বুঝিয়ে বলবে যে তিনি ঐতিহাসিক ভুল করলেন। যে কোনও মানুষই হল বনমানুষের বাচ্চা। শুয়োরের নয়। ওর মত জ্ঞানী লোক এইরকম ভুল করলেন শুনে তুমি হেসেছিলে। দেখবে নেক্সট মিটিংয়ে তোমার কাজটা আটকে থাকবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, সুভাষদা হলেন সপ্তমের গাইড, ফিলজফার এবং বাকি যা আছে সব। ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করার পর যখন সে এম এ পড়া অর্থহীন মনে করে চাকরির ধান্দায় ঘুরে ঘুরে হতাশ তখন পাড়ার একজনের সঙ্গে সুভাষদার কাছে পৌঁছেছিল। সুভাষদা বলেছিলেন ব্যবসা করতে। ক্যাপিটাল লাগে না এমন ব্যবসা। যেমন, ইনস্যুরেন্স-এর এজেন্সি। ওঁর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথমে আত্মীয়স্বজন, পরে পাড়ার একজনের সঙ্গে একটা কেশ পেয়েছিল তারপর আবার হতাশা। যার কাছেই সে যায় তারই ইনস্যুরেন্স আছে। কেউ বলে, দূর মশাই, পনের বছর ধরে প্রিমিয়াম দেওয়ার ধৈর্য আমার নেই। তখন মাথায় এল শেয়ারবাজারের কথা। সুভাষদাই আলাপ করিয়ে দিলেন জ্যোতি দত্তের সঙ্গে। শেয়ারবাজার গুলে খেয়েছে লোকটা। আজ দশ হাজারের অমুক কোম্পানির শেয়ার কিনে পরশু বিক্রি করলে এগার হাজার পাওয়া গেলে আটচল্লিশ ঘণ্টায় টেন পার্সেন্ট প্রফিট যা কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যবসা দেবে না। সপ্তম লক্ষ্য করল মাস খানেকের মধ্যে সে এরকম কুড়িজন ক্লায়েন্ট জোগাড় করে জ্যোতি দত্তের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছে। জ্যোতি দত্তই তাকে পাঠিয়েছিল ধর্মতলার এই হোটেলে। এর মালিকান একজন সিন্ধি মহিলা যিনি শেয়ার বাজার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। নিজে না গিয়ে সপ্তমকে পাঠাবার কারণ জ্যোতি দত্তের টাক। ভদ্রমহিলা নাকি টাকওয়ালা কোনও লোককে সহ্য করতে পারেন না। ওর হোটেলের কোনও কর্মচারীর যদি চাকরি করতে করতে টাক পড়ে তাহলে তাকে পরচুলা কিনে মাথায় লাগাতে হয়। তিন তিনটে ঘণ্টা বসিয়ে রেখে ভদ্রমহিলা দেখাই করলেন না।

সুভাষদার উপদেশমত একটুও রাগ করল না সপ্তম। হাসি হাসি মুখ করে বাইরে বেরিয়ে দেখল ইতিমধ্যে আকাশের চেহারা বদলে গেছে। বেশ মেঘ জমেছে। সদর স্ট্রিট ধরে সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। চৌরঙ্গি রোডে পা দেওয়ামাত্র বৃষ্টি নামল। শালা। তিন ঘণ্টা আগে বেরুলে সে বাস ধরে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারত আরামে। একটা ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে সে দেখল চারপাশে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। একটা ভিখিরি গোছের লোক ভিজতে ভিজতে ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়াল। আর দাঁড়ানো মাত্র কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতে লাগল। সহ্য করতে না পেরে সপ্তম বলল, 'এই, কাকে গালাগাল দিচ্ছ?'

'তোর কী? আমি যাকে ইচ্ছে তাকে গালাগাল দেব। ওই শালা হারামিটা ওপর থেকে জল ঢেলে আমাকে ভিজিয়ে দিল, এ্যাই তোর মুখে আমি জল ঢালবো রে।' শেষ কটা শব্দ ওপরের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বলল লোকটা। মুখ ভর্তি দাড়ি, কাঁধে একটা বস্তা। সপ্তম নিজেকে সংযত রাখল। না, ভিখিরির ওপর রাগ করে কোনও লাভ নেই। বিশেষ করে ও যখন ভগবানকে গালাগাল দিচ্ছে।

কিন্তু বৃষ্টির গতিক সুবিধের নয়। এই বৃষ্টিতে ভেজা মানে বিছানায় পড়া। কলকাতায় এখন যেরকম জ্বরের জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে একবার জ্বর বাধালে সাতসাতটা দিন যন্ত্রণায় কাতরাতে হবে। বাড়ি ফেরার একমাত্র ভরসা ট্যাক্সি। আর এখন ট্যাক্সি মানেই খরচ। এক পয়সা ইনকামের সুযোগ হল না অথচ ট্যাক্সির ভাড়া দিতে হবে।

বেশি নয়, কোনও মাসে দুই কোনও মাসে পাঁচ হাজার পকেটে আসছে। যেহেতু জ্যোতি দত্তই বেশিরভাগ টাকা কেটে নেন তাই এতেই সন্তুষ্ট হতে হয় সপ্তমকে। হ্যাঁ, বাড়িতে থাকা খাওয়ার খরচ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় বলে বাঁচোয়া। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তা পনের বছরে তিনগুণ হয়েছে। মা তার একটা টাকাও খরচ করেননি। বিলাসিতা না থাকায় স্কুলের চাকরির টাকায় ছেলেকে ইংরেজি পড়াতে পেরেছেন। এখন অবসরের সময় আসেনি। এখন অবশ্য বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে সংসার চলছে।

হাত বাড়িয়ে একটা ট্যাক্সিকে ডাকল, সপ্তম। লোকটা দাঁড়াল না। এ ব্যাটা নিশ্চয়ই বাঙালি। বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কুকীর্তির নানান কাহিনী শোনা যায়। যদি মিটার খারাপ আছে এমন অভিযোগ ওঠে, দেখা যাবে তার পঞ্চাশভাগই বাঙালি। সপ্তম মিটার খারাপওয়ালা সমস্ত বাঙালি ট্যাক্সিড্রাইভারের মুখে একটি সংলাপ শুনেছে, 'আমি এ গাড়ি আজ প্রথম চালাচ্ছি। আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই খারাপ আছে। মালিককে গিয়ে আপনার কথা বলব।'

পঞ্চম ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। সপ্তম যে ছাউনির নিচে দাঁড়িয়েছিল তার দশহাত দূরে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালা ইশারা করছে কোথায় যাব? ওর কাছে পৌঁছতে গেলে বেশ ভিজতে হবে। কিন্তু আর আধঘণ্টা এরকম বৃষ্টি হলে কোনও ট্যাক্সিও যেতে রাজি হবে না। সপ্তম চিৎকার করে বলল, 'আমি শ্যামবাজার যাবো।

আধা অন্ধকারেও ইশারা বুঝতে পারত সপ্তম, তাকে ডাকছে। তার মানে লোকটা রাজি হয়েছে। তাদের এইসব ব্যাপার মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ভিখিরিটা। এবার বলল, 'বাবু, দুটো টাকা দিয়ে যান। বিশ্বাস করুন ওই হারামজাদা ভগবান ছাড়া আমি আর কাউকে খিস্তি করি না।'

সপ্তমের মনে হল এরকম একটা সৎ স্টেটমেন্টের জন্যে লোকটাকে কিছু দেওয়া দরকার। কিন্তু পকেটে দুটো টাকা নেই। পাঁচটাকার নোটটা নিয়ে একটু ভাবতেই ট্যাক্সিওয়ালা হর্ন দিল। তৎক্ষণাৎ টাকাটা ভিখিরির হাতে দিয়ে সে বৃষ্টির মধ্যে ছুটল। ট্যাক্সিতে উঠে বসতে বসতেই বেশ ভিজে গেল সে। তাকিয়ে দেখল ভিখিরিটা পাঁচটাকার নোটে চুমু খাচ্ছে।

'শ্যামবাজারের কোথায় যাবেন?'

রুমালে মাথা মুখ মুছছিল সপ্তম। বলল, 'মণীন্দ্র কলেজের পাশে।'

'কুড়ি টাকা এক্সট্রা লাগবে।' 'সেকি? কেন?'

'কেন? অন্ধ নাকি আপনি? এই বৃষ্টির চেহারা দেখছেন না? এর মধ্যেই ফায়ারব্রিগেড-রামমন্দিরে এক হাঁটু জল জমে গেছে। আমাকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে চালাতে হবে। গাড়ি খারাপ হলে যদি আপনি সারিয়ে দেন তাহলে আপনাকে এক্সট্রা দিতে হবে না। কি করবেন? ট্যাক্সিওয়ালা বিড়ি ধরালো।

কথাগুলো খুবই যুক্তিপূর্ণ। শুকনো রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যেতে ওকে বাধ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ন্যায্য ভাড়ার বেশি সে পাবে না। মোটর ভেহিকেলসের আইনটা সে জানে না। হাঁটুজলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালালে জল ঢুকে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ ড্রাইভাররা চাইতে পারে কিনা তার জানা নেই। তাকে ভাবতে দেখে লোকটা হাসল, বেশি টাকা সঙ্গে না থাকলে আপনি মিটার অনুযায়ী ভাড়া দেবেন, আমি স্টেটসম্যানের সামনে থেকে দুটো লোক তুলে নিচ্ছি। এখন কুড়ি টাকা চাইলেও পাবলিক ছুটে আসবে।'

একটু আগে ভিখিরিটা ভগবানকে যে ভাষায় গালাগালি করছিল ঠিক সেই ভাষা এখন ব্যবহার করতে ইচ্ছে হল সপ্তমের। কিন্তু সুভাষদা বলেছে, রাগ না করতে। সে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে।'

এই ঠিক আছে মানে কি সে নিজে এক্সট্রা টাকাটা দিয়ে দেবে না দুটো লোককে সামনে বসাতে ট্যাক্সিওলাকে অনুমতি দিচ্ছে? সে মনস্থির করতে পারছিল না। একই জায়গা থেকে উঠে সে মিটারের পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে, আর লোকগুলো তার চেয়ে অনেক কম দেওয়ার সুযোগ পাবে ভেবে রাগ হচ্ছিল। কিন্তু নো রাগ, সুভাষদা বলেছেন। ট্যাক্সিওয়ালা তখন মুখ ঘুরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে চলেছে। জোর বৃষ্টি চলছে বলেই রাস্তার দুপাশে লোক নেই। যারা আছে তারা মাথা বাঁচাচ্ছে কোনও ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে। ছাঁটের জন্যে কাচ তুলে দিতে হয়েছে। বিড়ির বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে। লোকটাকে বিড়ি খেতে নিষেধ করবে ভেবেও মন পরিবর্তন করল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরালো। স্টেটসম্যান এসে গিয়েছিল। ড্রাইভার বলল, 'আপনার দুটো দরজা লক করে দিন নইলে পাবলিক উঠে বসবে।' সপ্তম যেন লোক তুললে আপত্তি নেই এমন ভঙ্গিতে দরজা লক করল এবং সেটা করতে গিয়ে হাতের দেশলাই পায়ের কাছে পড়ে গেল। স্টেটসম্যানের সামনে ট্যাক্সিটা থামতেই ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর শেড থেকে দশ-বারোজন মানুষ পাগলের মত দৌড়ে নেমে এল ট্যাক্সির সামনে। ড্রাইভার চিৎকার করতে লাগল, দুজন, দুজন, শ্যামবাজার, তার বেশি নয় কিন্তু।'

পেছনের দরজা খোলার চেষ্টা হচ্ছিল সামনে। ড্রাইভারের উল্টোদিকের দরজা খুলে একটা মোটামত লোক আগে উঠে পড়ে চেঁচাতে লাগল, 'আরে মশাই, আমার সঙ্গে

মেয়েছেলে। ট্যাক্সি ধরার সময় মেয়েছেলে কী!' একটা লোক ওঠার চেষ্টা করছিল, 'সরুন সরুন।'

'সরব মানে? আপনার লজ্জা করে না আমার গায়ে হাত দিতে? একটি মহিলাকণ্ঠ তীব্র চিৎকার করে উঠল।

সে উঠতে যাচ্ছিল তার সম্ভবত কথাটা শোনামাত্র ইলেকট্রিক শক্ লাগল। একটু হকচকিয়ে যেতেই মহিলা তাকে ঠেলে উঠে বসলেন। এবার লোকটি আবেদন করল, 'উঠতে দিন প্লিজ। সামনে চারজন হয়ে যাবে।'

মোটা লোকটা যেন বাণী দিল, 'হবে না ভাই। লাট্টু গিয়ার।' দাও দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

মহিলা কোনওরকমে দরজা বন্ধ করতেই ট্যাক্সিওয়ালা গম্ভীর গলায় বলল, 'শ্যামবাজার কুড়ি টাকা লাগবে।'

'এ্যাঁ? কুড়ি? ডাকাতি? আমি রোজ দশটাকায় যাই, তুমি বললেই কুড়ি টাকা দিতে হবে?'

'তাহলে নেমে যান। প্রচুর পাবলিক রয়েছে এখানে।'

মোটা লোকটি পেছন দিকে তাকালেন, 'আপনিও কি কুড়ি দিচ্ছেন?'

'তাহলে উনি একা বসে থাকতেন না। মিটারে যাচ্ছেন, জেনুইন প্যাসেঞ্জার।' ট্যাক্সিওয়ালা সপ্তমের স্ট্যাটাস সগর্বে ঘোষণা করল।

'তুমি মাইরি' খুব ঢ্যামনা আছ, এই বৃষ্টিতে যেতে পারছ এই ঢের উঠে বল দশ টাকার জন্যে হেদিয়ে মরছ। দিয়ে দাও।' মহিলা বললেন।

'বলছ? বেশ চুপ করলাম। চলুন ভাই।'

ট্যাক্সি এগোল। সামনেই গাড়ির সারি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'হয়ে গেল। এখন, এইভাবে এগোতে হবে।'

এভাবে এগোনো মানে মিটার বাড়া, কিন্তু সেদিকে মন ছিল না সপ্তমের। সে মহিলাকে যেটুকু এই অন্ধকারে দেখা সম্ভব তাই দেখছিল। মাইরি, ঢ্যামনা, হেদিয়ে, এই তিনটি শব্দ ইনি পাবলিক প্লেসে অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন। মিটারের ট্যাক্সিকে নিশ্চয়ই পাবলিক প্লেস বলা যায়। এই তিনটি শব্দ বলে দিচ্ছে উনি কোন জগতের মেয়ে। একে নিশ্চয়ই আর ভদ্রমহিলা বলা যায় না। কারণ যৌনকর্মীদের ভদ্রমহিলা হিসেবে স্বীকৃতি তো খবরের কাগজও দেয়নি!

মহিলার স্বাস্থ্যটাস্থ বেশ ভাল। গায়ের রঙ চাপা। কাঁধ অবধি চুল এবং তাতে বৃষ্টির জল পড়ায় কাকতাড়ুয়ার মত দেখাচ্ছে। ফোঁপানো চুল বসে গেলে চুপসানো বেলুনের চেয়ে খারাপ দেখতে হয়।

'কি হল? ঠেলছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠলেন মহিলা।

'ঠেলছি কোথায়? লাট্টু গিয়ার চেঞ্জ করার সময় পায়ে চাপছে।'

'আমার কোমরে ব্যথা, মনে থাকে যেন।' মহিলা সতর্ক কবলেন।

গাড়ি এখন এগোচ্ছে শামুকের মত। সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানলা নামিয়ে শেষটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

'দাদা, জল দেখছেন?' ট্যাক্সিওয়ালা এমন গলায় তাকে বলল যেন শৈশব এক থালায় ভাত খেয়েছে।

বলতে হয় কিছু তাই সপ্তম বলল, হুঁ।'

'আপনি কোথায় যাবেন দাদা?' মোটা লোকটি মুখ অর্ধেক ঘোরালো

'কেন'?

'না, আপনি মিটারে যাচ্ছেন তো, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনাদের নামিয়ে দেব।' ট্যাক্সিওয়ালা বলল।

'আরে! আপনি আমাদের চেনেন নাকি?'

লোকটা সত্যি অবাক।

'চেনার কি দরকার? বুঝে গেছি।'

মহিলা বললেন, 'বড় বেশি কথা বল। শাটল নিয়েছে যখন শ্যামবাজারে আমাদের পৌঁছে দিতেই হবে ওকে। সেই পর্যন্ত তো যেতেই পারছ।'

'আপনারা দর্জিপাড়ায় নামবেন না?' ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা কি একবারও বলেছি?' লোকটি পাল্টা প্রশ্ন করল।

'ও'।

মনে মনে হাসল সপ্তম। এরা সোনাগাছিতে নামছে না যখন তখন মহিলাকে কি যৌনকর্মী বলে ভাবা উচিত? ট্যাক্সিওয়ালা তার মতই ভুল করে শেষটায় ম্যানেজ করল।

'উঃ, বেশ শীত করছে। শাড়িটা ভিজে কাদা হয়ে গেছে। বললাম, এখনই ওঠার দরকার নেই, তোমার সব তাতেই তাড়া।' মহিলা বকবক করছিলেন।

'সঙ্গে চাবি আনিনি, দশটায় গেট বন্ধ হয়ে যাবে।'

'মাল খেতে আসার সময় সঙ্গে চাবি আনো না কেন?'

'তুমিও তো আনতে পারতে?' মোটা লোকটা গলা তুলল।

'ফোনে এমন তাড়া মারলে সব গুলিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি এসে নইলে পাখি পালিয়ে যাবে। শালা পাখিই বটে, চামচিকে।' মহিলা হাসলো।

'কি করব বল? এমন বোলচাল দিচ্ছিল, টিভি সিরিয়ালের প্রযোজক, অ্যামওয়ে সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড, ভাবলাম তুমি যদি পারো।'

হকচকিয়ে গেল সপ্তম। অ্যামওয়ে। এখন কলকাতায় অনেকেই অ্যামওয়ে করছে। মেম্বার করতে হয়। সেই মেম্বার যদি আবার অন্যদের মেম্বার করে এবং এইভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে মেম্বার বাড়তে থাকে তাহলে চার পাঁচ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার মাসিক রোজগার হয়ে যাবে। এছাড়া ওই কোম্পানির বিদেশী জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া যাবে। আইডিয়াটা তারও মাথায় এসেছিল কিন্তু, সুভাষদা বলেছেন, 'দুর হাতে পায়ে ধরে তুই যাকে মেম্বার করালে চুপ করে বসে থাকার সম্ভাবনা তার নব্বুই ভাগ। কোনও লাভ হবে না।

'আপনারা অ্যামওয়ে করেন?' প্রশ্নটা না করে পারল না সপ্তম।

মোটা লোকটি অর্ধেক ঘোরাতে পারল মুখ, 'আমি না, আমার ওয়াইফ।'

ওয়াইফ। আঁতকে উঠল সপ্তম এইরকম স্বামী-স্ত্রী পশ্চিমবাংলায় আছেন? ট্যাক্সিওয়ালাও যে অবাক হয়েছে তা ওর মুখ ফেরানো দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

'আপনি ইন্টারেস্টেড দাদা?' মহিলা মুখ ফিরিয়ে হাসলেন।

'শুনেছি, এখনও ভাবিনি।' সপ্তম বলল। মহিলা ব্যাগ খুললেন। তারপর একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন, 'আমার সব এখানে লেখা আছে। আপনার কোনও কার্ড?'

'আমার কার্ড সঙ্গে নেই।'

'ও। ঠিক আছে, আমায় ফোন করবেন, আমি চলে যাব।

'ঠিক আছে।'

'দাদার নামটা যদি বলেন।'

'সপ্তম, সপ্তম চ্যাটার্জি।'

'বাঃ কী দারুণ রোমান্টিক নাম। এই শুনছ? কী কুম্ভকর্ণ লোক বাবা এর মধ্যে ঢুলতে শুরু করেছে।' মহিলা কনুই দিয়ে গুঁতো মারলেন।'

'এ্যাঁ, এ্যাঁ এসে গেছে।' মোটা লোকটি ধড়মড়িয়ে উঠল।

মহিলা হাসলেন, দেখুন কী লোক নিয়ে আমি ঘর করি।'

রাজবল্লভ পাড়ায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে নামল ওরা। মহিলা বারংবার টেলিফোন করার অনুরোধ জানিয়ে চল্লিশ টাকা ড্রাইভারের হাতে দিলেন। সপ্তমের মনে পড়ল দেশলাইটা নিচে পড়ে গেছে। মহিলার কার্ড পকেটে রেখে সে ঝুঁকে হাতড়াতে লাগল। এটা কি? দেশলাই-এর পাশে বড় কি হাতে ঠেকছে। তুলে নিল সে। ড্রাইবার আবার গাড়ি চালু করে বলল, দেখলেন স্যার, ভদ্রলোকের বউ কি ভাষায় কথা বলছে। আমি ভেবেছিলাম সোনাগাছির মেয়ে।'

ওপরে না তুলেও সপ্তম বুঝতে পারল যেটা সে তুলেছে সেটা একটা মানিব্যাগ। বেশ মোটা। কি করা যায়? ড্রাইভারকে দিয়ে দেবে? যার হারিয়েছে সে যদি খোঁজ করে তাহলে দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই লোকটা দেবে না। এমন চশমখোর লোক দিতে জানে না। তারচেয়ে থানায় জমা দিলেই ভাল হয়। ভাড়া মিটিয়ে সে ট্যাক্সি থেকে নামল। মণীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে জ্যোতি দত্ত থাকেন। আজকের রিপোর্টটা তাকে দিয়ে সে সিকদারবাগানের বাড়িতে হেঁটে যাবে। ট্যাক্সি চলে গেলে সে কমে আসা বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্যে পাতাল রেলের শেডের নিচে চলে এল। মানিব্যাগটা তখনও তার হাতে ধরা। বেশ মোটা ব্যাগ। ওটা খুলতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এগুলো কি? ডলার?

ঝটপট চারপাশে তাকাল সপ্তম। না, এই বৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে কেউ বেরিয়ে আসেনি। এখন কী করা যায়? ট্যাক্সির পেছনের সিটের পা রাখার জায়গা কারও পার্স পড়ে যেতে পারে এবং তার মধ্যে দু-চারশো টাকা থাকাও অস্বাভাবিক নয় কিন্তু এ তো ডলার। বিজ্ঞাপনে ছাপা ডলারের যে ছবি সে দেখেছিল তার সঙ্গে নোটগুলোর কোনও পার্থক্য নেই। কত ডলার আছে এই মানিব্যাগে?

বৃষ্টি না কমলে থানায় যাওয়া যাচ্ছে ন। ডলারভর্তি মানিব্যাগ ফেরত দিতে গিয়ে যদি জ্বর আসে তাহলে হ্যাপাট তাকেই সামলাতে হবে। এই মানিব্যাগের মালিক কি বাঙালি? কলকাতার বাঙালি ডলার নিয়ে রাস্তায় ঘুরবে না। এন আর আই হতে পারে। কিন্তু বাঙালি এন আর আই-রা টাকা-পয়সার ব্যাপারে বেশ সতর্ক। কার যেন লেখায় পড়েছিল, ওরা একটা ডলার জমাবার সময় ভাবে সাতচল্লিশ টাকা জমাচ্ছে।

তাহলে এটা কি কোনও বিদেশির? কলকাতা দেখবে বলে ট্যাক্সিতে উঠেছিল, কোনও ভাবে পড়ে গেছে পকেট থেকে। তাহলে তো মানিব্যাগটা লোকটিকে ফেরত দেওয়া উচিত। বিদেশে এসে নিশ্চয়ই অর্থকষ্টে পড়বে। আচ্ছা, যদি বিদেশি হয় তাহলে নিশ্চয়ই টাকার সঙ্গে আরও কিছু কাগজপত্র রেখেছে যা থেকে ওর পরিচয় পাওয়া গেলেও যেতে পারে। নাঃ, আগে মানিব্যাগের ভেতরে যা আছে তা পরীক্ষা করা দরকার।

সামনেই জ্যোতি দত্তের বাড়ি কিন্তু সেখানে এই কর্মটি করতে চাইল না সে। কোনও কারণ নেই, এমনিই ইচ্ছে হল না। আচ্ছা, এমন হতে পারে যার ব্যাগ হারিয়েছে সে পুলিসের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়েছে। হয়ত ট্যাক্সির নাম্বারও জানিয়েছে। এখন পুলিশ যদি ওই ট্যাক্সিটাকে খুঁজে বের করে এবং ব্যাগ না পাওয়ায় ট্যাক্সিওয়ালা যদি জানায় যে পেছনে বসেছিল যে ঝুঁকে নিচে কিছু খুঁজেছিল। এটা ট্যাক্সিওয়ালা দেখতেই পারে। তারপর কোথায় নামিয়েছে পুলিস জিজ্ঞাসা করতে, এখানে এই মণীন্দ্র কলেজের সামনে ও চলে আসতে পারে। বাঃ, সেটা হলে খুব ভাল হয়।

সপ্তম সিগারেট ধরালো। রাত দশটা বেজে গেল। পাতাল রেল থেকেও বেশি যাত্রী বাইরে বের হয়নি। দফায় দফায় যারা এসেছে তাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির জন্যে। রাত বাড়ছে অথচ ট্যাক্সিটা ফিরে আসছে না। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ হতেই লোকজন বাড়ির দিকে ছুটল। অগত্যা পা চালালো সপ্তমও।

'এই যে সপ্তম, কোত্থেকে?'

পেছনে ফিরে বুড়োদাকে দেখতে পেল সে। তাদের পাড়ার সবার বুড়োদা। সত্তরের ওপর বয়স। খুব ভাল ফটোগ্রাফার। সপ্তম দাঁড়াল, 'এসপ্ল্যানেডে গিয়েছিলাম। একজন অ্যাপয়ন্টমেন্ট দিয়েছিল, কিন্তু অসুস্থ বলে দেখাই করল না।'

'হাল ছেড়ো না।'

'না। ছাড়ব না।'

'আজকের টিভি নিউজ শুনেছ?' হাঁটতে হাঁটতে বুড়োদা বললেন।

'না। কি হয়েছে?'

'ছেলেবেলায় শুনতাম কলকাতায় হাওয়ায় টাকা ওড়ে, যে পারে সে খপ করে ধরে বড়লোক হয়ে যায়। এখন তো শুনছি টাকা উড়ছে ঠিকই তবে তা দুবাই-এর।' বুড়োদা বললেন।

'দুবাই-এর মানে?'

কলকাতায় মাস্তানি করে যারা সামান্য নাম করতে পারে তারাই দুবাই-এর এজেন্সি পেয়ে যায়। ইন্ডিয়ান অয়েলের গ্যাস বা পেট্রল পাম্পের এজেন্সি যত আকাশকুসুম হোক, এর ধারেকাছে লাগে না। আজ খবরে বলেছে ওই অপহরণের ঘটনাটার পেছনে দুবাই-এর ভূমিকা আছে। তিন কোটি টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছে ছেলেটাকে।'

'তিন কোটি?' হ্যাঁ হয়ে গেল সপ্তম।

'হ্যাঁ, ভাই। আমার তো খুব আনন্দ হচ্ছে। একজন বাঙালি মুক্তিপণ বাবদ তিন কোটি দিতে এখন সক্ষম জানার পর কেউ যদি বলে বাঙালি ব্যবসাবিমুখ জাত, তাহলে তার সঙ্গে লড়ে যাব। ব্যবসা করে রোজগারের টাকাই তো ওরা মুক্তিপণ দিয়েছে দুবাইকে'।

'কিন্তু তিন কোটি টাকা গুনল কী করে?' বিস্ময় যাচ্ছিল না সপ্তমের।

'হাতে গোনা না ভাই, তার জন্যে মেশিন আছে। ব্যাঙ্কে দ্যাখোনি।'

'তিন কোটি টাকা দুবাইতে গেল কী করে?'

'দুর! টাকা যাবে কেন? ইন গড উই ট্রাস্ট গেছে।'

'বুঝলাম না।'

'ডলার হে। ডলারের গায়ে লেখা থাকে কথাটা। হুন্ডি করে পৃথিবীর যে কোনও দেশে তাদের টাকায় পাঠানো যায়। ইন্ডিয়াতে ওদের কেউ টাকাটা নিল। নিয়ে জানিয়ে দিল দুবাইয়ের স্যাঙাৎকে। যে ছয়লাখ ডলার তুলে দেবে যেখানে দেওয়ার কথা। কোনও কারচুপি ডলার নিয়ে করা যাবে না, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে।'

'ভাবা যায় না।'

'কিন্তু ভাবতে হবে। হয় ওই রকম বাঙালি ব্যবসায়ী যে তিন কোটি গেলে এক পুজোয় দাম বাড়িয়ে তুলে নেবে, নয় দুবাই-এর এজেন্সি নাও। আমাদের শ্যামবাজার পাড়ার জন্যে কেউ এখনও এজেন্সি পেয়েছে বলে জানি না। আচ্ছা, আমি এবার বাঁ দিকে।' বুড়োদা চলে গেলেন।

বাড়ি ফিরতেই মা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। ভিজে একসা হয়ে এসেছে সে। তৎক্ষণাৎ গরম জলে স্নান করতে হল। করে বেশ আরাম লাগল। মায়ের তাগাদায় রাতের খাওয়া শেষ করতে হল। তারপর শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে মানিব্যাগটা নিয়ে বসল। বেশ দামি ব্যাগ। চামড়ার। পকেটে রাখায় বৃষ্টির জল লাগেনি। মাঝখানের খোপে ডলার এমনভাবে ঠাসা যে মুখ বন্ধ হচ্ছে না। সপ্তম ডলারগুলো বের করল। সব একশো ডলারের নোট। এক দুই করে গুনতে গুনতে আটচল্লিশে এসে সে থামল। তার মানে চার হাজাব আটশো ডলার। বাপ্‌স। এগুলো ভারতীয় টাকায় পরিবর্তন করলে প্রায় দু লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই টাকা নিশ্চয়ই কোনও বিদেশির। সেই বেচারার অবস্থা নিশ্চয়ই এখন খুব করুণ। বিদেশে এসে এত ডলার হারিয়ে কী বিরাট সমস্যায় পড়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। লোকটা নিশ্চয়ই পুলিসের কাছে ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। তার উচিত এখনই থানায় গিয়ে এটা জমা দেওয়া। তাহলেই যার ডলার সে পেয়ে যাবে। ঘড়ি দেখল সপ্তম। এগারটা বেজে গিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। এত রাত্রে এই পরিবেশে থানায় গেলে কোনও ঝামেলা হবে না তো? পুলিস যদি জিজ্ঞাসা করে ট্যাক্সির ভেতর থেকে ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে চুপচাপ নেমে পড়লেন? ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন না কার ব্যাগ? কী জবাব দেবে? বলবে লোকটাকে সৎ বলে মনে হয়নি, তাই। বিশ্বাস করবে পুলিস। কে না জানে পুলিসে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। তখনই সুভাষদার কথা মনে পড়ল। সুভাষদা বলে দিলে কাল সকালে সে স্বচ্ছন্দে লালবাজার গিয়ে বড়কর্তাদের হাতে মানিব্যাগটা তুলে দিতে পারে। সে ঝটপট সুভাষদাকে ফোন করল। যিনি ফোন ধরলেন তিনি জানালেন সুভাষদা ঘুমিয়ে পড়েছেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে, শরীর ঠিক নেই, অতএব এখন ডাকা যাবে না।

অতএব আগামী সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে কোনও উপায় দেখল না সপ্তম। সে একটি একশো ডলারের নোট তুলে নিল। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। বেশ দামি কাগজ। সারা পৃথিবী এই নোটের দাপট মেনে নিয়েছে। পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই যেখানে এই ডলারের বিনিময়ে সেই দেশের কারেন্সি পাওয়া যাবে না। হঠাৎ তার চোখে

পড়ল লেখাটা, 'ইন গড উই ট্রাস্ট।' ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাসী। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ সবিনয়ে তাদের নোটের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাস রাখেন।

মানিব্যাগের অন্য খোপগুলো দেখল সপ্তম। একটা পাঁচশো টাকার আর দুটো একশো টাকার ভারতীয় নোটের দেখা পাওয়া গেল। এবং তখনই ব্যাগের শেষ খোপে একটা কার্ড দেখতে পেল সে। কার্ডটা বের করে দেখল তাতে সোনালি অক্ষরে একটা নাম ছাপা, ইমরান রহমান। ব্যস, আর কিছু নেই। ভদ্রলোকের নাম ইমরান রহমান যদি হয় তাহলে ইনি আমেরিকা বা ইউরোপের মানুষ নন। আর তাই যদি হন, তাহলে এশিয়া থেকে গিয়ে ওসব দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। কিন্তু কার্ডে ভদ্রলোক নিজের ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার অথবা ই-মেইল নাম্বার ছাপেননি কেন? ইনি কি অটলবিহারী বাজপেয়ী অথবা দিলীপকুমার যে নামছাড়া অন্য কিছু লেখার প্রয়োজন নেই?

তবু একটা সূত্র পাওয়া গেল। ইমরান রহমান নামের এক ভদ্রলোকের মানিব্যাগ পাওয়া গিয়েছে. সঠিক লোক একে প্রমাণ দিয়ে সেটা নিয়ে যান। পুলিস এভাবে বিজ্ঞাপন দিতে পারে যদি কেউ এর মধ্যে ডায়েরি না করে। ব্যাগটাকে সযত্নে আলমারিতে তুলে শুয়ে পড়ল সে।

সকালে ঘুম ভাঙবে দেরিতে। মা দরজা খুলিয়ে বলল, 'চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

তাড়াতাড়ি ফ্রেস হয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসতেই জ্যোতি দত্তের টেলিফোন, 'কি হল?'

'দেখাই হল না। তিন তিনটে ঘণ্টা বসিয়ে রেখে অসুস্থ বলে দেখা করল না।'

'সে কী? তা খবরটা কাল রাত্রেই দিলে না কেন?'

'প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। আটকে গিয়েছিলাম।'

'বাড়ি ফিরেও তো ফোন করতে পারতে, চিন্তায় ছিলাম।'

সপ্তম একবার ভাবল জ্যোতি দত্তকে মানিব্যাগের কথা বলবে কি না! শেষ পর্যন্ত না বলাই মনস্থ করল। কাজের কথা বলে জ্যোতি দত্ত ফোন ছেড়ে দিলে ঘড়ি দেখল সপ্তম। আর একটু বেলা হোক তারপর সুভাষদাকে ফোন করা যাবে। শরীর খারাপ ছিল কাল, নিশ্চয়ই বেলা করে উঠবেন।

খবরের কাগজ খুলল সে। কদিন থেকেই অপহরণের কেসটা নিয়ে গরম গরম খবর ছাপা হচ্ছে। যতদিন লোকটাকে ওরা ধরে রেখেছিল পুলিস তাকে উদ্ধার করতে পারেনি বরং উল্টোপাল্টা বিবৃতি দিচ্ছিল। সে সময় লোকটার পরিবার থেকে তিন কোটি টাকা মুক্তিপণ বাবদ দেওয়া হল তা-ও চেপে যাওয়া হল। দুবাই থেকে ফোনে দরাদরি করা হয়েছিল তা-ও নিশ্চয়ই পুলিস জানত। টাকা দিতেও তারা বাধা দেয়নি। অথবা দিলেও লোকটির আত্মীয়স্বজন তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। এখন লোকটি ফিরে আসার পরে একের পর এক আসামীকে ধরছে পুলিস। কিন্তু টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে কি না সে ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছে না।

কাগজে চোখ রাখল সে। হঠাৎ ডানদিকের শেষ কলমে নজর যেতেই সোজা হয়ে বসল সপ্তম। গতরাত্রে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে পুলিস ইমরান রহমান নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই লোকটি দুবাইয়ের মাফিয়া চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে পুলিসের কাছে প্রমাণ আছে। এর মোবাইলে দুবাই থেকে দুবার টেলিফোন

এসেছিল। ইমরান রহমান পাকিস্তানের নাগরিক হলেও দীর্ঘদিন দুবাইয়ে ছিল তার কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য কি তা এখনও জানা যায়নি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন পাড়ার উঠতি এর মাঝারি মাস্তানদের একটা তালিকা দুবাইয়ে পৌঁছে গিয়েছে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কারণেই ইমরান কলকাতায় এসেছে। অবশ্য ব্যবসায়ী অপহরণের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে কি না তা-ও খতিয়ে দেখা হবে।

হতভম্ব হয়ে গেল সপ্তম। নির্ঘাৎ মানিব্যাগটা এই লোকের। কাল রাত্রে ওকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার একটু আগে ট্যাক্সি করে ফিরেছিল। লোকটা নিশ্চয়ই খুব টেনশনে ছিল তাই নামার সময় যে মানিব্যাগ ট্যাক্সির সিটের নিচে পড়ে গেছে তা বুঝতে পারেনি। ডলার ভর্তি মানিব্যাগ হারানোর কথা কাগজে ছাপা হয়নি। লোকটার যদি খেয়ালও হয় তাহলে গ্রেপ্তারের পরে পুলিসের কাছে ডায়েরি করতে যাবে বলে মনে হয় না। ওই ডলার বৈধভাবে না আনা হলে ইমরান রহমান নিশ্চয়ই আর একটা মামলায় জড়াতে চাইবে না। ওই কার্ডটা ছাড়া ডলারগুলো যে ইমরানের তা প্রমাণ করার কোনও রাস্তা নেই। ইমরান অস্বীকার করে বলতে পারে তার নামছাপা কার্ড ডলারগুলোর সঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র করে। এখন উপায়?

ঝটপট সুভাষদার নাম্বার ঘোরালো সপ্তম। দুবার রিং হতেই সুভাষদার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যাঁলো।' শেষে ও-টা একটু বেশি টানেন উনি।

'সুভাষদা, সপ্তম বলছি।'

'কি খবর?'

'আপনার সঙ্গে খুব জরুরি দরকার আছে।'

'কি ব্যাপার?'

'এসব কথা ফোনে বলা যাবে না সুভাষদা।'

'ঠিক আছে। তুমি, তুমি—। এক কাজ করো এগ্যারটার সময় বাসায় চলে এসো।'

'এগারটা।'

'হ্যাঁ।' ও হো, তার আগে তুমি কি করছ সপ্তম?'

'কিছু না।'

'তাহলে আমার একটা উপকার করো। ভি আই পি রোডে হলদিরামের বড় দোকানটা চেনো? এয়ারপোর্টে যেতে বাঁ দিকে পড়ে।'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে ঠিক দশটায় পৌঁছে যাবে। একটা মারুতি ভ্যানে রাসেল বসে থাকবে। তুমি রাসেলকে চেনো না। ও প্রমোটর। তুমি ওর সঙ্গে গিয়ে একটা ফ্ল্যাট দেখবে। ফ্ল্যাটটা কী রকম জায়গায়, কটা ঘর, ঘরগুলো কীরকম সব খুঁটিয়ে দেখবে। দেখে এগারটা নাগাদ আমার এখানে চলে আসবে। আমি যেতে পারছি না বলে তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি।' সুভাষদা বললেন।

'ঠিক আছে।'

সুভাষদার অনুরোধে না বলার ক্ষমতা সপ্তমের নেই। অত প্রভাবশালী মানুষ কিন্তু ব্যবহার করেন ঠিক নিজের দাদার মত। কিন্তু ফ্ল্যাট সুভাষদার প্রয়োজন তা তো ওঁরই দেখা উচিত। সে নিজে যা দেখবে তা কি সুভাষদার রুচির সঙ্গে মিলবে? তাছাড়া ওই

্যাট কেন সুভাষদা দেখতে বললেন তাও স্পষ্ট করে জানাননি। নিজের অত বড় বাড়ি াকতে তিনি নিশ্চয়ই ফ্ল্যাট কিনে বাস করতে যাবেন না!

ঠিক দশটায় ট্যাক্সি থেকে হলদিরামের দোকানের সামনে নামল সপ্তম। ভি আই পি রোডের ওই এলাকায় পৌঁছতে তার নগদ আটচল্লিশ টাকা খরচ হল। অন্য সময় হলে আড়াই টাকা দিয়ে বাসেই চড়ে আসত। কিন্তু চার হাজার আটশো ডলার পকেটে নিয়ে বাসে চড়তে সাহস হয়নি। কেবলই মনে হয়েছে দু লক্ষ টাকা পকেটে নিয়ে কলকাতার বাসে উঠলে সে শেষ হয়ে যাবে। অতএব ট্যাক্সি নিতে হয়েছে।

সে দেখল দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তাদের একটাও মারুতি ভ্যান নয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দোকানটার দিকে। এই সময় পেছনে হর্ন বাজতেই সে মারুতি ভ্যানটাকে দেখতে পেল। সরে দাঁড়াতেই গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে থামল। মুখে অনেক দাগ, জিনস আর জ্যাকেট পরা একটা শক্তপোক্ত লোক ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে ঘড়ি দেখল। সপ্তম এগিয়ে গেল, আপনার নামটা জানতে পারি?'

'রাসেল। আপনি সপ্তম?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন।'

লোকটি হাঁটতে শুরু করলে সপ্তম অনুসরণ করল। বিদেশি পারফিউমের গন্ধ বের হচ্ছে লোকটার শরীর থেকে।

'কেসটা কি বলুন তো? সুভাষদা নিজে না এসে আপনাকে পাঠালেন!' রাসেল তাকাল।

'জানি না। আমায় টেলিফোনে আসতে বললেন।'

'আপনার সঙ্গে কীরকম দোস্তি?'

দোস্তি শব্দটা কানে লাগল। সে জবাব দিল, 'আমাকে উনি স্নেহ করেন।'

লোকটি হাসল, 'আরে মশাই, আমরা সবাই সুভাষদার স্নেহে আছি। কেউ কম কেউ বেশি।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যেখানে পৌঁছেছিল তার দুপাশে নতুন নতুন চারতলা বাড়ি, ভি আই পি মুখো। সেগুলো ছাড়িয়ে যে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল, সেটি দেখতে বেশ ভাল। যে লোকগুলো পাহারায় ছিল তারা ছুটে এসে রাসেলকে সেলাম করতে লাগল।

রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'কোঈ প্রবলেম?'

'নেহি সাব। সব ঠিক হ্যায়।'

রাসেল তাকে ইশারা করে বাড়িটার সিঁড়িতে পা রাখল, 'এই বাড়ির দুটো ফ্ল্যাট এখনও খালি আছে। আসুন।' দোতলায় উঠে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল রাসেল। পেছনে আসা চৌকিদারদের একজন দৌড়ে ভেতরে ঢুকে জানলা খুলে দিতে লাগল।

'এই ফ্ল্যাটটা পনেরশো স্কোয়ারের। এক ভিখিরির বাচ্চা কিনেছিল।'

'মানে?'

'আরে ভাই, আমার রেট ছিল পাঁচশো টাকা পার স্কোয়ার। তার মানে সাড়ে সাত লাখ। লোকটা রাজি হল। তিন লাখ অ্যাডভান্স দিল। তখন কনস্ট্রাকশন চলছে। হঠাৎ বলল, মেঝে এই চাই, জানালায় ওই চাই, কিচেনটা ওই পাথরে করবেন। বহুত ফিরিস্তি

বললাম আমি চার দেওয়ালে হোয়াইট ওয়াশ করে ওই টাকায় দেব বলেছি, যা বেশি চাইবেন তারজন্য এক্সট্রা মাল ছাড়তে হবে। হেঁ হেঁ করে রাজি হল। তারপর যখন আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে দিলাম তখন বলে এত টাকা লাগবে বলেননি তো। আরে, তুই বাতাসার দাম পকেটে নিয়ে রাজভোগ অর্ডার দিচ্ছিস? চার লাখ এক্সট্রা খরচ হয়েছে আমাকে আট লাখ না দিলে দেব না। আট মাস হয়ে গেছে। এখন বলছে অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দিতে। দেখুন, ফ্ল্যাট দেখুন।' রাসেল কথাগুলো বেশ মেজাজ নিয়েই বলল

ফ্ল্যাট দেখল সপ্তম। তিনটি বেডরুম দেওয়াল থেকে মেঝে সবই দামি জিনিসে তৈরি চারটে টয়লেট। রান্নাঘর দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বারান্দায় এল। এদিকটা খোলা। রাসেল বলল, 'ইচ্ছে করলেই ঘরগুলো এয়ারকণ্ডিশন্ড করা যেতে পারে।'

'তাহলে এখন দাম কত পড়ছে?'

'দুর মশাই, আপনি কিনবেন?'

'না, সুভাষদা।'

'সুভাষদার ব্যাপারে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনাকে দেখতে পাঠিয়েছে উনি, দেখে যান। এই যে আমি ব্যবসা করে খাচ্ছি, কার জন্যে? না মশাই, বেইমানি করতে পারব না। আমি একা কেন? পতাকী রায়, ত্রিদিব সেন, কে নয়?'

'ঠিক আছে, বলুন।' সপ্তম বলল।

'সুভাষদাকে কী বলবেন?'

'খুব ভাল ফ্ল্যাট।'

'ঠিক। দুটো গোলমাল আছে' এক ইলেকট্রিক মিটার পাচ্ছি না। এক বাড়িতে তিনটে বেশি মিটার কিছুতেই দিচ্ছে না। আলোর প্রবলেম। আর বাড়ির সামনে গাড়ির রাস্তাটা পাঁচজনের সামনে দিয়ে। কোনও প্রাইভেসি নেই। দয়া করে এটা বলবেন ভাই?' রাসেল সপ্তমের হাত ধরল।

সেই হাতের স্পর্শে এমন কিছু ছিল যে সপ্তম চমকে উঠল।

রাসেল সপ্তমকে লিফট দিল। তারও নাকি সুভাষদার বাড়িতে যাওয়ার কথা। গাড়ি চালাতে চালাতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছেন ভাই?'

'আপনি যে সমস্যা দুটোর কথা বললেন সেগুলো কি খুব বড় সমস্যা? সুভাষদা চাইলেই মিটার পেয়ে যাবেন। আর কোনও ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে হলে তো সবার সামনে দিয়েই ঢুকতে হবে।' সপ্তম গম্ভীর গলায় বলল।

'ঠিক। এটা সাধারণ কোনও লোকের ক্ষেত্রে সমস্যা নয়। আমি ফ্ল্যাট কিনেছি, লোকজনের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতেই হবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সুভাষদাকে যিনি ফ্ল্যাটের জন্যে ধরেছেন তাঁর তো সমস্যা হতে পারে। আপনি যদি ওই সমস্যা কথা একটু বেশি করে সুভাষদাকে বলেন তাহলে ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন, সুভ চাইলে অনেক কম দামে ফ্ল্যাট দিতে হবে। আসলে মানুষটার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ তো।' রাসেল হাসল।

সপ্তম কিছু বলল না। কোনও কথা বলা এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রাসেল বলল, 'আপনার সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হল, বিষ্যতে আলাপটা তো বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে। আমরা যদি পরস্পরকে দেখাশোনা র়ি তাহলে উপকার ছাড়া অপকার তো হবে না।'

'পরস্পরকে দেখাশোনা বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'খুব সোজা কথা। ওই ফ্ল্যাটের জন্যে কাস্টমার টাকা হাতে নিয়ে বসে আছে। ভাষদার লোক যদি ফ্ল্যাট না নেয় তাহলে আমি কমসে কম দু'লক্ষ টাকা প্রফিট করতে রি। আপনি যদি এতে সাহায্য করেন, তাহলে ফিফটিন পার্সেন্ট, মানে তিরিশ হাজার পাবেন।'

'আপনি তো কথাটা সোজাসুজি সুভাষদাকেই বলতে পারেন। আপনার লস হচ্ছে বলে উনি নিশ্চয়ই চাপ দেবেন না।' সপ্তম বলল।

'নাঃ। আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না।' মাথা নাড়ল রাসেল, 'আরে মশাই, এখানে প্রমোটর আছে যাদের কাছে সুভাষদা ফ্ল্যাট চাইলে বিনা পয়সায় দিয়ে দেবে। দিয়ে জেকে ধন্য বলে মনে করবে। পারলে রেজিস্ট্রেশনের খরচও তারা দিতে চাইবে। কেন? সুভাষদার স্নেহধন্য হয়ে যদি দু'কোটি কামানো সম্ভব হয়, তাহলে দশ লক্ষের ফ্ল্যাট দিয়ে ভবিষ্যৎটা মজবুত করতে ওরা চাইবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'সেটা আপনি চাইছেন না কেন?'

'আমি লাইনে নতুন এসেছি। এখনও দু'কোটি দূরের কথা কুড়ি লক্ষ প্রফিট করেছি কি সন্দেহ। ওদের মত অবস্থা হলে আমিও ফ্রিতে দিতে চাইতাম।' রাসেল গাড়ির গতি মিয়ে আনল। সুভাষদার বাড়ি এসে গিয়েছে।

গাড়ি থামিয়ে রাসেল বলল, 'আমি আপনার ওপর জোর করছি না, ইচ্ছে হলে রবেন, নইলে না।'

সুভাষদার বাড়ির সামনে রোজই অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। আজও রয়েছে। র বাড়ির বারান্দা, গেটের সামনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। রকম দৃশ্য সাধারণত মন্ত্রী বা এম এল এ, এম পি-র বাড়ির সামনে দেখা যায়। অথচ ভাষদা এ সবের কিছুই নন। তবু ভিড় বেড়েই চলে। রাসেল যখন গাড়ি পার্ক করছিল খন সপ্তম গেটের ওপাসে চলে এল। বাইরের ঘরে বেশ ভিড়। তবু দরজা অবধি পৌঁছে ধ দেখাল সে। সুভাষদার বসার ঘরে টেবিল চেয়ার বা সোফা নেই। বিশাল চওড়া ক্তাপোষের ওপর সতরঞ্জি পাতা। একটা পাশবালিশ কোলে নিয়ে সেখানে বসে থাকেন ভাষদা। একটু দূরে ওঁর সহকারী দুটো টেলিফোন নিয়ে বসে আছে। জরুরি ফোন হলে ভাষদার দিকে রিসিভার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া দুটো মোবাইল আছে সুভাষদার পাশে।

সামনে গোটা চারেক মানুষ, তক্তাপোষে বসে, কয়েকজন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তবু প্তমের মুখ দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ইশারায় ঘরে ঢুকতে বললেন সুভাষদা। এখন ওঁর রনে দামী লুঙ্গি আর ফতুয়া। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেল সপ্তম। সুভাষদা জিজ্ঞাসা রতেন, 'কি হে, গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল সপ্তম।

'গুড। বসো এখানে বসো।' হাত বাড়িয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে সামনে বসা লোকদের বললেন, 'এস সব খবর কোথায় পান বলুন তো?'

'কাগজে ছাপা হয়েছে।' একজন জবাব দিলেন।

'আরে কাগজে তো কত কী ছাপা হয়, ছাপা হওয়া মানে সেটা বাস্তবে ঘটবে এমন ধারণা হল কী করে?' ভি আই পি রোডের দু'পাশে আপনারা যত ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়েছেন তা বেআইনি অতএব ভেঙে ফেলা হবে, এ গপ্পো কতদিন ধরে শুনছেন। কাগজে বেরিয়েছে বলে আপসেট হয়ে পড়লেন? আরে আগে প্রমাণ হোক বাড়িগুলো বেআইনিভাবে তৈরি। মুখে বেআইনি বললে তো চলবে না। কোর্ট চলবে। হাইকোর্ট বললে সুপ্রিম কোর্ট আছে। সেখান থেকে রায় বের হোক। কান নিয়ে গেছে কাকে অতএব আপনারা কাকের পেছনে ছুটছেন, একবার দয়া করে কানে হাত দিয়ে দেখুন।' সুভাষদা হাসতে হাসতে বললেন।

'যা হোক, তেমন কিছু হলে আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন।' ওদের একজন বললেন।

'আমার ক্ষমতা কতটুকু? আমি মন্ত্রী না এম এল এ যে আপনাকে কথা দেব। তবে বললামই তো, বাড়ি গিয়ে কানে তেল দিয়ে ঘুমান। এবার উঠুন, ওঁরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন।'

সুভাষদার কথা শেষ হওয়া মাত্র ওঁরা তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়তেই তিনজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা জায়গাটা দখল করলেন।

সুভাষদা তাকালেন, 'বলুন।'

প্রবীণ যিনি তিনি মুখে খুললেন, 'সাংবাদিক স্বদেশ রায়চৌধুরি কি কিছু বলেছেন?'

সুভাষদা মাথা নাড়লেন, বলেছেন। সল্টলেকের ব্যাপার তো?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সমস্যাটা খুলে বলুন।'

এবার ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি বলি। বৈশাখীতে এক ভদ্রলোক লটারিতে জমি পেয়েছিলেন। সে অনেক বছর হয়ে গেল।' সুভাষদা বাধা দিলেন, 'অনেক বছর আগে সরকার কিছু মানুষকে জমি বিক্রি করেছেন, পরে বিক্রি বন্ধ করে লিজ দিয়েছেন। এটা কোন শ্রেণীতে পড়ে?'

'লিজ।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'কিন্তু ওঁর পক্ষে বাড়ি বানানোর ক্ষমতা ছিল না। জমির দায় ছিল সামান্য, মানে নিজের জন্যে যে টাকা দেওয়া দরকার ছিল, সেটা দিয়ে তিনি ন'শো নিরানব্বুই বছরের জন্যে মালিকানা পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেকদিন পরে তিনি একজন প্রমোটারের দ্বারস্থ হন।'

'প্রমোটার কে?'

'আঢ্যি ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস।'

'অ। গোপাল আঢ্যি। তারপর?'

'সেই প্রমোটর মোট ছটা ফ্ল্যাট বানাবেন এমন প্ল্যান সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে আমাদের চারজনকে চারটে ফ্ল্যাট বিক্রি করেন। তখনও বাড়ি তৈরি হয়নি আমাদের টাকা দেওয়া শেষ হতেই বাড়ি কমপ্লিট হল, আমরাও পজেশন পেলাম।'

'গোপাল ওই ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি করেছে?'

'না, ঠিক বিক্রি নয়। অনেকগুলো ডিড হয়েছিল। একটা বিক্রির ডিড, একটা সাব লিজডিড, একটা ভাড়ার ডিড, একটা উইল, এইরকম। বলা হয়েছিল যদি কখনও

অনুমতি দেয় তাহলে সেলস ডিড রেজিস্ট্রি করানো যাবে। নাহলে ভদ্রলোকের ভাড়াটে হয়ে থাকব আমরা। আর যা টাকা দিয়েছি তা ন'শ নিরানবুই বছরে অ্যাডজাস্ট করা হবে।'

সুভাষদা মাথা নাড়লেন, 'একেবারে ঠিক। সল্টলেকে এটাই রেওয়াজ।'

'আমাদের বাড়ির দোতলার দুটো ফ্ল্যাট জমিওয়ালা প্রমোটারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বাড়িটা তৈরি হয়েছে আমাদের টাকায় তবু জমিওয়ালার স্ত্রী এমন ভাব করেন যেন বাড়ির মালিক তারাই।' মহিলা তাঁর মুখচোখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

'ছেড়ে দিন, উপেক্ষা করুন।' সুভাষদা হাত নাড়লেন।

'তাই করেই তো ছিলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম জমিওয়ালা তাঁদের ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ ওই বাড়িতে আমরা যারা থাকব তাদের কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই। মহিলা কাতর গলায় বললেন, 'দেখুন, কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলাম যখন তখন প্রমোটর বলেছিলেন কোনও ভয় নেই। একটু সস্তা হয়েছিল বলে কিনে নিয়েছিলেন। এখন শুনছি সল্টলেক কর্তৃপক্ষ বাড়ি বাড়ি ঘুরে যাচাই করবেন, আমাদের খুঁজে বের করবেন এবং বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করবেন।'

'তাহলে ওই জমিওয়ালার কাছ থেকে নতুন একজন ফ্ল্যাট নেয় কী করে?'

'তিনি নাকি এন আর আই। এ সব জানেন না। হ্যাঁ, জমিওয়ালা ওই বাড়িতে থাকলে আমরা বলতে পারতাম যে ভাড়াটে হয়ে আছি। উনি চলে গেলে তো আরও বিপদ।' মহিলা বললেন।

এবার প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, 'বিপদ আরও আছে। আমরা যখন পজিশন নিয়েছিলাম তখন প্রতিটি ডিডে প্রমোটর আর জমিওয়ালা সই করেছিলেন। আমরা যদি কাউকে ফ্ল্যাট ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে নতুন ডিডে আমাদের সই চলবে না, জমিওয়ালাকে সই করতে হবে। তিনি যদি বাড়ি থেকে চলে যান তাহলে সই করব কী করে?'

চুপচাপ শুনছিলেন সুভাষদা। এবার বললেন, 'আপনাদের ইলেকট্রিক বিল কি জমিওয়ালার নামে আছে? মিটার কার নামে?

চারজনেই বললেন, 'আমাদের আলাদা আলাদা নামে।'

'গুড। টেলিফোন, টেলিফোন কার নামে?'

'যার নামে ফ্ল্যাট তার নামে।'

'রেশন কার্ড আছে?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'ভোট দিয়েছেন ওই ঠিকানায় যাওয়ার পর?'

'হ্যাঁ। দু'দুবার।'

সুভাষদা হাত নাড়লেন, 'হয়ে গেল। আপনারা যে ওই ফ্ল্যাটগুলোতে দীর্ঘদিন বৈধভাবে বাস করছেন তার প্রমাণ সহজেই করতে পারবেন। শিবের বাবা এতেও আপনাদের ওঠাতে পারবেন না। এ তো আর টালিগঞ্জের নালার জবরদখল করে থাকা নয়, ট্যাকের টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছেন। এই কেনা যদি আইনসঙ্গত বলে সরকার মনে না করে তাহলে ওই ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক মিটার, টেলিফোন আপনার নামে দিল কেন? কী করে ভোটার লিস্টে নাম উঠল। তারপরেও যদি জোরজবরদস্তি করে তাহলে চলে

আসবেন, ভাল উকিল দিয়ে দেব। কোর্টে যতদিন কেস চলবে, ততদিন কেউ আপনাদের বিরক্ত করবেন।'

'কিন্তু কেস যদি বিপক্ষে যায়?'

'নিচের আদালত থেকে ওপরের আদালতে যাবেন। জমিওয়ালার বয়স কত?'

'বলেন তো বাহাত্তর।'

'ও। তাহলে তো হয়েই গেল।' সুভাষদা হাসলেন।

'মানে?'

'কেস শেষ হওয়ার আগেই জমিওয়ালা দেহ রাখবেন। উনি তো একটা উইল করে গেছেন, তাই না? এখন যদি লোকটার বয়স বাহাত্তর হয় তাহলে আর কদিন বাঁচবেন? উনি যে উইল করেছেন তাতে ওঁর ছেলেমেয়ে স্ত্রী সই করেছেন তো?'

চারজনেই একসঙ্গে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'যান। বাড়ি য়ান। কোনও মানুষের মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়, তবে ওই জমিওয়ালা মারা গেলে লাভ আপনাদেরই। এখন চটপট উইলটাকে রেজেস্ট্রি করিয়ে নিন।' হাত তুললেন সুভাষদা।

ওরা নেমে যেতেই আরও দুজন এগিয়ে এল। সপ্তম তড়িঘড়ি বলল, 'সুভাষদা।'

'হ্যাঁ ভাই! জরুরি কাজ নেই তো? বস না।' সুভাষদা বলামাত্র টেলিফোন বাজল। সহকারী রিসিভার তুলে 'কে বলছেন' জিজ্ঞাসা করেই জিভ কাটলেন 'দিচ্ছি দিচ্ছি।' তারপর রিসিভার এগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'মিনিস্টার।'

হাত বাড়ালেন সুভাষদা, রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকালেন, 'সুভাষ বলছি, হ্যাঁ, সবকিছু যদি আমার ওপর ছেড়ে দাও তাহলে মুশকিল। ঠিক আছে, তুমি কখন আসছ। ও কে।'

সপ্তম অবাক হয়ে শুনছিল। কোনও মিনিস্টার ফোন করছেন তা সে জানে না কিন্তু সুভাষদা যে গলায় কথা বলছেন তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে মিনিস্টারই ওঁকে খাতির করছেন।

ঘণ্টা দুয়েক লাগল ঘর ফাঁকা হতে। বাড়ির ভেতর থেকে বারংবার তাগিদ আসছিল স্নান খাওয়া শেষ করার জন্যে। এতক্ষণে সুভাষদার খেয়াল হল, 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমায়। বল, ফ্ল্যাট কেমন দেখতে! রাসেল নিশ্চয়ই ছিল।'

'হ্যাঁ। উনি বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'করুক। তুমি কীরকম দেখলে তাই বল।'

'ভাল। বেশ ভাল। তবে ইলেকট্রিকের মিটার বসেনি।'

'কী করে বসবে। যে ফ্ল্যাট কিনবে তাকেই তো অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওটা এমন কোনও সমস্যা নয়। নিজে না গিয়ে তোমাকে কেন পাঠালাম জানো? ওখানে আমাকে দেখলেই লোকে গল্প তৈরি করবে। এমনিতেই তো রটেছে প্রমোটরদের সঙ্গে আমার নাকি খুব খাতির।'

'আর একটা কথা।'

'বল।'

'ওই বাড়িতে ঢোকার কোনও আলাদা রাস্তা নেই। উল্টোদিকের বাড়িগুলো আর ওই বাড়ির কমন ফ্রন্টস্পেস।'

'তাতে কী এসে গেল! বাড়ির সামনে অন্য বাড়িতে থাকতেই পারে।'

'না না এটা কোনও সমস্যা নয়।' সুভাষদা উঠলেন।

এবার সপ্তম ডলারের ঘটনাটা বলতে গেল। অতগুলো ডলার সে সকাল থেকে পকেটে নিয়ে ঘুরছে। ওগুলোর জন্যে বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল তাকে। তার উচিত এই ডলারগুলো যে হারিয়েছে তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। লোকটা নিশ্চয়ই পুলিসকে জানিয়েছে। আর সুভাষদা ইচ্ছে করলেই পুলিসের বড় কর্তাদের ফোন করে লোকটার নাম্বার জেনে নিতে পারে।

সে বলল, 'সুভাষদা, আর একটা কথা ছিল।' 'ওঃ, এই তোমাদের দোষ। একেবারে কথা শেষ কর না কেন বলত? তুমি কাল যার কাছে গিয়েছিলে, সেই ভদ্রমহিলা সত্যি অসুস্থ। তোমাকে মিছিমিছি ঘোরায়নি।'

'আমি ও বিষয়ে বলছি না। কাল রাত্রে আমি ট্যাক্সিতে মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি।

'বাঃ। তোমার লোক দেখছি খুব ভাল। কত টাকা ছিল?'

'টাকা না, ডলার।'

'ডলার? অবাক হয়ে তাকালেন সুভাষদা, বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা খুলে বল।'

সপ্তম বলল। বলতে বলতে ওর হঠাৎ মনে হল সে যে ডলারগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে তা না বললে কেমন হয়। বললে যদি সুভাষদা চেয়ে বসেন। সে নিজে ডলারের মালিকের কাছে ফেরত দিতে যেতে চায় শুনলে হয়ত প্রস্তাবটা নাকচ করে দেবেন। শোনার পর সুভাষদা বললেন, 'কাল রাত্রেই আমাকে জানানো উচিত ছিল। বিদেশি মুদ্রা, বিশেষ করে ডলার, বেআইনিভাবে রাখতে তুমি পার না। বিরাট শাস্তি হয়ে যাবে। তোমার ভাগ্য ভাল তাই এখনও ধরা পড়নি।'

'আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। ব্যাগটা ট্যাক্সিওয়ালাকে দিলে নির্ঘাত মেরে দিত।'

'বেশ তো, ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা পুলিসের কাছে চলে যেতে পারতে।'

'আমার ঠিক আস্থা হয়নি।'

'আশ্চর্য! তুমি নিজেকে কী ভাব। সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস নেই, পুলিসের ওপর আস্থা নেই, তুমি নিজে কী মহাপুরুষ। যাক গে, যা করেছ করেছে, দাও ব্যাগটি, আমি দেখছি।'

'অত ডলার সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে সাহস পাইনি। সপ্তম বলল।

'অ।' সুভাষদা চোখ বন্ধ করলেন, 'তাহলে বাড়ি চলে যাও। কাউকে পাঠিয়ে আমি ডলার আনতে চাই না। তুমি ঠিক চারটের সময় গেস্ট হাউসে চলে এসো।'

'গেস্ট হাউস মানে?'

'ইন্টার ন্যাশনাল গেস্ট হাউস, বাইপাসে, রুবি হাসপাতালের কাছে। ওখানে গিয়ে দারোয়ানকে বললেন সে তোমাকে দেখিয়ে দেবে আমি কোথায় আছি। ওখানে আমার সঙ্গে কেউ থাকলে ব্যাগটা দয়া করে বের কর না। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ খাওনি, বল, খেয়ে নেবে।'

'না না। আমি বাড়িতে গিয়ে খাব।' সপ্তম বলল।

বাইরে তখনও জনা চারেক ছেলে ছিল। এরা কোনও আর্জি জানাতে আসেনি, সভাষদার চামচে বাহিনীতে ঢুকে পড়ে ডিউটি দিতে আসে। সপ্তমকে ওরা অলস চোখে

দেখল। আর একটু এগোতেই রাসেলের গাড়িটাকে দেখতে পেল সপ্তম। দরজা খুলে দিয়ে রাসেল ডাকল, 'উঠে পড়ুন।'

'আপনি এখানে?'

'আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। খুব খিদে পেয়েছে, চলুন।'

'আমি বাড়ি গিয়ে খাব।' সপ্তম বলল।

'আরে বাড়িতে তো রোজ খান, চলুন আজ আমার সঙ্গে খাবেন।'

অনুরোধ এড়াতে পারল না সপ্তম। বেশ জোরে গাড়ি চালিয়ে চীনে পাড়ায় চলে এল রাসেল।

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে?'

'এখানকার একটা রেস্টুরেন্টের খাবার কলকাতার সেরা।'

মাটির রাস্তা, বাচ্চারা খেলছে, দু'পাশে চীনে ভাষায় লেখা রয়েছে দরজায় দরজায়। বাড়িগুলোও অদ্ভুত। তবে জায়গাটা বেশ নোংরা। রাসেল আমাকে নিয়ে যে বাড়িটার সামনে থামল তাকে রেস্টুরেন্ট ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ভেতরে ঢুকে টেবিল চেয়ার দেখে বুঝলাম ঠিক জায়গায় এসেছি। একজন চীনা বৃদ্ধ এসে অর্ডার নিল। রাসেল বলল, 'বিয়ার খাবেন তো?'

মাথা নাড়ল সপ্তম, 'না। আমি মদ খাই না।' 'দূর মশাই, বিয়ার মদ নয়। যাক গে।' নিজের জন্যে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার চাইল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সুভাষদাকে বলেছিলেন আমি আপনার সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ। ও। তার মানে ফ্ল্যাট নিচ্ছেই।'

'কী করে বুঝবেন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

না নিলে ডেকে পাঠিয়ে অন্য জায়গায় ফ্ল্যাটের সন্ধান দিতে বলল। আপনি সব কথা ওঁকে বুঝিয়ে বলেছেন? রাসেল সিগারেট ধরাল।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো ওঁর কাছে সমস্যা বলে মনে হয়নি।'

'আপনার সঙ্গে ওঁর কতদিনের সম্পর্ক?' রাসেল চোখ ছোট করল।

'খুব অল্পদিন।'

'সরবিট্রেড জানেন? বুকে ব্যথা হচ্ছে, জিভের তলায় দিলে পেসেন্ট বেঁচে যায়। কিন্তু নর্মাল অবস্থায় যদি চুষে খান তাহলে ব্ল্যাক আউট হয়ে যাবে, মাটিতে পড়ে যাবেন প্রেসার নেমে যাওয়ায়। এই সুভাষদা হল সেই জিনিস। শালা, মন্ত্রী নয়, এম এল এ নয়, কিন্তু শেষ কথা।' রাসেলের মুখ কথা বলার সময় বেঁকেচুরে যাচ্ছিল।

সপ্তম হতভম্ব হয়ে গেল। সুভাষদা সম্পর্কে রাসেল যে এমন কথা বলতে পারে সে কল্পনাও করেনি। সরবিট্রেড অসুস্থ মরণাপন্ন মানুষের উপকার করে বলেই সে শুনেছে। সুস্থ মানুষ যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরবিট্রেড চোষে তাহলে কী হয় সেই প্রশ্নের উত্তর কোনওদিন খোঁজেনি সে। আজ শুনে মনে হল, হতে পারে! প্রাণ দেয় যে ওষুধ তা অপব্যবহারে প্রাণ নিয়েও নিতে পারে। আর সুভাষদা হল সেই সরবিট্রেড? এবার হাসল সপ্তম।

বিয়ার এসে গেল। বোতলের গায়ে জলের বিন্দু, ঝাপসা ঝাপসা। গ্লাসে সন্তর্পণে ঢালল রাসেল যাতে ফেনা উপচে না পড়ে। তারপর লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ।'

'সুভাষদা কি আপনার উপকার করেননি?'

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়ই। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। মিথ্যে কথা বলব না, ওই জমিটা সুভাষদার সাহায্য ছাড়া আমি পেতাম না। ওই প্রজেক্টে অন্তত দশ লক্ষ টাকা প্রফিট আমি করব এবং সেটা সুভাষদার জন্যে। নেট প্রফিট নয়, গ্রস প্রফিট।'

'নেট প্রফিট কত হবে?'

'এর উত্তর আপনাকে কেন দেব?'

'না। আপনি সুভাষদার ওপর রাগ করছেন তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

'দূর মশাই। আমি রাগ করতে কেন যাব? আমার অবস্থা হল, ওই যে, বলে না, না পারছি গিলতে না ওগরাতে। এখন ওঁর খাতায় আমার নাম উঠে গেছে অতএব যা বলবে তাই করতে হবে আমাকে।' বিয়ারে আবার চুমুক দিল রাসেল।

'সুভাষদা ওই ফ্ল্যাট যার জন্যে কিনছেন তিনি আপনাকে বেশি টাকা দেবেন না, এই তো? 'না। প্রায় কস্ট প্রাইসে দিতে হবে। আমার প্রফিট কমে যাবে যাক। কিন্তু শুধু তো এই একটা ব্যাপার নয়। সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হচ্ছে। রাসেল, লোকটা যাচ্ছে ওর হাতে বিশ হাজার পাঠিয়ে দাও। রাসেল, ভি আই পি-র পাশে একটা জমি খালি করা হচ্ছে, টাকা রেডি করো। আরে আমি ওই জমিটা নেব কিনা, আমার আর প্রজেক্ট করার ইচ্ছে আছে কিনা তা জানার প্রয়োজন নেই। আমি যদি না বলি তাহলে ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাব।' রাসেল বিয়ার শেষ করল।

সমস্যাটা বুঝতে পারল সপ্তম। অভিমন্যুর মত অবস্থা, ঢুকে গেলে বেরনোর রাস্তা বন্ধ। তার নিজের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। ডলারের কথা বলার পর সুভাষদা যা বললেন তাতে বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় ওই নোটগুলো আর আসল মালিক ফেরত পাবে না, অথচ সে এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না। আপত্তি জানানোর সাহসই পাচ্ছে না।

এই সময় একটি লোক রেস্টুরেন্টে ঢুকল। এতক্ষণ তারা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। লোকটা চারপাশে তাকিয়ে পুরুষের ছবি আঁকা দরজাটার দিকে চলে গেল। ওর চেহারা বেশ শক্তপোক্ত।

হঠাৎ রাসেল বলল, 'এতক্ষণ তো নিজের কথা বলে গেলাম, আপনার সমস্যা কি?'

'আমার কোনও সমস্যা নেই।' সপ্তম হাসার চেষ্টা করল। 'মিথ্যে কথা বলছেন। সমস্যায় না পড়লে কেউ সুভাষদার কাছে যায় না। আর ওইটেই হয়ে যায় ওঁর অস্ত্র।' আবার খানিকটা বিয়ার গ্লাসে ঢাললো রাসেল।

'আমার কাজ নেই। একজনের রেফারেন্সে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম যদি কোনও ভাল কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

'পেয়েছেন?'

'না। সুভাষদা চাকবি করতে নিষেধ করেছেন। চাকরিতে আর কত টাকা আমি পেতে পারি! তার চেয়ে ফ্রিল্যান্স করলে অনেক বেশি রোজগার করতে পারব।'

'আপনাকে ফ্ল্যাট দেখতে পাঠানো কি ওই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মধ্যে পড়ছে?'

'না, না, ওটা স্রেফ অনুরোধে যাওয়া।'

এখন অনুরোধ বলে মনে হচ্ছে, পরে বুঝবেন এর নামই আদেশ।'

সপ্তমের হঠাৎ মেজাজ গরম হয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি তখন থেকে সুভাষদার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, ওর সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? ওঁর কাছে যাওয়ার কি দরকার?'

'আপনি রেগে গেছেন।'

'হ্যাঁ। আপনি যার কাছে দুধ পাচ্ছেন তার লাথি কেন সহ্য করবেন না?'

'হ্যাঁ, করছি। দমবন্ধ করে করছি। কারণ এটা না করলে আমার ভবিষ্যৎ কী হবে তা আমি অনুমানও করতে পারছি না। যাক গে, এ সব আপনাকে বলে কোনও লাভ নেই।' রাসেল বলল।

সপ্তম উঠল, 'আমি একটু আসছি।'

পুরুষের ছবি আঁকা দরজার দিকে যেতে যেতে তার মনে হল, বিয়ার খাচ্ছে রাসেল আর প্রয়োজন হল তার। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই পুরুষ কণ্ঠ কানে এল, 'হাঁ জি, জি. উনকো মোবাইল নাম্বার নাইন এইট থ্রি ফাইভ ফাইভ ওয়ান জিরো ওয়ান টু জিরো। 'ইট'স এ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। জি।' সপ্তম ঢুকে গিয়েছিল একটা খোপের মধ্যে। কথাগুলো কানে আসছিল। যদিও লোকটার গলার স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল সে চাইছে না অন্য কেউ শুনুক, কিন্তু তার গলা এত হেঁড়ে যে স্বর নামাতে পারছিল না। যার সঙ্গে কথা বলছিল সে নিশ্চয়ই ওর বস। লোকটা টয়লেট থেকে বেরিয়ে গেল। মোবাইল নাম্বারটা কানের ভেতর লেগে রইল সপ্তমের, নাইন এইট থ্রি ফাইভ ফাইভ ওয়ান জিরো ওয়ান টু জিরো। এরকম অদ্ভুত নাম্বার সে কখনও শোনেনি। কলকাতায় সাধারণত, নাইন এইট থ্রির পরে হয় ডাবল জিরো, নয় ডাবল ওয়ান অথবা জিরো ওয়ান হয়। কখনও ডাবল ফাইভ নাম্বারের কথা শোনেনি। তার ওপর ওয়ান জিরো, ওয়ান টু জিরো। ভোলার উপায় নেই।

টেবিলে পৌঁছে সপ্তম দেখল তখনও খাবার আসেনি। রাসেলের বিয়ারের বোতল শেষ। ওই লোকটি খানিকটা দূরে ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে।

প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যে সপ্তম বলল, 'ওই লোকটাকে আপনার কোন প্রদেশের বলে মনে হয়?'

'কোন লোক? ও। মুখই দেখতে পাচ্ছি না। শরীরের গড়ন বলছে দিল্লি, হরিয়ানার মানুষ। কেন?'

'লোকটা কোনও রহস্যজনক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে।'

'কী রকম?'

'টয়লেটে ঢুকে এতক্ষণ মোবাইলে কথা বলে গেছে। গলার স্বর নামাবার চেষ্টা করেও পারেনি। আর অদ্ভুত একটা মোবাইল নাম্বার শুনলাম ওর মুখে।'

'অদ্ভুত?'

'হ্যাঁ। নাইন এইট থ্রি ফাইভ ফাইভ ওয়ান জিরো ওয়ান টু জিরো।'

'দূর। ভুল শুনেছেন। এরকম নাম্বার কলকাতায় চালু নেই।'

'তাই তো অদ্ভুত বললাম।'

এই সময় বোরখা পরা একজন মহিলা রেস্টুরেন্ট ঢুকে সোজা লোকটির টেবিলে চলে গেল। মহিলা বসলেন লোকটির মুখোমুখি, অর্থাৎ সপ্তমদের দিকে মুখ করে কিন্তু বোরখা থাকায় সেই মুখ দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না।

খাবার এসে গেল। পরিমাণে অনেক। তিনটে প্লেট চারজনের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ ওরা দুজন। নষ্ট হবে বলে মনে হয়েছিল কিন্তু পরে সপ্তম দেখেছিল রাসেল খেতে ভালবাসে। এখানে সে আগেও এসেছে, কী পরিমাণ খাবার এরা দেয় জেনেই অর্ডার দিয়েছে। একাই তিনভাগ খাবার খেয়ে নিল অনায়াসে।

সপ্তম মাঝে মাঝে উল্টোদিকের বোরখা পরা মহিলাকে দেখছিল। মুখ চোখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মাথা ঘোরানোর কারণে যে আদলটা ফুটেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনিও এদিকেই তাকাচ্ছেন। তিন চারবার এরকম হওয়ার পর খাওয়া যখন শেষ তখন মহিলা কিছু বলতেই লোকটি ঘুরে এদিকে তাকাল। তারপর সটান চেয়ার ছেড়ে চলে এল সামনে। বেশ রাগী গলায় চোস্ত উর্দু মেশানো হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কখনও বোরখা পরা মহিলা দ্যাখোনি?' রাসেল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলতে চাইছ?'

'আর যদি একবার আমাদের টেবিলের দিকে তাকাও তাহলে মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব।' লোকটা চিৎকার করে বলল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চেয়ারে বসে চেঁচিয়ে লোকটিকে ফিরে আসতে বলল।

রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?' মহিলা প্রায় ধমকের গলায় লোকটিকে কিছু বলতে সে আর কথা না বলে ফিরে গেল নিজের টেবিলে। দূরে দাঁড়িয়ে দোকানের মালিক চীনে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমরা শান্তি ভালবাসি। কিছুদিন হল এইরকম কয়েকজন আমার রেস্টুরেন্টে আসছে। ওদের মেজাজ দেখলেই ভয় লাগে। আপনারা যে পাল্টা ঝামেলা করেননি এই জন্যে ধন্যবাদ।'

চীনে লোকটি চলে গেলে রাসেল পকেট থেকে মোবাইল বের করল। বোতাম টিপে কানে চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখন কোথায়? 'আমি ব্লু ড্রাগন রেস্টুরেন্টে বসে আছি। এখানে একজন আমাকে বলেছে মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবে!' 'হ্যাঁ, চায়না টাউনে।' 'ঠিক আছে।' মোবাইল বন্ধ করে পকেটে ঢোকাল সে। ওরকম ছোট আর হালকা মোবাইল কখনও দেখেনি সপ্তম।

'কাকে ফোন করলেন?' সে জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

হেসে ফেলল রাসেল, এখানেও সুভাষদা।'

'তার মানে?'

'এখন প্রমোটারি ব্যবসা করতে গেলে আগে মাসলম্যান ঠিক রাখতে হয়। ছোটখাট মাসলম্যানদের দিয়ে কোনওকাজ হবে না। আপনাকে দাদার সাহায্য নিতে হবে। সিমেন্ট, বালি, ইট, মিস্ত্রি, কুলির সঙ্গে সেই বড়দাকে যে দক্ষিণা দিতে হয় সেটাও যোগ করতে হবে। করলে বাড়ির কস্ট প্রাইস উঠবে। লাইনে নামার আগে আমি ছোটখাট দু-একজনকে চিনতাম। জমির দখল নেওয়ার আগে একজন এলেন। বললেন, আপনি সুভাষদার ভাই, আমিও তাই, এ সব নিয়ে আপনাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না। পরে জানলাম ভি আই পি বাইপাসে যে তিনজন বড়দাদা আছেন ইনি তাদের অন্যতম। বাড়ি বানাতে কোনও

সমস্যা হয়নি, কেউ একটা পটকাও ফাটায়নি। সেই বড়দাদাকে খবরটা দিলাম। অপমান সহ্য করতে খুব খারাপ লাগে আমার।'

রাসেল জল খেল। বিয়ার খাওয়ার পর থেকেই লোকটিকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু আপনি ফোন করলেই এই বড়দাদা আসবে কেন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'এটা তো আপনার ব্যবসার মধ্যে পড়ে না।'

'টাকা যেমন মানুষকে অকৃতজ্ঞ করে আবার কৃতজ্ঞতার ভান করতেও শেখায়। না এলে পরের কাজটার সময় আমি সুভাষদাকে বলব অন্য দাদাকে পাঠাতে, এটা ও জানে।'

রাসেলের কথায় যুক্তি আছে। সপ্তম লোকটিকে দেখছিল। এখন বোরখা পরা মহিলা এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। লোকটা পকেট থেকে সেট বের করে নাম্বার দেখে উঠে চলে গেল টয়লেটে। বোরখাধারিণী একাই বসে থাকল। সপ্তমের অস্বস্তি হচ্ছিল। এখনই এখানে একটা ঝামেলা হতে পারে। কিন্তু রাসেল না উঠলে এখান থেকে তার চলে যাওয়া শোভনীয় নয়। হঠাৎ তার মনে হল সে কত বোকা। সুভাষদার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে তার মনে হয়েছিল এই লোকটাই তার দাদা, ফিলজফার এবং গাইড। খুব শান্তিপ্রিয় এবং পরোপকারী মানুষ বলে মনে হয়েছিল সুভাষদাকে। সুভাষদাই তাকে পাঠিয়েছিল জ্যোতি দত্তের কাছে। শিক্ষিত মানুষ জ্যোতি দত্ত একশভাগ কাজপাগল। সুভাষদা চাইছেন সে পরিশ্রম করে রোজগার করুক। কেউ শুয়োরের বাচ্চা বলে গালাগাল দিলেও বিন্দুমাত্র রাগ না করে হেসে লোকটাকে বিভ্রান্ত করুক। তাতে লোকটা তাকে কাজ দিতে বাধ্য হবেই। আজ রাসেলের সঙ্গে বসার পর সুভাষদার আর এক চরিত্রের খবর সে জানতে পারছে। এমন হতে পারে এর অনেকটাই রাসেল তৈরি করেছে। অসন্তোষ থেকে মানুষ যা করে থাকে।

এই সময় মোটরবাইকের আওয়াজ ভেসে এল। ওপাশের জানলা দিয়েদেখা গেল তাদের। চারটে মোটর বাইকে আটজন লোক। বাইকগুলো থামল রেস্টুরেন্টের সামনে।

রোগা, পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে, মুখে বসন্তের দাগ, সামনে টাক, খুব নিরীহ চেহারার একটি লোক রেস্টুরেন্টে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে সোজা চলে এল ওদের টেবিলে। খুব বিনীত গলায় বলল, ভাইসাব বসে কথা বলতে পার?'

'নিশ্চয়ই।' রাসেল সোজা হল।

'আপনি শুধু বলে দিন কে আপনার মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবে বলেছে তাহলে আমার ছেলেরা লোকটার মুণ্ডু নিয়ে একটু ফুটবল খেলতে পারে। লোকটা বসল।

'ওই যে বোরখা পরা মহিলা বসে আছেন, ওর উল্টোদিকে বসেছিল, এখন মোবাইল-এ ফোন করতে টয়লেটে গিয়েছে।' রাসেল জানিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা উঠে চলে গেল টয়লেটে। সপ্তম অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। বড়জোর ত্রিশ ইঞ্চি ছাতি হবে লোকটার অথচ টয়লেটের দিকে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। যার উদ্দেশ্যে গেল সে যদি থাপ্পড় মারে তাহলে একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'এ একজন বড়দাদা?'

'হঁ! প্রথম যেদিন ওকে দেখি আমারও মনে প্রশ্ন জেগেছিল। তিলজলায় ওর বাড়িতে যদি যাওয়ার সুযোগ পান তাহলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। আর সব কিছু করেছে দাদাগিরি করে।

'লোকটা খুন করতে পারে?'

হেসে ফেলল রাসেল, 'প্রমাণ না রেখে করে। কেউ মুখ খোলে না। পুলিস দু'দুবার াক্ষী পেয়েছিল বলে ধরতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই ছেড়ে দিতে বাধ্য য়েছে।'

'সে কী? কেন?'

'সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই।'

এই সময় বড়দাদা বেরিয়ে এল। ওর পরনের পাঞ্জাবিতে একটিও ভাঁজ পড়েনি। ারধরের কোনও চিহ্ন শরীরে নেই। লোকটি চেয়ারে বসে রুমালে মুখ মুছল, 'আপনাকে একটা কথা বলি ভাইসাব। ও আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আসবে, আপনি ক্ষমা করে দিন।'

'তার মানে? একটা লোক ওই কথা বলে আমাকে শাসালো—।' রাসেল উত্তেজিত। খুব অন্যায় করেছে। কিন্তু ওর মাথা গরম ছিল।'

'আপনি কি বলছেন? মাথা গরম ছিল বলে যা ইচ্ছে তাই বলবে!'

'আপনি একটু ধৈর্য ধরুন, আমি তো আছি।'

এই সময় লোকটি বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে। সোজা এল সামনে। তারপর হাত বাড়াল করমর্দনের জন্যে, 'আই অ্যাম সরি। ওকে!'

'ব্যস? হয়ে গেল? গলা তুলল রাসেল।

'জি, মাপ কর দিজিয়ে। আপনি এঁর বন্ধু, তাই আমারও বন্ধু।' লোকটা হাত নামাল।

রাসেল দাদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনে হচ্ছে আপনাদের পরিচয় আছে!'

'না। ছিল না। টয়লেটে গিয়ে ওর পরিচয় পেলাম। আর ওই যে বোরখা পরে যে বসে আছে সে ওর কেউ হয় না। মানে, কোনও মহিলা বোরখা পরে ওর কাছে আসেনি।'

'মাইগড! তাহলে।'

'উত্তেজিত হবেন না। ওদের গোপন কথা বলার জায়গা নেই বলে এখানে এসেছে।

সপ্তম কথা না বলে পারল না, 'কিন্তু উনি যখন ওকে নিষেধ করছিলেন তখন আমি পরিষ্কার মহিলার গলা শুনতে পেয়েছি।'

দাদা সপ্তমের দিকে তাকাল। তারপর লোকটিকে ইশারা করল। লোকটি ফিরে গেল বোরখার কাছে। নিচু গলায় কিছু বলল। বোরখা রাজি হচ্ছিল না প্রথমে। শেষ পর্যন্ত অনুরোধে উঠে এল সামনে। পুরুষালী গলায় বলল, 'আমি মেয়েদের গলায় কথা বলতে পারি।'

কথাগুলো হিন্দিতে বলল এবং যা কোনও মেয়ের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

রাসেল জিজ্ঞাসা করল। আপনার বন্ধু ওরকম উত্তেজিত হয়েছিল কেন?'

'ও ভেবেছিল আপনারা আমাকে মেয়ে মনে করে কৌতূহলী হয়েছিলেন। একেবারে পুরুষ কণ্ঠ।

দাদা বলল, 'ঠিক আছে ভাইসাব। আপনারা যেতে পারেন।'

ওরা কোনও কথা না বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। দাদা ওদের যাওয়া দেখল। তারপর বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না ভাইসাব। আমরা যারা

কলকাতায় দাদাগিরি করি তারা একটা ব্যাপারে এড়িয়ে যেতে চাই। কোনও ঝামেলায় যেতে চাই না।'

'তার মানে আপনারা হজম করতে বাধ্য হন।'

'বলতে পারেন।' কিন্তু এই লোকটি তো ক্ষমা চাইল আপনার কাছে।'

'এর ওপর এমন নরম হলেন কেন?' রাসেল জিজ্ঞাসা করল।

'নরম না হয়ে ওকে আমি শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু তারপর যে যুদ্ধটা শুরু হয়ে যেত সেটা সামলানোর ক্ষমতা আমার নেই।'

'কার সঙ্গে যুদ্ধ'

'কলকাতার কেউ না। কলকাতায় হলে আমি কেয়ারই করতাম না। আপনার ইজ্জত মানে আমার ইজ্জত। কিন্তু একটা অনুরোধ, এসব কথা সুভাষদাকে বলবেন না।

'কেন?' রাসেল জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'তাতে ঝামেলা আরও বাড়বে।'

'কিন্তু যুদ্ধটা কার সঙ্গে বললেন না?' সপ্তম জানতে চাইল।

'ইনি কে?' দাদা জিজ্ঞাসা করল।

'আমার সঙ্গে যখন বসে আছেন তখন বন্ধু বলেই ভাবতে পারেন।'

'কলকাতায় আমরা এখন একজনকে এড়িয়ে চলতে চাই। নিজেরা যে যেমন করে খাচ্ছি তা নিজেরাই সামলে নিতে পারছি। কিন্তু আমাদের নামের লিস্ট চলে গেছে তার কাছে। কোনও কোনও কাজ তাই তার হুকুমে কেউ কেউ করছে। আবার আমাদের এড়িয়েও কাজ করতে লোক পাঠাচ্ছে সে। বেশি রহস্য করে লাভ নেই, সবাই ভাই বললেই তাকে বোঝে। আচ্ছা চলি।' নমস্কার করে কয়েক পা এগিয়েই আবার ফিরে এল সে, 'ভাইসাব, আমাকে একজন একটা ফ্ল্যাটের কথা বলেছিল। কিনবে। আমি সুভাষদার কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম। সুভাষদা কি আপনাকে কিছু বলেছেন?

'ও। আপনার ক্যান্ডিডেট?'

'হ্যাঁ। আমি সুভাষদাকে বলেছিলাম সস্তায় দিতে।'

'সুভাষদা আমাকে বলেছেন।'

'কিন্তু ফ্ল্যাটের আর দরকার হবে না। লোকটা কাল খুন হয়ে গিয়েছে।'

'ও।'

লোকটা চলে গেলে সপ্তম বলল, 'যাক, আপনার ভাল হল।'

'হ্যাঁ। হল। তবে পুরোটা নয় প্রফিটের একটা পার্সেন্টেজ নেওয়ার জন্যে ও লোক পাঠাবে। বলবে আমাকে তো পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না।'

'মানে?'

'আমি ওই ফ্ল্যাট অন্য কাউকে বিক্রি করলে যে লাভ করব তার একটা অংশের ও দাবিদার হবে। হয়ত সুভাষদা সেই খবরটা জানবে না। রাসেল বুঝিয়ে বলল। বিল মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল মোটর বাইকগুলো ফিরে যাচ্ছে। তাদের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মনে পড়ে যেতে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'ও ভাই যাকে বলল সে কোথায় থাকে?'

রাসেল তাকাল, 'দুবাই-এ।'

শারজা মানে ক্রিকেট আর দুবাই বললেই দাউদ ইব্রাহিমের কথা মনে পড়তে বাধ্য। সপ্তমের চোখ বড় হয়ে গেল। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে রাসেলের গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। কলকাতায় যারা মাস্তানি করে বেঁচে আছে, তাদের সংখ্যা কত? নিশ্চয়ই কয়েক হাজার। সপ্তমের পাড়াতেই তো এরকম চারজন আছে যাদের মুখ চটপট মনে পড়ল। তারা যখন হুঙ্কার ছাড়ে তখন মনে হয় সুন্দরবনে আর কোনও বাঘ নেই। কিন্তু সংঘর্ষ যখন মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের মুখে দাদাদের নাম শোনা যায়। 'ঠিক আছে, আজই লালনভাইকে বলব, তোর চোদ্দপুরুষকে হাইড্রেনে ঢুকিয়ে দেবে।' 'রাখ রাখ, লালনভাই দেখাচ্ছে। আমাকে চমকাচ্ছিস তুই। আমি কার লোক ভুলে গেছিস?' অর্থাৎ পাড়ার এইসব মস্তানরা কারও না কারও লোক। সেই কেউ কেউ কলকাতা শাসন করে। এদের সংখ্যা কত? রাসেলকে কথা বলতে সে চটপট বলল, 'আটচল্লিশ'।

'আটচল্লিশ? সংখ্যাটা পেলেন কী করে?'

'সোনারপুর থেকে ব্যারাকপুর আটচল্লিশটা এলাকায় ভাগ করে নিয়েছে ওরা।'

'আপনি কী করে জানলেন।'

'প্রমোটরি ব্যবসা করে যাকে খেতে হয়, তাকে এই খবরগুলো রাখতেই হবে।'

'আপনি শুনলেন, এই আটচল্লিশ দলের নামের লিস্ট দুবাইতে চলে গেছে। তার মানে দুবাইয়ের ভদ্রলোকের আদেশে ওদের চলতে হবে?'

'হ্যাঁ। সম্রাটের আদেশ রাজাকে মানতেই হবে।'

'যে মানতে চাইবে না?'

রাসেল তাকাল, 'এদের কাউকে পাগলা মশাও কামড়াবে না যে ওই কথা ভাববে।

গাড়ি চলছিল বাইপাশ ধরে উল্টোডাঙার দিকে। রাসেল বলল, 'এই আটচল্লিশ জনের সবাই চাইবে দুবাইয়ের স্নেহধন্য হতে। কিন্তু তিনি তো কাঙালি ভোজন করাতে আসেননি। দেখুন, প্রত্যেকের বায়োডাটা ওঁর কম্পিউটারে চলে গেছে। সেখান থেকে ঝাড়াই বাছাই করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। হয়ত কলকাতার চার অংশের জন্য চারজন উপ-ডন নির্বাচিত হবেন। কলকাতা আরও অনেক কিছুর মত মাস্তানির ওপর কর্তৃত্ব হারাল।

আচ্ছা, ব্যাপারটা কী হল? কাল রাত্রে বুড়োদা বৃষ্টিতে হাঁটার সময় বলেছিলেন, ইন্ডিয়ান অয়েলের এজেন্সির চেয়ে দুবাইয়ের এজেন্সি পেলে বেশি লাভ হবে। আজ সকালের কাগজে ছাপা হয়েছে, ইমরান রহমান নামে যে লোকটাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে সে স্থানীয় মাস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই কলকাতায় এসেছিল। আজ একটু আগে ওই দাদার মুখেও একইরকম কথা শোনা গেল। তার মানে কি এই, খবরটা হাওয়ায় উড়ছে?

'এখন কোথায় যাবেন?'

প্রশ্নটা শুনে সজাগ হল সপ্তম। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বাড়ি'।

'কোথায় নামালে সুবিধে হবে?'

'উল্টোডাঙায় নামিয়ে দিন। ট্যাক্সি ধরতে হবে।' সপ্তম বলল।

'এখন অটো-বাস ফাঁকা পাবেন।'

'না, না। আমি ট্যাক্সিতেই যেতে চাই।'

রাসেল ওর দিকে তাকাল, 'গাড়ি সঙ্গে না থাকলে আমি কিন্তু অটো বা বাসে চড়ি।'

'আমিও। যদিও আমার গাড়ি নেই। কিন্তু আজ আমি কোনও ঝুঁকি নিতে পারছি না।' বলতে বলতে উল্টোডাঙা এসে যাওয়ায় ভ্যানটা দাঁড়িয়ে গেল।

দরজা খুলে নামছিল সপ্তম. রাসেল একটা কার্ড বের করে এগিয়ে ধরল, 'এটা রাখুন। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। দরকার হলে যোগাযোগ করবেন।'

কার্ড নিল সপ্তম। দেখল। তারপর বলল, 'আমার তো কোনও কার্ড নেই।'

'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। নাম্বারটা বলল সপ্তম।

মোবাইলের ফোনবুকে এন্ট্রি করে নিল রাসেল। তারপর হাত নেড়ে চলে গেল ভি আই পি ধরে। কার্ডটার দিকে ভাল করে তাকাল সপ্তম। দুটো সরকারি নাম্বার, একটা মোবাইলের।

বাঙালির নাম রাসেল আগে ভাবা যেত না। রাশিয়াভক্ত এক ভদ্রলোক তাঁর তিন ছেলের নাম রেখেছিলেন স্ট্যালিন, লেনিন, বুলগানিন। নামে কী এসে যায়!

কিন্তু রাসেলকে সপ্তমেরও ভাল লেগেছে। তার চেয়ে বছর আট-নয়ের বড়। কিন্তু এর মধ্যেই প্রমোটর হয়ে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে, টাকাও করেছে। কিন্তু কথাবার্তা বা ব্যবহারে তার কোনও প্রকাশ নেই। এই ডলারগুলোর কথা ওকে বললে কেমন হত?

ট্যাক্সি নিল সপ্তম। খামোকা পয়সা নষ্ট হচ্ছে তার। এই ডলারগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। এসব খরচ কি আর ফেরত পাওয়া যাবে? সুভাষদার কথা মনে এল। আজই ডলার নিয়ে দেখা করতে বলেছেন। কথাটা শোনার পর থেকেই তার মনে হচ্ছে যে, ওগুলো সুভাষদার প্রয়োজনেই লাগবে। ইমরান রহমান নামে যে লোকটি এখন পুলিস হেপাজতে আছে তার কাছে কখনওই পৌঁছবে না। এ যেন নেপোয় মারে দই। কিংবা সেই উদাহরণটা, হাঁস কষ্ট করে ডিম পারে আর দারোগাবাবু তার ওমলেট খায়। তারও মাথার ঠিক ছিল না, সাততাড়াতাড়ি সুভাষদাকে বলতে গেল।

মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল সপ্তম। এখন দুপুর শেষ হব হব। মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে আছে। ও দুপুরে খাবে না এই খবরটা ফোনে মাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বেল বাজাবার পর মা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'কাজ ছিল।' গম্ভীর মুখে বলল সপ্তম।

'একটা লোক তোর খোঁজে দু'বার এসেছিল।' মা বললেন।

'কি নাম?'

'নাম বলেনি। প্রথমবার এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, সপ্তম চ্যাটার্জি এ বাড়িতে থাকে কিনা? যখন শুনল তুই বাড়িতে নেই. চলে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার এসে জিজ্ঞাসা করল তুই ফিরেছিস কিনা। আর আসেনি।'

'তুমি খেয়ে নিয়েছ?'

'এই খেলাম। আর কতক্ষণ বসে থাকব?'

'ভাল করেছ। আমি খেয়ে এসেছি। আমার ফোন করা উচিত ছিল।'

ঘরে ঢুকে ডলারগুলো বের করল সে। কিছু করার নেই। এগুলো সুভাষদার পকেটেই যাবে। ওঁর অনুরোধ যে আদেশের নামান্তর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে রাসেলের

কার্ডটা বের করতেই মনে পড়ল গতরাতে ট্যাক্সি থেকে নেমে সেই অ্যামওয়ে করা মহিলা একটা কার্ড তাকে দিয়েছিল। তালেগোলে ওটার কথা ভুলে গিয়েছে সে। গতরাতে পকেট থেকে যেসব জিনিস বের করে টিবিলে রেখেছিল তার মধ্যে কার্ডটাকে দেখতে পেল সপ্তম। সুজলা দত্তগুপ্ত। সুজলা কারও নাম হয় এই প্রথম জানল। ঠিকানা মদনমোহন মিত্র লেনের, টেলিফোন নম্বরও রয়েছে। এই কার্ডের মালিক অবলীলাক্রমে ঢ্যামনা ইত্যাদি শব্দ পাবলিকলি বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। এঁর কথা শুনে ট্যাক্সি ড্রাইভার নিশ্চয়ই সোনাগাছির মহিলা বলে ভুল করেছিল। অথচ মহিলা অ্যামওয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বোঝা সত্যি মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

সপ্তম ঠিক করল একটু বিশ্রাম নিয়ে সুভাষদার নির্দেশমত পৌঁছে যাবে। মিনিট দশেক বাদে বেল বাজল। তারপর মা এসে জানাল, সেই লোকটা আবার ঘুরে এসেছে। নিশ্চয়ই শেয়ার সংক্রান্ত কোনও খবর দরকার লোকটার। পাজামার ওপর পাঞ্জাবি চাপিয়ে বাইরের ঘরে এসে সে দরজা খুলতেই দেখল একটি রোগা মানুষ মোপেডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখামাত্র লোকটা চটপট এগিয়ে এল, 'নমস্তে।'

'নমস্কার'। লোকটিকে কখনও দেখেনি সে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের প্রচুর মানুষ কলকাতায় বাস করে হাফ বাঙালি হয়ে গিয়েছে। এ যেন তাদের একজন।

লোকটি হিন্দিতে বলল, 'আপনাকে বাধ্য হয়ে বিরক্ত করছি। সপ্তম চ্যাটার্জি আপনার নাম?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'একটু ভেতরে গিয়ে কথা বলতে পারি?'

ইতস্তত করল সপ্তম, তারপর বলল, 'আসুন।'

বাইরের ঘরের সোফায় বসে লোকটা বলল, 'আমি বাঙালি নামের খবর বেশি জানি না। কিন্তু সবাই বলছে এরকম নাম, মানে আপনার নামের মত নাম নাকি খুব কম শোনা যায়। তার প্রমাণও পেলাম। মণীন্দ্রনাথ কলেজ থেকে গিরিশ অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার মোড়, আবার এদিকে আপনার বাড়ি পর্যন্ত সকাল থেকে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনি ছাড়া অন্য কোনও সপ্তম চ্যাটার্জি পাইনি।' লোকটা রুমালে মুখ মুছল নিশ্চিন্তে।

'আপনি এতটা জায়গায় আমার খোঁজে ঘুরেছেন?' অবাক হয়ে গেল সপ্তম।

না ঘুরে উপায় ছিল না। ট্যাক্সিওয়ালাটা বলল, ওর পেছনের সিটে যে বসেছিল সে নেমে গেছে মণীন্দ্রনাথ কলেজের সামনে। কোনও ঠিকানা ওর জানা নেই। শুধু সেই লোকটা নিজের নাম বলেছিল, সপ্তম চ্যাটার্জি। ব্যস এটুকু সম্বল করে খোঁজা শুরু করেছিলাম। দুপুরের মধ্যে জানতে পারলাম, এই বাড়িতে সপ্তম চ্যাটার্জি বলে একজন থাকেন।' লোকটি বলল।

সপ্তমের বুকের ভেতর তখন দমকলের আওয়াজ। এই লোকটা তার কাছে কেন এসেছে তা আন্দাজ করতে আর অসুবিধা হচ্ছে না। কী করবে সে?

লোকটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনাকে ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি গতরাতে বৃষ্টির সময় সদর স্ট্রিটের মোড় থেকে ট্যাক্সি নিয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল সপ্তম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো ট্যাক্সিওয়ালাকে আমার নাম বলিনি।'

'ট্যাক্সিওয়ালাকে কোনও প্যাসেঞ্জার নিজের নাম কেন বলবে? ওই লোকটা খুব লোভী। সামনের সিটে আরও দুজন লোক তুলেছিল। তাদের একজন মহিলা। সেই মহিলা কি আপনাকে কোনও কার্ড দিয়েছিল?' লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল সপ্তম।

'গুড। তখন মহিলা আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে আপনি বলেছিলেন সপ্তম চ্যাটার্জি। ঠিক?'

'এসব কথা আপনি জানলেন কী করে?'

লোকটি হাসল। 'খুব সোজা ব্যাপার। ট্যাক্সিওয়ালা বলেছে। মানে বলতে বাধ্য হয়েছে। তারপর আমি তো খুঁজতে লেগে গেলাম। মদনমোহন লেনে গিয়ে সেই লোকটার দেখাও পেয়ে গেলাম। লোকটা ওর বাড়ির রকে বসেছিল। সপ্তম চ্যাটার্জিকে খুঁজছি শুনে বলল ও পাড়ায় ওই নাম কারও নেই। একজনকে কাল রাত্রে ট্যাক্সিতে ওই নাম বলতে শুনেছিল। এরপর ও যা বলল, তার সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারের স্টেটমেন্ট মিলে গেল।'

'তার মানে, আপনি ওই সুজলা দত্তগুপ্তের স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছেন?'

'সুজলা দত্তগুপ্ত। তিনি কে?

'আপনি যার সঙ্গে কথা বলেছেন, তার স্ত্রী।'

'ও, হ্যাঁ, এটাও ঠিক, ট্যাক্সিওয়ালা আর ভদ্রলোক আপনার চেহারার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে কোনও পার্থক্য নেই। হুবহু মিলে যাচ্ছে।' লোকটি হাসল।

সপ্তম জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম জানতে পারি।'

'নিশ্চয়ই। আনোয়ার রশিদ। রশিদ বলেই ডাকবেন।'

'আপনি ট্যাক্সিওয়ালার কাছ থেকে সব খবর নিয়ে পুরো শ্যামবাজার চষে আমাকে খুঁজে বের করেছেন। হঠাৎ আমি এত গুরুত্ব কেন পাচ্ছি, জানতে পারি কি?'

'বুঝতেই পারছেন এত কষ্ট করে কেন আপনাকে খুঁজে বের করলাম।' রশিদ বলল। কোনও শব্দ উচ্চারণ না করে মাথা নেড়ে 'না' বলল সপ্তম।

'কী ইয়ার্কি মারছেন ভাই?'

'আপনার সঙ্গে কেন ইয়ার্কি মারব?'

'আপনি ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসেছিলেন। আপনার পায়ের কাছে ব্যাগটা পড়েছিল। আপনি সেটা তুলে নেননি?'

'ব্যাগ? কী রকম ব্যাগ?' সপ্তম ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে এই লোকটাকে ব্যাগ ফেরত দেবে না। ব্যাগটা যদি ইমরান রহমানের হয় তাহলে তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

'পার্স। মোটা পার্স।'

'ট্যাক্সির মধ্যে পড়েছিল তা আপনি জানলেন কী করে?'

'যার ব্যাগ সে বলেছে। ইন্ডিয়ান টাকা পার্সের বাইরের পকেটে রাখা ছিল। সেটা থেকে ট্যাক্সির ভাড়া দিতে গিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ায় পার্সটা যে পড়ে গেছে তা টের পায়নি। ভাগ্যিস নম্বরটা দেখেছিল তাই কাল রাত্রেই আমরা ট্যাক্সিওয়ালাকে ধরতে পেরেছি।' রশিদ বলল। 'সেই ট্যাক্সিওয়ালা আপনাকে এসব তথ্য দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই বলেছে আমি পার্স কুড়িয়ে নিয়েছি।

হ্যাঁ।

'তাহলে ও যখন আমাকে কুড়িয়ে নিতে দেখল তখন প্রতিবাদ করল না কেন? ট্যাক্সিতে যদি কোনও জিনিস পড়ে থাকে, তাহলে সেটার ওপর কার বেশি দাবি, যাত্রীর না ট্যাক্সিওয়ালার?'

রশিদ সপ্তমের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ট্যাক্সিওয়ালার।'

'তাহলে?'

'না। লোকটা আপনাকে পার্স কুড়োতে দেখেনি। কিন্তু আমাদের বন্ধুর পর একমাত্র আপনি পেছনের সিটে বসেছিলেন। আপনাকে নামানোর পর ও সোজা তালতলার গ্যারেজে চলে যায়।

'আশ্চর্য! তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। রাতও হয়েছিল। ট্যাক্সির ভেতরটা ছিল অন্ধকার। ওখানে যে পার্স পড়ে আছে, আমি জানব কী করে? আপনি কি ট্যাক্সিতে উঠে প্রথমেই পায়ের কাছাকাছি জায়গা সার্চ করে দেখেন আগের প্যাসেঞ্জার কিছু ফেলে গেছে কি না?'

'না, তা কেন করব?'

'তাহলে?'

'তাহলে আপনি পার্সটা কুড়িয়ে পাননি?'

'পেলে আপনাকে দিয়ে দিতাম। কি আছে ওতে? কয়েকশো টাকা, তাই তো।'

'কয়েকশো টাকা থাকলে এরকম গরু খোঁজা খুঁজে আপনাকে বের করতাম না।'

'ও। তাই? কী ছিল বলুন তো?'

'এখন সেটা আপনার না জানলেও চলবে। তাহলে ওই ট্যাক্সিওয়ালাই কি দুনম্বরি করল? শালাকে দেখলেই হারামি মনে হয়।'

'আচ্ছা, আপনি বলুন, আমি যা বললাম, তাতে কি যুক্তি নেই?'

মাথা নাড়ল রশিদ। ভাবতে লাগল, এখন কী করা যায়। সেটা লক্ষ্য করে সপ্তম বলল, 'একটা কাজ করুন। যার পার্স তাকে ট্যাক্সিওয়ালার সামনে হাজির করুন।'

রশিদ উঠে দাঁড়াল। 'সেটা এখন সম্ভব নয়। শুনুন সপ্তমবাবু, হয় ট্যাক্সিওয়ালা, নয় আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমরা পুলিসের কাছে না গিয়ে নিজেরাই ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। কলকাতার কোনও থানায় গিয়ে কেউ যদি পার্স হারিয়েছে আর সেটা কোন ট্যাক্সিতে হারিয়েছে তার নাম্বার দিয়ে ডায়েরি করত, তাহলে পুলিস নিশ্চয়ই এতক্ষণে আপনার কাছে প্রশ্ন করতে আসার কথা ভাবতে পারত না। তাই আপনি যদি মিথ্যে কথা বলেন, তাহলে আর একবার ভাবতে বলছি। আনোয়ার রশিদ সত্যি কথা শুনতে পছন্দ করে।'

'আপনার কোনও নেমকার্ড আছে?'

'মানে?'

'আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই।'

'কেন?'

'আপনার মত আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাউকে কথা বলতে আমি শুনিনি।'

রশিদ একমুহূর্ত ভাবল। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কার্ড বের করে সপ্তমের হাতে দিয়ে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। সপ্তম দেখল মোপেড গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কার্ডটা দেখল সে। অদ্ভুত কার্ড। আনোয়ার রশিদ, তলায় মোবাইল নম্বর, আর কিছু লেখা নেই। নিশ্চয়ই রশিদের মোবাইল ক্যাশ কার্ডে চলে। ফলে মোবাইল কোম্পানির কাছে খোঁজ নিলে ওরা রশিদের ঠিকানা দিতে পারবে না। তার ফলে রশিদ যদি নিতে না চায় তাহলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে এল সপ্তম। কেস খুব খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে। এই ডলারগুলো পাওয়ার জন্যে লোকটা উত্তর কলকাতার অনেকটাই চষে বেরিয়েছে। ঠিকই, পুলিসের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে রশিদ কোনও দাদার ভাই অথবা নিজেই একজন দাদা। এখন ট্যাক্সিওয়ালাকে ওরা চাপ দেবে। লোকটা যদি শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে, করাটাই স্বাভাবিক, তাহলে রশিদ নিশ্চয়ই তার কাছে আবার আসবে। চার হাজার আটশো ডলার নিশ্চয়ই ওদের কাছেও কম নয়।

ডলারের নোটগুলো আর একবার নাড়াচাড়া করল সে। ভারতীয় টাকা তো সাতশো। তা থেকেই ট্যাক্সিভাড়া দিচ্ছে সে এমন ভাবতে মন্দ কী! কিন্তু সে কি আগুন নিয়ে খেলা করছে? পার্সটা তুলে নিল সপ্তম। এখন এর কোনও খোপে কিছু নেই। অন্যমনস্ক হয়ে পার্সটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটা পাতলা আস্তরণ টের পেল। কোনওমতে তার ভেতর আঙুল ঢোকাতে একটা কাগজ পেল সে। পাতলা কিন্তু দামি কাগজ। কাগজটা খুলল সে। চারটে নাম লেখা রয়েছে। ব্যস। এই চারটি নামই তার অপরিচিত। নামগুলো আবার পড়ল সে। জনি, বন্বাস, হায়দার, কানাই। নামগুলো মুখস্থ হয়ে গেল সপ্তমের।

এই নামগুলোর নিশ্চয়ই বেশ গুরুত্ব আছে নইলে ইমরান রহমানের পার্সের লুকোন খাপে এই কাগজটা থাকত না। হঠাৎ তার সুভাষদার কথা মনে এল। সুভাষদা কি এদের চিনবেন? অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুভাষদাকে তাহলে রশিদের কথা বলতে হয়। ব্যাপারটা ভাবতেই মাথায় আর একটা আইডিয়া এসে গেল। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে সে ফোনের রিসিভার তুলল। নাম্বার টিপতেই সেই চামচের গলা, 'হ্যালো।'

'সুভাষদাকে দিন, সপ্তম বলছি।'

একটু বাদেই সুভাষদা ফোন ধরলেন, 'আবার কী হল?'

'যার মানিব্যাগ কাল পেয়েছি তার লোক একটু আগে এসেছিল।'

'কী করে খোঁজ পেল?'

'ট্যাক্সিওয়ালার কাছ থেকে।'

'ডলারগুলো দিয়ে দিয়েছ?'

'উপায় ছিল না।'

'কেন? উপায় ছিল না কেন? যে এসে চাইত, তাকেই দিতে?'

'না। লোকটা বলল ওটি দুবাইয়ের ডলার। সঙ্গে রিভলভার ছিল।'

হঠাৎ সব চুপচাপ। তিনবার হ্যালো বলার পর সপ্তম বুঝল সুভাষদা রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন।

টিভিটা চলছিল কিন্তু সেদিকে মন ছিল না সপ্তমের।

পরিস্থিতি যেন একটু একটু করে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অতগুলো ডলার বাড়িতে অথচ সে বলেছে পার্সটা পায়নি অথবা ডলার যার সে এসে নিয়ে গেছে। রশিদ অথবা সুভাষদা তার কথা বিশ্বাস করবেন এমন বিশ্বাস এখন আর হচ্ছে না। ট্যাক্সির নম্বর ধরে ড্রাইভারকে বের করে রশিদ জানতে পেরেছিল মণীন্দ্রনাথ কলেজের সামনে সে সপ্তমকে নামিয়ে দেওয়ার পর আর কোনও প্যাসেঞ্জার তোলেনি। শুধু প্যাসেঞ্জারের নাম আর নামবার জায়গাটা জেনে যে লোক তল্লাশি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছতে পেরেছে, সে যে তার বক্তব্য বিশ্বাস করে থেমে যাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আর সুভাষদার মত বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো মানুষ যে তার কথা বিশ্বাস করবেন না, তা যত সময় যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে সপ্তমের। এখন কী করা যায়? পুলিসের কাছে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। তাহলে সুভাষদাকে যে সে মিথ্যে বলেছে, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রশিদও নিশ্চয়ই জানতে পারবে। সপ্তম ভেবে পাচ্ছিল না কার কাছে সে সাহায্য বা পরামর্শ চাইতে পারে। ডলারগুলো বের করে দেখল সে। চার হাজার আটশ ডলার। তাদের পাড়ার চায়ের দোকানে ওই ডলার নিয়ে গেলে লোকটা প্রথমে নিতে চাইবে না। এক ডলারের দাম আটচল্লিশ টাকা হলেও নয়। তারপর পরামর্শ পেলে দশ টাকায় এক ডলার কিনতে চাইবে আর খবরটা ঘণ্টাখানেকেব মধ্যে সমস্ত পাড়ায় চাউর হয়ে যাবে। তার চেয়ে এগুলো যদি ভারতীয় টাকা করে নেওয়া যেত তাহলে—!

এইসময় টেলিফোন বাজল। বেশ নার্ভাস হয়েই রিসিভার তুলল সপ্তম, 'হ্যালো।'

'যাক। তোমাকে পাওয়া গেল। সারাদিনে তো একবারও দেখা করলে না?' জ্যোতি দত্তের গলা।

'সকালে আপনি কিছু বললেন না।'

'আমি কেন বলব? ইটস ইওর ডিউটি—। শোন, তুমি এখনই ওই হোটেলে চলে যাও।'

জ্যোতি দত্ত বললেন, 'মিসেস সামতানি এখন ভাল আছেন, কথা বলবেন।'

'কিন্তু আবার যদি গতকালের মত বসিয়ে রাখেন—!'

'গতকাল অন্যদিন ছিল। এত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারিয়ে ফেললে তোমার কিছুই হবে না।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

ফোন নামিয়ে রেখে সপ্তমের মনে হল এটা ভালই হয়েছে। ঘরে বসে থাকলে তো শুধু ওই চিন্তাই মাথায় পাক খাবে। কিন্তু ডলারগুলো নিয়ে সে এখন কী করবে? পকেটে নিয়ে ঘোরা খুব রিস্কি ব্যাপার। আবার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে যেতেও মন চাইছে না। না, বাড়ির কেউ এখানে হাত দেবে না। কিন্তু যদি বাইরের কেউ জোর করে ঢোকে? রশিদের লোকজন অথবা পুলিস? পার্সটাকে আলমারির ওপরে রেখে দিল সে। যাতে কেউ সহজে হাত না পায় তাই দেওয়ালের দিকে অনেকটাই ঠেলে দিল ওটাকে। তারপর সেজেগুজে মাকে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

মোড়ের মাথায় ঠাকুরের দোকান থেকে সিগারেট কেনে সপ্তম। আজ সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই ঠাকুর হাসল, 'কী ব্যাপার দাদা? আজ কী হল?'

'কী হল মানে?'

'আপনার বাড়িতে ওরা যায়নি?'

'কারা?'

'আরে! দুপুরে এল বাইক নিয়ে। আপনার নাম বলে জিজ্ঞাসা করল এ পাড়ায় ওই নামের কেউ আছে কিনা। আমি আপনার বাড়ি বলে দিলাম। তারপর দু-তিনবার দেখেছি লোকটাকে। বাইক নিয়ে আসা-যাওয়া করতে। আবার একটু আগে দুজনে এসে আপনার বাড়ি খোঁজ করল। এই আধঘণ্টা আগে। দেখা হয়নি?' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'হঠাৎ অচেনা লোক আপনার খোঁজ করছে, তাই ভাবলাম আজ কিছু হয়েছে হয়ত।'

মাথা নেড়ে দাম মিটিয়ে সিগারেট নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল সে।

প্রথম বাইকওয়ালা লোকটা যে রশিদ তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আধঘণ্টা আগে যে দুজন তার খোঁজ করেছে তাবা তো বাড়িতে পৌঁছয়নি। তারা কারা? কেন পৌঁছয়নি? অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল আবার। বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে সপ্তম হাঁটতে লাগল। তবে কি রশিদ লোক পাঠিয়ে দিয়েছে তার ওপর নজর রাখার জন্যে? তাহলে নিশ্চয়ই লোক দুটো তার পেছনে রয়েছে। সে আচমকা পেছন ফিরল। অনেক মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওভাবে তাকে ফিরতে দেখে কেউ চমকে উঠল না। খানিকটা দূরে দুজন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওরা নয় তো?

হাঁটতে হাঁটতে পেছনে তাকাচ্ছিল সপ্তম, কিন্তু কাউকেই সন্দেহ করতে পারছিল না। দুটো লোক তার বাড়ি কোথায় জেনেও যখন তার সঙ্গে দেখা করেনি তখন তাদের আসার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। হঠাৎ মনে এল, সুভাষদা ওদের পাঠাননি তো! সুভাষদাকে ফোনে খবরটা দেওয়ার পর অনেকক্ষণ বাদে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এর মধ্যেই সুভাষদা ওর ওপর নজর রাখতে লোক পাঠাতেই পারে। সন্দেহ করলে সুভাষদা যে মারাত্মক হতে পারেন তা রাসেলের ভয় পাওয়া থেকেই বোঝা গেছে। হাঁটতে-হাঁটতে ঝট করে সে পাতাল রেলের গেট পেরিয়ে নিচে নেমে এল। এসকেলিটরে নেমে ওপরের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। এসকেলিটার চালু হওয়ার পরও অনেকে ওটা ব্যবহার করতে চান না। মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি। কিছু পুরুষও সিঁড়ি ভাঙাই পছন্দ করেন। সেরকম কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। মুখগুলো দেখল সে। না, কখনও ওদের দেখেছে বলে মনে হল না!

এসপ্ল্যানেডেব টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে নামা মাত্রই ট্রেন এসে গেল। এ সময় এসপ্ল্যানেডমুখী ট্রেন বেশ ফাঁকা। উঠেই বসার জায়গা পেয়ে গেল সে। বসামাত্র নিজের নামটা শুনতে পেল, কেউ ডাকছে। চারপাশে তাকাতেই উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসা মহিলা হাসলেন, 'চিনতে পারছ না?'

সপ্তম হাসল, 'কেমন আছ?' সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল। আর রাজ্যের আওয়াজ ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই কানে। মাধবিকার ঠোঁট নড়ে থেমে গেল, কোনও কথা বোঝা গেল না।

শোভাবাজারে ট্রেন দাঁড়ানোর পর মাধবিকা বলল, 'পাতাল রেলে কথা বলা যায় না।'

'হ্যাঁ, খুব শব্দ।' সপ্তম বলল।

'কোথায় নামছ?' মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল।

'এসপ্ল্যানেড।'

'আমি পার্ক স্ট্রিট।' ট্রেন আবার ছেড়ে দিল অতএব কথা বন্ধ।

মাধবিকা এখনও সুন্দরী। এর প্রমাণ হল সে তার নাম ধরে ডাকা মাত্র সহযাত্রীরা বারংবার তার দিকে তাকাচ্ছে। কোনও মহিলা যদি সুন্দরী হন, তাহলে পাঁচজন তাঁর দিকে যতবার তাকাবে, তারচেয়ে বেশি তাকাবে তিনি যাকে অনুগ্রহ করছেন তাঁর দিকে।

হ্যাঁ, কলেজেও মাধবিকার সুন্দরী হিসেবে প্রচুর খ্যাতি ছিল। ওর প্রেমপ্রার্থীর সংখ্যাও ছিল অনেক। কিন্তু শোনা যেত, মাধবিকা নাকি সবাইকে সুন্দরভাবে ড্রিবল করত, কাউকেই হৃদয় দিত না। ওই দলে নাম লেখাতে রাজি ছিল না সপ্তম। তাছাড়া মাধবিকার অনুরাগীদের মত সে বড়লোক বাবার ছেলে নয়, তাই সঙ্কোচও ছিল। সেই মাধবিকাকে এতদিন পরে দেখে মনে হচ্ছিল, ঝর্না যেখানে নদী হয়ে যায় সেখানে তার চেহারা এরকমই দেখতে লাগে।

এসপ্ল্যানেডে নেমে সদর স্ট্রিটে যেতে অনেকটা হাঁটতে হয়। পরের স্টপ পার্ক স্ট্রিটে নামলেও একই ব্যাপার। মাধবিকার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হলে সপ্তম ঠিক করল, একই ব্যাপার যখন, তখন পার্ক স্ট্রিটে নামবে।

এসপ্ল্যানেডে ট্রেন থামতে মাধবিকা চোখ বড় করল, 'নামলে না।'

'পরেরটায় নামব।' হাসল সপ্তম।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' কাঁধ নাচাল মাধবিকা।

পার্ক স্ট্রিটের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'এসপ্ল্যানেডের কাজ ফেলে এত দূরে এলে?'

সপ্তম বলল, 'ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় যাব, এখানে নামলেও অসুবিধে হবে না।'

কিন্তু প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসার সময় মাধবিকা স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এল টিকিট যন্ত্রের পেটে চালান করে, সপ্তম পারল না। তার টিকিট যন্ত্র ফেরত দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারী ছুটে এলেন। তাঁদের একজন টিকিট দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাকে ভেতরে যেতে হবে।'

'কেন?' সপ্তম বিরক্ত হল।

'আপনি অল্প টাকার টিকিটে বেশি রাস্তায় চলে এসেছেন।'

'তার মানে?'

'আপনার টিকিট এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। তারপরের এই দূরত্বে আসার কোনও টিকিট আপনার কাছে নেই। অর্থাৎ এই দূরত্বে আপনি বিনা টিকিটের যাত্রী। এই কারণে আপনাকে পেনাল্টি দিতে হবে।' লোকটি কথা বলার সময় খুব মজা পাচ্ছিল।

সপ্তম বলল, 'দেখুন, আমি জানতামই না একটা স্টেশনের জন্যে এত গোলমাল হয়।'

'ওসব কথা রোজ শুনছি মশাই। জরিমানা এবং জেল, দুটোর ব্যবস্থা আছে আইনে। আপনি যদি ভদ্রভাবে অফিসারের কাছে যান তাহলে দ্বিতীয়টা হবে না। লোকটি বলল।

ওপাশে দাঁড়ানো মাধবিকার দিকে তাকাল সপ্তম। কী গেরো। ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে সে আগের স্টেশনে নেমে যেত। সপ্তম বলল, 'তুমি আর দাঁড়িয়ে থেক না, দেখি আমি কতক্ষণে ছাড়া পাই।'

মাধবিকা লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম, খুব বিপদ। আচ্ছা, এবার তো প্রথমবার, ওকে মাপ করে দিতে পারেন না?'

লোকটি 'না' বলার জন্যে মাধবিকার দিকে মুখ ফেরাতেই সে অপূর্ব একটি শব্দহীন হাসি হাসল। লোকটি সেটা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'বাচ্চাকাচ্চা হলে না হয়—।'

'ও তো বাচ্চাই! চেহারায় বড় হয়েছে, বাস্তববুদ্ধি বাচ্চাদের মতনই। প্লিজ।'

লোকটি কী রকম হয়ে গেল, 'ঠিক আছে, যান, নেক্সট টাইম এই ভুল করবেন না।' যতক্ষণ না টানেলের বাঁকে পৌঁছল, ততক্ষণ ওরা গম্ভীর মুখে হেঁটে এল। বাঁক ঘুরতেই সশব্দে হেসে উঠল মাধবিকা। হাসতে হাসতে বলল, 'পুরুষগুলো মাঝেমাঝে কীরকম গবেট হয়ে যায়।'

সপ্তম গম্ভীর হল, 'আমাকে বলছ?'

'তোমাকে? তোমাকে কেন বলব? ওই লোকটাকে। কীরকম গর্জন করছিল অথচ বর্ষালো না। হাওয়ায় মেঘ উড়ে গেল।'

সপ্তমের ভাল লাগছিল না। ওপরে উঠে বলল, 'আমি এবার বাঁ দিকে যাব।'

'আমি কোথায় যাব জিজ্ঞাসা করলে না?'

মাধবিকা হাসল।

'সরি। হ্যাঁ, কোথায় যাবে?'

'আমার অফিসে।'

'এসময় অফিসে?'

ট্র্যাভেল এজেন্সি। কখনও কখনও রাত আটটাতে খোলা থাকে। পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে একটু এগোলেই রাসেল স্ট্রিট। ডান হাতে তিনটে বাড়ির পর দোতলায়। নাম ওয়ার্ল্ডওয়াইড।' ব্যাগ খুলে কার্ড বের করে দিল মাধবিকা, 'এলে ভাল লাগবে।'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'অনেক বছর পরে দেখা হল। ভাল লাগছে।

বিয়ে করেছ?'

'নাঃ।' মাথা নাড়ল সপ্তম, 'তুমি?'

চলে যেতে গিয়েও ফিরে তাকাল মাধবিকা, 'করেছিলাম।' তারপর চলে গেল সে।

মাধবিকাকে নিয়ে ভাবতে-ভাবতে সদর স্ট্রিটের হোটেলে পৌঁছে গেল সপ্তম। সারাদিনে এই প্রথম কিছুটা সময় তাব মাথায় ডলারচিন্তা ছিল না।

রিসেপশনে গিয়ে নাম বলতেই একজন মোটাসোটা বৃদ্ধ ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাম বলল?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'সপ্তম স্যার।' ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বৃদ্ধ সপ্তমের আপাদমস্তক দেখল, 'হু আর ইউ?

লোকটির চেহারা পোশাকের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্য ছিল যে সপ্তম সমীহ করতে বাধ্য হল, 'আমি ম্যাডামের সঙ্গে ফিনান্সিয়াল ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'ফিনান্সিয়াল ব্যাপার? তুমি কি কোনও কোম্পানির এজেন্ট?'

'না, আমি ফ্রি-ল্যান্স করি।'

বৃদ্ধ আবার ওকে ভাল করে দেখে বললেন, 'কাম উইথ মি।'

পাশের দরজা খুলে বৃদ্ধ এগোতেই সপ্তম তাঁকে অনুসরণ করল। একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপাশে আরাম-চেয়ারে বসে বৃদ্ধ বললেন, 'সিট ডাউন।'

সপ্তম বসল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আসার কথা ম্যাডাম জানেন?'

'হ্যাঁ, আমি গতকালই এসেছিলাম।'

'তাই? তাহলে আজ আবার কেন?'

'গতকাল ম্যাডাম দেখা করেননি। ওঁর মাথা ধরেছিল।'

'মাথা ধরেছিল!' চোখ বন্ধ কবলেন বৃদ্ধ, 'মাইগ্রেন। যাক গে, আমি চাই না তুমি ওব সঙ্গে দেখা কর। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে তুমি এখন কী করবে?'

'আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন?'

'না। আমি না-চাওয়া সত্ত্বেও তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবে।'

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না সপ্তমের।

'বুঝতে পারছ না।?'

'না।'

'তুমি ম্যাডামকে বলবে. আমি চাইনি যে তোমাদের দেখা হোক। ওকে?'

মাথা নাড়ল সপ্তম। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম—?'

'মিস্টার সামতানি, আমি ওব স্বামী।' বলে ইন্টারকমে সিন্ধি ভাষায় কিছু বললেন। তারপর সপ্তমের দিকে তাকালেন, 'কথা বলে চলে যেও না। যাওয়ার আগে তুমি আমাকে জানিয়ে যাবে কী কথা হল। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতেই দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলল একজন বেয়ারা, 'সাব্।'

'গো উইথ হিম।'

বেয়ারাকে অনুসরণ করে হোটেলের একপ্রান্তে চলে এল সপ্তম। লিফটে চড়ে তিনতলায় পৌঁছে একটা বন্ধ দবজার পাশের বেলের বোতাম টিপল। একজন মহিলা দরজা খুলতেই বেয়ারা নিঃশব্দে চলে গেল। মহিলা তাকিয়ে আছে দেখে সপ্তম বলল. 'আমার নাম সপ্তম, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সপ্তম?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন।' মহিলা দরজাটা এক হাতে ধরে মাথা নাড়লেন।

এত সুন্দর সাজানো বসার ঘরে কখনও পা রাখেনি সপ্তম। একটা হালকা নীল কোন লুকনো উৎস থেকে বেরিয়ে এসে ঘরটাকে আরও মায়াময় করে তুলেছে, মহিলা বলল, 'বসুন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে!' বলে চলে গেল।

সোফায় বসল সপ্তম। মিস্টার সামতানির কথা মিসেস সামতানিকে জানানো দরকার। কিন্তু সেটা তো অভিযোগ জানানো হয়ে যাবে। বৃদ্ধের কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব ক্ষুব্ধ হবেন।

তখন তার কাজ করাটাই মুশকিল হয়ে যাবে। এমনিতেই বৃদ্ধের কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ক্লায়েন্ট তার হাত থেকে ফস্কে গেছে। এদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই খারাপ আর এই কথাটা জ্যোতি দত্তের জানার কথা নয়। ওই বৃদ্ধ যেমন রাশভারি তেমনি কুটিল। এখানে যা কথা হবে তা যাওয়ার সময় ওই বৃদ্ধকে জানিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হয়েছে। এই কথাটা বৃদ্ধাকে জানাতে হবে।

তবু এই অবস্থায় বৃদ্ধকে আড়ালে রেখে কাজ উদ্ধার করার একটা পরিকল্পনা করা দরকার। কিন্তু সেটা মাথায় আসছিল না। একটা ভুল মানে এত বড় ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে। জ্যোতি দত্ত তাহলে তার মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে! অতএব মিসেস সামতানির সমর্থন পেতেই হবে।

এইসময় মহিলা ঘরে ঢুকে জানাল, 'ম্যাডাম আসছেন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে যে মহিলা ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখে হতবাক হয়ে গেল সপ্তম। সে হাঁ করে তাকিয়ে দেখল হিন্দি সিনেমার একটু বয়স হওয়া কোনও গ্ল্যামারাস নায়িকা তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। খেয়াল হতেই ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে সে নমস্কার করল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই?' প্রশ্নটি হিন্দিতে।

'মিসেস সামতানি—?' গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল সপ্তমের।

'আমিই মিসেস সামতানি।' বলেই ঝর্নার শব্দ তুললেন গলায়। হাসি শেষ করে বললেন, 'প্রীতি, এই ভদ্রলোক বিশ্বাস করতে পারছেন না, তার মানে বুড়োটার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে।' তারপরেই গলার স্বর পাল্টে রুক্ষ হলেন, 'মিস্টার সামতানির সঙ্গে দেখা করে এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কার্ড দেখি।' হাত বাড়ালেন তিনি।

সপ্তম কার্ড বের করে এগিয়ে দিল।

'সপ্তম! গুড নেম। বাট হোয়াই? আপনি কি বাবা-মায়ের সাত নম্বর ছেলে?'

'না। আমি একাই।'

'মিস্টার জ্যোতি দত্ত আপনাকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, উনি নিজে আসতে চাননি—'

'কারণ আমি টাকওয়ালা লোক স্ট্যান্ড করতে পারি না, কিন্তু আমার কাছে সোজা না এসে মিস্টার সামতানির সঙ্গে দেখা করলেন কেন?'

'আমি চাইনি, উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'তাই। ইটস টু মাচ।' তাকালেন সুন্দরী মহিলার দিকে, 'প্রীতি, ফোন।'

কর্ডলেস রিসিভার এনে দিল মহিলা। নাম্বার টিপে মিসেস সামতানি কেটে কেটে বললেন, 'তুমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়েছ কেন। না না, আমার ফিনান্সিয়াল ব্যাপার আমি বুঝব। মিসেস পানওয়ানি এদের দিয়ে কাজ করিয়ে খুব হ্যাপি। আমাকে যেন এ ব্যাপারে আর ফোন করতে না হয়।'

রিসিভারটা প্রীতির হাতে চালান করে দিয়ে মিসেস সামতানি বললেন, 'কথা শুরু করার আগে জিজ্ঞাসা করছি, কী খাবেন?' 'অনেক ধন্যবাদ। আমার কিছু লাগবে না! সপ্তম বলল।

‘ওকে! শুনুন সপ্তম, আমি তিনদিনের মধ্যে দশলক্ষ ইনভেস্ট করতে চাই, কাগজ দিন।’ হাত বাড়ালেন মিসেস সামতানি।

সপ্তম হকচকিয়ে গেল. ‘কাগজ? না মানে আমি কোনও কাগজপত্র নিয়ে আসিনি।’

মিসেস সামতানি দুটো হাত দুই গালে রাখলেন ‘কেন? তাহলে এসেছেন কেন?’

‘মিস্টার দত্ত বলেছিলেন আপনার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে যেতে। আপনি কীসে ইন্টারেস্টেড তা জেনে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আবার আসব আমি।’ সপ্তম বলল।

‘আশ্চর্য! আমি কি হাওয়ায় কথা বলব? আপনি আমাকে কী অফার দিচ্ছেন, তা কাগজে দেখার পরই তো আমি সিদ্ধান্ত নেব।’ মিসেস সামতানি বললেন।

ঠিকই। তাহলে আপনি শেয়ারের ব্যাপারেই ইন্টারেস্টেড?’

ইয়েস। মিসেস পানওয়ানি বলেছেন এই ব্যাপারটা আপনারা ভাল ট্যাক্‌ল করেন।’

আমরা চেষ্টা করি। মিস্টার দত্ত শেয়ার মার্কেটের পাল্‌স ভাল বোঝেন। যেসব কোম্পানির শেয়ারের দাম ঊর্ধ্বমুখী আমি তাদের একটা লিস্ট আপনাকে দেব। কিন্তু ব্যাপারটা দুরকমভাবে হয়। মিসেস পানওয়ানি সকালে যে শেয়ার কেনেন, তার দাম বিকেলে যদি সামান্য বাড়ে তাহলেই বিক্রি করে দিতে বলেন। দাম না বাড়লে বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। কিন্তু এর ফলে ওঁর শেয়ার বিক্রির প্রফিট খুবই কম থাকে। উনি ঝুঁকি নিতে চান না।’ সপ্তম বলল।

‘এই মুহূর্তে ওঁর নিজস্ব টাকা নাকি শেয়ারে খাটছে না!’

না। ওঁর ইনভেস্টমেন্টের টাকা একটু একটু করে উনি তুলে নিয়েছেন। এখন প্রফিটের টাকা দিয়েই উনি কেনাবেচা করছেন। কিন্তু এটা করতে ওঁর অনেক সময় লেগেছে।’

মিসেস সামতানি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘আমি ঝুঁকি নিতে চাই।’

কতদিন?’

এটা নির্ভর করছে দাম বাড়তে বাড়তে যখন আপনারা মনে করবেন এবার পড়তে পারে ততদিন। আমি শুনেছি তিরিশ টাকা শেয়ার কিনে এক বছরের মধ্যে লোকে তার দাম একশো টাকা পেয়েছে। এখন কোন কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে ওই জায়গায় পৌঁছাবে তা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।’ মিসেস সামতানি ঘড়ি দেখলেন।

‘বেশ। আমি তাহলে কবে আপনার দেখা পাব?’

‘কবে নয়, আগামীকালই। আর হ্যাঁ, আগামীকাল দুপুরে আসবেন, রাউন্ড অ্যাবাউট বারোটা। যাবতীয় কাগজপত্র এনে সই করিয়ে চেক নিয়ে যাবেন।’

‘বেশ। একটা কথা—।’

‘বলুন।’

‘আপনার নামেই শেয়ার কিনবেন তো?’

‘নিশ্চয়ই। কেন?’

‘ইনকাম ট্যাক্সের জন্য অনেকে অন্যরকম ভাবে।’

‘না। আমার কোনও প্রবলেম নেই।’

কিন্তু কালই আপনাকে একটা ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। আপনার কোন ব্যাঙ্ক?’

'স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড গ্রিন্ডলেস।'

'ও, তাহলে কোনও সমস্যা নেই।'

মিসেস সামতানি উঠে দাঁড়ালেন, 'ওয়েল—' অর্থাৎ আপনি এবার যেতে পারেন। সপ্তম উঠে নমস্কার করল। মিসেস সামতানি মাথা ঈষৎ নোয়ালেন, 'ওয়েল সপ্তম, যাওয়ার সময় আপনি হোটেলের এন্ট্রেস দিয়ে বের হবেন না। কোন দিকের গেট ব্যবহার করবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

নিশ্চয়ই।' সপ্তম বেরিয়ে এল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা এস টি ডি বুথ থেকে জ্যোতি দত্তকে টেলিফোন করল সে। দেখা হয়েছে শুনে খুশি হয়ে জ্যোতি দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা ইনভেস্ট করবে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ, দশ লাখ। কিন্তু—'

'চলে এস। টেলিফোনে ব্যবসা নিয়ে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। জ্যোতি দত্ত বলল।

আমি কাল সকালে যদি যাই?'

'কেন? এমন কী রাজকাজ করছ? এই জন্যে বাঙালি ছেলেদের কিস্যু হয় না।' জ্যোতি দত্ত বিরক্ত হলেন, 'ঠিক আছে, সকাল সাতটায়।' টেলিফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

এক-একটি লোক আছে যাদের মতিগতি বোঝা খুবই দুরূহ ব্যাপার। জ্যোতি দত্ত তাদের একজন। কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না ভদ্রলোক। সবসময় ঝাঁঝিয়ে থাকেন, কথা শুনলে মনে হয় জীবনে মধু খাননি। সপ্তম দুটো টাকা দিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই লোকটি এসে দাঁড়াল সামনে।

খুব সাধারণ চেহারা, চল্লিশের কাছে বয়স, পরনে সাধারণ শার্ট-প্যান্ট, বলল, 'আপনাকে একটু যেতে হবে। রশিদ ভাই আপনার সঙ্গে কথা বলবে।' লোকটা চমৎকার হিন্দিতে কথাগুলো বলল।

চমকে উঠল সপ্তম। এখানেও রশিদ ভাই? তারপরেই মনে পড়ল, এটা তো ওদের পাড়া। এই সদর স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকা থেকেই ট্যাক্সিটা বেরিয়েছিল ইমরান রহমানকে নামিয়ে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে এখানে পাবেন আপনি জানতেন?'

'হ্যাঁ। আপনি পাতাল রেলে চড়ে পার্ক স্ট্রিটে নেমেছিলেন, ওখানে থেকে হেঁটে সদর স্ট্রিটের বড় হোটেলে ঢুকেছিলেন।' লোকটি নির্লিপ্ত মুখে বলল।

'ও। আপনিই আমাকে ফলো করেছেন?'

'আপনি বোধহয় সেরকম অনুমান করেছিলেন।'

কীরকম বোকা-বোকা মনে হল নিজেকে। সেটা কাটিয়ে উঠতে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমাকে হোটেলে ঢোকার আগেই তো একা পেয়েছিলেন, তখন ধরলেন না কেন?'

'তখন হুকুম ছিল না।'

'বাঃ, তখন হুকুম ছিল না, আর এতক্ষণ রাস্তায় আমার জন্যে অপেক্ষা করার মধ্যেই হুকুম এসে গেল!' সপ্তম রসিকতা করার চেষ্টা করল।

লোকটা পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করে দেখাতে আবার নিজের ওপর রেগে গেল সপ্তম। এরকম বোকা-বোকা কথা বলার কোনও মানে হয়!

লোকটা বলল, 'চলুন।'

সপ্তম বলল, 'আচ্ছা, ওর সঙ্গে ওই ফোনে কথা বললে হয় না?'

'আমার ওপর হুকুম হয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।'

সপ্তম চারপাশে তাকাল। এই লোকটি নিশ্চয়ই একা এখানে আসেনি। যদিও সন্ধের পরে এই নির্জন রাস্তায় কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে না, তবু কে কোন ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে তা কে জানে? এর সঙ্গে যাওয়াটা যে ঠিক হবে না তা সে বুঝতে পারছিল। কিন্তু না গেলে যে আরও খারাপ হবে সেটা বুঝতে ভাবতে হয় না। সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'কত দূরে যেতে হবে ভাই।'

লোকটি মাথা নেড়ে আসতে বলে হাঁটা শুরু করল। সদর স্ট্রিট ধরে খানিকটা গিয়ে চৌবঙ্গি লেনে ঢুকে পড়ল লোকটা। তারপর একটা গেটওয়ালা বাড়ির সামনে পৌঁছে বলল, আসুন। বাড়িটা অনেক পুরনো, ব্রিটিশ আমলের বাংলো প্যাটার্নের। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিল লোকটা। দরজা খুলল স্বয়ং রশিদ। লোকটার পেছনে দাঁড়ানো সপ্তমের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল, 'নমস্তে সপ্তমজি, আসুন, আসুন, গরিবের এই সামান্য বাড়িতে আপনার পা পড়েছে বলে আমি ধন্য। আসুন।'

এরকম অভ্যর্থনায় আরও ঘাবড়ে গেল সপ্তম। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল স্মার্ট হতে। ঘরে ঢুকে দেখল তেমন দামি আসবাব নেই। কাঠের মেঝের ওপর কিছু টেবিল-চেয়ার। রশিদের অনুরোধে তার একটায় বসতে হল তাকে।

উল্টো দিকের চেয়ারে বসে রশিদ বলল, 'কী খাবেন বলুন?'

সপ্তম মাথা নাড়ল, 'না না, কিছু না।'

'তা কী হয়! আপনি আমার মেহমান। আমার অনুরোধে এখানে এসেছেন। চা কফি না মালাই?' রশিদ এমন চোখে তাকাল যেন সপ্তমকে না খাওয়ালে তার শান্তি হচ্ছে না।

সপ্তম বলল, 'চা'।

'দুধ-চিনি সব নর্মাল?'

'হ্যাঁ।'

রশিদ হাততালি দিতেই ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। রশিদ বলল, 'সাহেবের জন্যে দার্জিলিং চা বানাও, দুধ-চিনি নর্মাল।'

সপ্তম এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন দেখল তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসা লোকটা আর ধারেকাছে নেই। বাইরের দরজা বন্ধ। হুকুম নিয়ে ওই লোকটি ভেতরে চলে গেলে রশিদ বলল, 'সপ্তমভাই, খুব বিপদে পড়েছি আমি।' 'বিপদ?' মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল সপ্তমের।

'হ্যাঁ কোনও কোনও মানুষ এমন গোঁয়ার হয় যে একবার মিথ্যে কথা বললে কিছুতেই সত্য কথা বলতে চায় না। এইসব জেদি লোকগুলোই বিপদে ফেলে দেয়।' রশিদ মাথা নাড়ল।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কার বিষয়ে কথা বলছেন!' সপ্তম সোজা হল।

'আরে ওই হারামি ট্যাক্সিওয়ালাটা। শালা কিছুতেই স্বীকার করছে না ইমরান ভাইয়ের পার্স ও-ই হাওয়া করেছে। ওকে বললাম কত আদর করে বললাম, ওর এক কথা—আমি কিছু জানি না।'

'ওকে, ওকে জিজ্ঞাসা করেছেন?'

'করতেই হল। এটা আমার ইজ্জতের সওয়াল।'

'ও কিছু জানে না বলছে?'

'হ্যাঁ। সত্যি কথাটা কিছুতেই ওর মুখ থেকে বের করতে পারছি না। তাই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে নিয়ে এলাম। আপনাকে দেখে যদি ভয় পেয়ে সত্যি কথা বলে দেয়।'

'ট্যাক্সিওয়ালা এখানে আছে?'

'হ্যাঁ। দাঁড়ান।' আবার হাততালি দিল রশিদ। সঙ্গে সঙ্গে আগের লোকটি বেরিয়ে এল। রশিদ বলল, 'আরে ভাই চায়ের পাতা খুঁজতে তোমরা কি দার্জিলিঙে গিয়েছ?'

'চা রেডি।'

'ঠিক হ্যায়, নিয়ে এস। আর হ্যাঁ, ওই ট্যাক্সিওয়ালাটাকে সঙ্গে আনবে।'

মাথা নেড়ে লোকটা চলে গেলে রশিদ বলল, 'আপনাদের মত ভদ্র মানুষকে কষ্ট দিতে খুব খারাপ লাগে। কিছু মনে করবেন না, এটা আমার ইজ্জতের ব্যাপার।'

চা-এল। সঙ্গে বিস্কুট। সামনের টেবিলে ট্রে রেখে লোকটা চলে গেলে রশিদ বলল, 'দয়া করে এটুকু খেয়ে নিন। এই চায়ের পাতা সত্যি সত্যি দার্জিলিং থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।'

চায়ের কাপ তুলে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি?'

'না, না। আমার কোনও নেশা নেই। চা-ও আমার কাছে নেশার জিনিস।'

অতএব চুমুক দিতে হল। সত্যি, ভাল চা। দারুণ গন্ধ। কাপটা প্লেটের ওপর রাখতেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল একজন। এ আলাদা লোক।

ট্যাক্সিওয়ালার মুখ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সপ্তম। প্রচণ্ড মারের চোটে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। দুটো চোখ প্রায় বুজে গেছে, হাত পেছনে বাঁধা।

রশিদ বলল, 'তোকে মারার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু যতক্ষণ তুই সত্যি কথা না বলছিস, ততক্ষণ তো একটা কিছু করতেই হবে। এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছিস? দেখ, ভাল করে তাকিয়ে দেখ।'

ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফেরাল। আধবোজা চোখে দেখার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে 'না' বলল। রশিদ হাসল, 'দেখুন, মিথ্যে কথা বলতে আরম্ভ করলে এরা আর থামতে পারে না।' তারপর ট্যাক্সিওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি লাস্ট প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে সোজা গ্যারাজে চলে গিয়েছিলে। তাই তো?'

'হ্যাঁ। সত্যি বলছি, আর কোথাও যাইনি।'

'কোনও প্যাসেঞ্জার নাওনি?'

'আপনাকে তো বলেছি, বিশ্বাস করুন।' দু'হাত জোড় করল ট্যাক্সিওয়ালা।

এই লোকটাকে চিনতে পারছ না?'

'না, মানে—'

'তুমি সদর স্ট্রিটের মুখ থেকে লাস্ট প্যাসেঞ্জার তুলেছিলে?'

'আপনাকে সব কথা সত্যি বলেছি। দুজন শেয়ারে উঠেছিল।'

'তাদের দেখলে চিনতে পারবে?'

'মেয়েছেলেটাকে পারব। আমি খারাপ মেয়ে বলে ভেবেছিলাম।'

'মানিব্যাগ তুমি নাওনি?'

'না। আমার মা-বাপের দিব্যি, গাড়িতে যে মানিব্যাগ পড়েছিল আমি জানতামই না।'

'তার মানে তুমি এই ভদ্রলোককে ফাঁসাতে চাইছ?'

'ইনি—!' ট্যাক্সিওয়ালা হঠাৎ উত্তেজিত হল, 'আপনাকে সেদিন নামিয়েছিলাম না? ও হো! বিশ্বাস করুন, রাত ছিল, এত প্যাসেঞ্জার ওঠে-নামে যে সবার মুখ মনে থাকে। কিন্তু আমি কোনও মানিব্যাগ পাইনি। যার ব্যাগ হারিয়েছে তার পরে শুধু আপনিই ট্যাক্সির পেছনে বসেছিলেন।'

'তুমি আমার কাছে এক্সট্রা টাকা চেয়েছিলে। খুব রঙ দেখিয়েছিলে। সপ্তম কথাগুলো বলল বটে কিন্তু বলার সময় নিজেকে দুর্বল বলে মনে হল। 'স্যার, বৃষ্টির সময় আমরা ওরকম চেয়ে থাকি। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো কোনও খারাপ ব্যবহার করিনি।' লোকটা প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

রশিদ চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে?'

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'স্যার, আমি তো তখন থেকে বলছি, আপনারা শুনতে চাইছেন না। পেছনের সিটের নিচে ব্যাগ পড়ে থাকলে উনিই পেয়েছেন, আর কেউ পায়নি।'

লোকটা এত দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলল যে সপ্তমের মেরুদণ্ড চিনচিন করে উঠল।

রশিদ তাকাল সপ্তমের দিকে, 'কী করা যায় বলুন তো?'

'আপনি যদি ওর কথা বিশ্বাস করেন—'

'দূর মশাই, বিশ্বাস করলে তো বলেই দিতাম, সপ্তমবাবু মানিব্যাগটা ফেরত দিন। নাহলে ইমরান ভাই খুব বিপদে পড়ে যাবে।' বলেই হাততালি দিল রশিদ, 'এই, এটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। এরকম মুখ দেখতে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না।

লোকটা কাতরাচ্ছিল। তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছিল। হাত তুলল রশিদ। যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে দাঁড়াতেই রশিদ জিজ্ঞাসা করল, 'যখনই ডাকব তুই আসবি?'

'হ্যাঁ স্যার। বিশ্বাস করুন।'

'তোদের ইউনিয়নের দাদাদের কাছে যাবি না?'

'একদম না। ওরা পার্সোনাল কেস শুনবে না।'

'বেশ। এই, ওকে ছেড়ে দাও। না, ওকে নিচের ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে মুখটাকে একটু মেরামত করে দিতে বল। তারপর ছেড়ে দিবি। যা।' রশিদ কথাগুলো বলামাত্র ট্যাক্সিওয়ালা হাত জোড় করে লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। রশিদ বলল, 'ছেড়ে দিলাম। ওর কাছে আর কোনও খবর নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনি যদি সাহায্য না করেন, তাহলে ইমরান ভাইয়ের ইজ্জত বাঁচানো যাবে না।'

সপ্তমের গলা শুকিয়ে গেল। কাপের চা ঠাণ্ডা হচ্ছে. সেদিকে তার হুঁশ নেই, রশিদও মনে করিয়ে দিচ্ছে না চা খেতে। সে এখন সপ্তমের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে।

সপ্তম হাসার চেষ্টা করল, 'তাহলে আপনারা ধরে নিয়েছেন আমিই ব্যাগটা পেয়েছি।'

'দেখুন ইমরান ভাইয়ের ব্যাগটা পকেট থেকে ট্যাক্সির ভেতরেই পড়ে গিয়েছিল। ওঁর পরে আপনি ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসেছিলেন। তারপর লোকটা গাড়ি গ্যারেজ করেছে। গ্যারেজ থেকে আমি যে টাইম পেয়েছি তাতে বোঝাই যাচ্ছে ও অন্য কোথাও যায়নি। গাড়িতে মানিব্যাগ নেই। ওকে যদি বিশ্বাস করি তাহলে ধরে নিতে হয় আপনি—হাসল রশিদ, 'আসলে টাকাপয়সা ছাড়াও মানুষের অন্য অনেক কিছু মানিব্যাগে থাকতে পারে যার দাম অনেক। চার হাজার আটশো ডলার আমাদের কাছে অনেক টাকা। ট্যাক্সির ভেতর কুড়িয়ে পেলে আমারই লোভ লাগত। আপনার যদি লোভ হয় তাহলে দোষ দেব না। হ্যাঁ, ইমরান ভাইকে বলেছি মানিব্যাগ অসতর্কভাবে হারানোর জন্যে তাকেও কিছু ছাড়তে হবে। চার হাজার আটশোর আটশো আপনার। ঠিক আছে?' রশিদ উঠে দাঁড়াল।

এখন অস্বীকার করা মানে এদের সঙ্গে লড়াই শুরু করা। ট্যাক্সিওয়ালার রক্তাক্ত মুখ দেখার পর সেই লড়াইয়ের পরিণতি কী হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই সপ্তমের।

দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে রশিদ বলল, 'আমার লোক আপনাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে দেবে, ওর হাতেই দিয়ে দেবেন।'

'আমার মানে—' কী বলবে বুঝতে পারছিল না সপ্তম।

'এখন অসুবিধে আছে। নো প্রবলেম। কাল সকাল সাতটায় লোক যাবে।'

মাথা নাড়তে গিয়ে থেমে গেল সপ্তম, 'আচ্ছা, ইমরান ভাই কোথায় আছেন?'

'পুলিস কাস্টডিতে। কেন?'

'পুলিস?'

'ওটা অন্য ব্যাপার। কথা বলবেন?'

'মানে?'

'আমার কথা যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হয় তাহলে ওঁর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে পারেন। কথা বলার ফেসিলিটি পেতে অসুবিধে হয় না।' রশিদ বলল।

'না না। থাক।'

দ্রুত রাস্তায় চলে এলেও সপ্তমের মনে হল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু লোকটার ব্যবহার তার নিজের কাছেই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল। তার সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার দূরের কথা, খারাপ কথাও বলেনি। অথচ সেটা সহজেই করতে পারে বলে ওই ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। রশিদ তাকে একবারও বলতে বাধ্য করেনি যে মানিব্যাগটা তার কাছেই আছে। তাকে দিয়ে কোনও স্বীকারোক্তি করায়নি অথচ পরিস্থিতি এমন তৈরি করেছে যে মানিব্যাগ তার কাছেই আছে। সদর স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছিল সপ্তম। হঠাৎ মনে হল, এটাই ভাল হয়েছে। সুভাষদাকে ডলারগুলো দিলে হাতছাড়া হয়ে যেত। রশিদ তবু আটশো ডলার তাকে দিয়ে দিচ্ছে। আটশো ডলার মানে আটত্রিশ হাজার টাকার কাছাকাছি। ওই টাকা দিয়ে একটা কিছু করা যায়। সমস্যার সমাধ দেখতে পাওয়ায় খুব খুশি হল সপ্তম। সদর স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে সে ঘড়ি দেখল। মাধবিকার কথা মনে এল। নাঃ, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ নিজের নাম কানে এল। কেউ তার নাম ধরে চিৎকার করছে।

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সে মারুতি ভ্যান এবং রাসেলকে দেখতে পেল। কাছে। রাসেল বলল, 'আপনি এই সময় এখানে? উঠে আসুন।'

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?

রাসেল হাসল, 'ধরে নিন নরকে।'

নরক মানে?' গাড়িতে উঠে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'বলছি, তার আগে বলুন আপনি এ সময় এ পাড়ায় কেন?'

'একটা কাজে এসেছিলাম।'

'কাজ হল?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।' বলতে বলতে সপ্তম দেখল গাড়ি পার্ক স্ট্রিটে ঢুকছে। সে বলল, 'আপনি আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন, তা হলে পাতাল রেল পেয়ে যাব।'

'বাড়ি ফেরা জরুরি?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি দাঁড় করাল রাসেল, 'জরুরি হলে আটকাবো না, একা যাচ্ছিলাম, আপনাকে দেখে মনে হল ভগবান সঙ্গী পাইয়ে দিলেন। কপালটাই খারাপ।'

সপ্তম তাকাল রাসেলের মুখের দিকে। এই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়? এতসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অথচ সে কাউকে বলতে পারছে না। আজ যদি সে খুন হয়ে যায় তাহলে কেউ জানতেও পারবে না, কেন খুন হল। রাসেলের সঙ্গে তার আলাপ কয়েক ঘণ্টার। তফাত লোকটা তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে চলেছে। প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল, সেটা সুভাষদাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। পরে সুভাষদার ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলার পরে আর সেটা কারণ হিসেবে থাকছে না।

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

'কাছেই, ক্যামাক স্ট্রিটে। ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা মেরে বাড়ি চলে যাব।' রাসেল বলল।

ঘড়ি দেখল সপ্তম। তার মানে বাড়ি ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হবে। এমন কিছু বেশি রাত নয়, তবু মাকে একটা ফোন করতে হবে।

সে বলল, 'চলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালু করল রাসেল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

রাসেল স্ট্রিটের মোড় পার হওয়ার সময় সপ্তমের মনে হল ফুটপাত দিয়ে যে মহিলা হেঁটে মোড়ের দিকে যাচ্ছে তাকে অনেকটা মাধবিকার মত দেখবে। উল্টো পথে যাওয়া গাড়ি থেকে নেমে সেটা যাচাই করতে যাওয়া সম্ভব নয়। গাড়ি থামল ক্যামাক স্ট্রিটের একটি বাড়ির সামনে।

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'এটাই কি আপনার নরক?'

'হ্যাঁ। কলকাতায় একশো আট রকমের নরক আছে। এটি তার একটি।'

সপ্তম দোনমনা করছিল। সে ভেবেছিল রাসেল পার্ক স্ট্রিটের কোনও বার-এ বসে মদ খাবে। সেখানে একটা ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে বসে ওর সঙ্গে কথা বলা যেতে পারত। কিন্তু এই জায়গাটা কীরকম তা সে বুঝতে পারছে না। রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি খুব চিন্তায় আছেন?'

'হ্যাঁ, রাসেল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।'

'বলুন, যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে বলবেন। আসুন।'

লিফটে ঢুকে পড়ল রাসেল, অতএব পা বাড়াল সপ্তম।

পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে বেলের বোতাম টেপার পর দরজা এব ইঞ্চি খুলে আটকে গেল। যে উঁকি দিল তাকে রাসেল বলল, 'ফোনে কথা হয়েছে, আমি রাসেল।'

মিনিটখানেক বাদে দরজা খুলে গেল। একদা সুন্দরী কিন্তু এখনও চটক আছে এমন একজন প্রৌঢ়া মহিলা একগাল হেসে দুটো হাত ডানার মত ছড়িয়ে বললেন, 'সুস্বাগতম ওয়েলকাম। আমি ভাবলাম ফোন করে ভুলেই গেলেন।'

রাসেল একটুও বিগলিত না হয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার বন্ধু।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা সপ্তমের উদ্দেশ্যে নমস্কারের ভঙ্গি করে বললেন, 'আসুন।'

ভেতরে ঢোকামাত্র দরজা বন্ধ করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনার জন্যে ঘর তৈরি করে রেখেছি। প্রথমে কী দেব বলুন?'

রাসেল বলল, 'মিনিট দশেক কেউ যদি আমাদের বিরক্ত না করে তাহলে খুশি হব।

'মনে হচ্ছে মুড খারাপ।' হাসলেন মহিলা, 'ঠিক আছে, তাই হবে। ড্রিঙ্কস পাঠাবে তো?'

'হ্যাঁ।' বলে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রাসেল। সপ্তম তাকে অনুসরণ কর মাত্র মহিলা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

সপ্তম লক্ষ্য করছিল যথেষ্ট দামি আসবাবে দুটো ঘর সাজানো। দ্বিতীয় ঘরটিতে চমৎকার একটি সাজানো খাট ছাড়াও সোফাসেট এবং চমৎকার সেন্টার টেবিল রয়েছে সেখানে বসার পর রাসেল বলল, 'সহজ হয়ে বসুন। এখানে কোনও সমস্যা নেই।'

সপ্তম বলল, 'এতদিন শুনে এসেছি, এই প্রথম এলাম।'

'তাই? এখানে কোনও রিস্ক নেই। পুলিসের খুব বড় এক কর্তার স্নেহধন্যা ওই মহিলা হ্যাঁ, আপনার আপত্তি না থাকলে সমস্যাটা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।'

সপ্তম চোখ বন্ধ করল। তারপর গত রাতের ট্যাক্সি ধরা থেকে পুরো ঘটনাগুলে একের পর এক বলে গেল। এই বলার মধ্যে একজন লোক ট্রে-তে করে হুইস্কির বোতল গ্লাস, জল, বরফ আর বাদামের প্লেট নিয়ে ঢুকে নিঃশব্দে রেখে চলে গেল। পুরোট শোনার পর রাসেল গম্ভীর হয়ে বোতলের মুখ খুলল, 'মারাত্মক ব্যাপার। এই রশিদ লোকটাকে সত্যি খুব পাওয়ারফুল বলে মনে হচ্ছে। ওর সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু ডলারগুলো কোথায় রেখেছেন?'

'বাড়িতে। এমন জায়গায় আছে কেউ খুঁজে পাবে না।'

'আমার মনে হয় ডলারগুলো ফেরত দিয়ে দেওয়াই ভাল। আর ওরা তো আপনাকে আটশো ডলার দেবে বলেছে। সেটা কম টাকা নয়।' গ্লাসে মদ ঢালছিল রাসেল। দ্বিতীয় গ্লাসটা ঢালার সময় বাধা দিল সপ্তম, 'আমাকে দেবেন না।'

'কেন? আপনি মদ খান না?'

'না।'

'কখনও খাননি?'

'না। একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক পেলে চলে যাবে।'

'না। এখানে কেউ এসে ওসব খায় না। আমি তিন চামচ হুইস্কির সঙ্গে পুরো গ্লাস জল

মিশিয়ে দিচ্ছি। এটা খেলে তিনবছরের শিশুরও নেশা হবে না। আপনার যতটা সময় লাগে নিন; একটু একটু করে খান। পনের মিলিগ্রম হুইস্কির সঙ্গে একগ্লাস জল মেশানোর পর ওটা যেমন জলের চেহারায় থাকল না, আবার মদ বলেও মনে হল না।

গ্লাস চুমুক দিয়ে রাসেল বলল, 'ব্যাপারটা সুভাষদার কানে যেন না যায়। যদিও যায় ডলার সে আপনার কাছে এসে ফেরত নিয়ে গেছে একথা উনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু বিশ্বাস না করা এক ব্যাপার আর প্রমাণ পাওয়া অন্য ব্যাপার।'

'আপনি ছাড়া কেউ জানে না।'

'আমার কাছ থেকে ফাঁস হবে না। আচ্ছা, ওই কাগজটায় শুধু নাম লেখা ছিল? জাস্ট কয়েকটা নাম?' রাসেল জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। রশিদের কথায় মনে হল কাগজটা খুব মূল্যবান। বলেই ফেলেছে, ডলারের দাম এমন কিছু বেশি নয়, তার চেয়ে দামি কিছু ব্যাগে আছে।'

'নামগুলো মনে আছে?'

'না।'

'কাগজটার কথা রশিদ আপনাকে বলেছে।'

'সরাসরি নয়। যেখানে আছে সেখানে চট করে চোখ যাবে না।'

'তা হলে আপনারও যায়নি। ওই কাগজ সরিয়ে রেখে ডলারসমেত ব্যাগ ফেরত দিয়ে দেবেন। সুভাষদাকে বলা কথাটা তাহলে সত্যি হয়ে যাবে।' রাসেল হাসল।

মাথা নাড়ল সপ্তম, 'কিন্তু রশিদ তো ওই কাগজটির কথাই ইঙ্গিতে বলেছে।'

'ইঙ্গিতে বলা আর মুখে বলা এক কথা নয়। ও যে ইঙ্গিতে বলেছে তা আপনি বোঝেননি।' রাসেল পানীয়ে চুমুক দিল, কিন্তু ওই কাগজে লেখা নামগুলো মনে হচ্ছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যার কাছে কাগজটা ছিল সে যদি নামগুলো মনে রাখতে পারত তাহলে কাগজটার গুরুত্ব তেমন থাকত না। সপ্তম, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং।'

সপ্তম মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কিন্তু কাগজটা রেখে দিলে ওরা আমার শত্রু হয়ে যাবে।'

'শত্রু তো এখনও। তবে ভদ্রতা করে যাচ্ছে।'

'আমি তো নামগুলো অন্য কাগজে টুকে রাখতে পারি!'

'শুধু নামগুলো ছাড়া কাগজটায় আর কিছু নেই, কোনও সিম্বল বা ওই জাতীয় কিছু!'

'না। নেই।'

'বেশ, তাহলে তাই করুন। নাম টুকে নিয়ে কাগজটা মানিব্যাগের যেখানে ছিল, সেখানে ঢুকিয়ে রাখবেন যেন ওরা কোনও সন্দেহ না করে।'

সপ্তমের মনে দুপুরে দেখা হওয়া দাদার কথা এল। সে প্রসঙ্গটা তুলুন।

রাসেল মাথা নাড়ল, 'আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু এখানে ওকে ডাকা ঠিক হবে না। আচ্ছা, দাঁড়ান, কাল ওকে আসতে বলি।' মোবাইল বের করে নাম্বার টিপল রাসেল। ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওপাশে ফোন বেজে যাচ্ছে। দু'দুবার চেষ্টা করার পর বলল, মোবাইল অন অথচ ফোন ধরছে না কেন! বাড়ির নাম্বারে ফোন করে দেখি।' নিজের মোবাইলের ফোনবুক থেকে নাম্বার দেখে নিয়ে আবার ডায়াল করল রাসেল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'এনগেজড্।'

এই সময় মহিলা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন, 'কি ব্যাপার! শুধু গল্প করলেই হবে কাজের পাশাপাশি আনন্দ না করলে চলে!'

রাসেল সপ্তমের দিকে তাকাল, 'বেশ, এখন একটু আনন্দ করা যাক। কি বলে সপ্তম?'

সপ্তম রহস্য অনুমান করছিল কিন্তু তার মনে হচ্ছিল রাসেলের উচিত ওই ফোনটাকে জরুরি ভেবে চেষ্টা করে যাওয়া। রাসেল মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে আছে? চেনাজানা কেউ?'

চোখ ঘুরিয়ে মহিলা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'মনে হয় না দেখেছেন। এ খুব ভাল মেয়ে। এ সময় তো ওর এখানে থাকার কথা নয়। হাসব্যান্ড ট্যুরে গিয়েছে বলে সন্ধে সময় এসেছে। এখন যাব যাব করছে।' কথাগুলো বলেই সপ্তমের দিকে তাকিয়ে খুকি খুকি ভাব করে মহিলা বললেন, 'জানেন দাদা, ভাল-ভাল মেয়েরা আসে দুপুরবেলায়। স্বামী অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর সংসারের কাজ শেষ করে তো হাতে অনেকটা সময় আমার কাছে এলে আনন্দ যেমন হয় রোজগারও কম হয় না। তবে ওই আর কি, বিকেল পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যায় ওরা। সবদিক বজায় রেখে চলতে হবে তো! তা আমি এঁ দাদাকে কতবার বলেছি দুপুরে এসো, উনি নাকি সময় পান না। আজ মালিনী আছে বলে তবু মুখ রক্ষে হল। এ সময় যারা থাকে তাদের কাউকে দাদার মনে ধরে না। আসে, মা খায়, পুরো টাকা দিয়ে চলে যায়। নিতে আমার এত খারাপ লাগে'

মহিলা উঠলেন। তারপর শরীর দুলিয়ে দরজা খুলে বাইরে চলে গেলেন। রাসেল হঠাৎ সপ্তমকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি মহিলাদের সম্পর্কে দুর্বলতা আছে?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল।

'আপনি তো অবিবাহিত?'

'হ্যাঁ।'

'মহিলা সংসর্গ করেছেন?'

'না-না।' প্রবলভাবে মাথা নাড়ল সপ্তম।

'আগ্রহ থাকলে বলুন।'

'বিন্দুমাত্র নয়।'

'তাহলে মজা দেখুন।'

এইসময় দরজায় এসে যে দাঁড়াল তাকে স্বচ্ছন্দে তামিল ছবির নায়িকার ভূমিকা দেওয়া যায়। মাঝারি লম্বা, গায়ের রঙ ফর্সা, কোমর সরু, বুক এবং নিতম্ব অতিরিক্ত ভারি। জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি?'

'অবশ্যই।' রাসেল বলল।

সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে এগিয়ে এসে সোফায় হাত রেখে মেয়েটি বলল, 'আমি নীলা।'

'বাঃ, সুন্দর নাম। বসুন।'

'ওমা। আমাকে আপনি বলছেন কেন?' খিলখিল করে হেসে ধপ করে সোফায় বসল নীলা। তার পরনে হাঁটুর নিচ ঢাকা বিচিত্র রঙের লুঙ্গি আর টাইট শার্ট যার ওপরের বোতাম দুটি খোলা।

'তোমাকে তো তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে?' রাসেল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। সাড়ে দশটায় আমাদের হাউজিংয়ের গেট বন্ধ হয়ে যায়। হাজব্যান্ড শহরে থাকলে তো এসময় এখানে থাকার কথা ভাবতেই পারি না। ঘড়ি দেখল নীলা।

'ভদ্রলোক কবে ফিরবেন?'

'পরশু।'

'তার মানে কালও আপনি ফ্রি?'

'নাঃ। কাল দুপুরে রায়চকের ব্যাডিসন ফোর্টে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে।'

'বাবা। খুব বড় পার্টি মনে হচ্ছে!'

আবার হাসল নীলা। রাসেল দ্বিতীয়বার গ্লাসে মদ ঢেলে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি নেবে? তাহলে গ্লাস দিতে বলি!'

'না! শহরে থাকলে আমি মদ খাই না। অনেক ঠকেছি। একবার বোম্বেতে তো মদ খাওয়ার জন্যে মরতে মরতে বেঁচে গেছি!'

'বোম্বে গিয়েছিলে, স্বামী সঙ্গে ছিল না?'

'দূর! তখন তো বিয়ে হয়নি।' নীলা চোখ ঘোরালো, 'আমি তখন গান গাইতাম।'

'কি গান?'

'হিন্দি, সিনেমার গান।'

'বারে গাইতে?'

'হুঁ।'

'তাহলে তো অনেক টাকা রোজগার করেছ!'

'ওসব টাকা থাকে না।' ঘড়ি দেখল নীলা।

'তোমার যা ফিগার, নিশ্চই ভাল গাইতে, সিনেমায় চান্স পাওনি?'

'ওখানকার সব লোক দশ নম্বরি দালাল। একজন বলল দুবাইতে প্রোগ্রাম করলেই ফিরে এসে একটা বড় ছবিতে চান্স দেবে। আমি তার আগে ভয়ে দুবাইতে যেতে রাজি হইনি। অনেক মেয়েই যেত। শুনতাম ওখানে গেলে শেখরা যতটা না গান শোনে তার চেয়ে বেশি ছিঁড়ে খায়। তা-ও সিনেমায় চান্স পাওয়ার লোভে রাজি হয়েছিলাম।

'তাহলে দুবাই ঘোরা হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, তখন থেকে আপনি শুধু কথা বলেই যাচ্ছেন, আমার হাতে তো বেশি টাইম নেই।' নীলা আপত্তি জানালো।

সপ্তম সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল, 'তাহলে আমি বাইরে যাই—।'

নীলা বলল, 'থাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম বোধহয় আপনার জন্যেও ব্যবস্থা করেছে।'

সপ্তম আঁতকে উঠৎ, 'না না। কোনও দরকার নেই।

রাসেল বলল, 'আরে সপ্তম, যাচ্ছেন কোথায়, বসুন।'

নীলা বলল, 'একি? উনি এ ঘরে থাকবেন নাকি? আমরা কি সিনেমার শুটিং করব?'

'আমরা কিছুই করব না। বসুন সপ্তম। আমরা গল্প করব।'

'ওমা। একি কথা!'

'চেঁচাবেন না। আপনার যা প্রাপ্য তা নিশ্চয়ই পাবেন।'

'ও। সো নাইস অব ইউ!'

'হ্যাঁ, নীলা, আমি কখনও দুবাই যাইনি। শহরটা কেমন?'

'দেখার সুযোগই পাইনি।'

'তার মানে?'

'সেই যে নিয়ে গিয়ে গেস্ট হাউসে তুলেছিল আর বেরুবার চান্সই পাইনি।'

'তারপর?'

'একদিন হোটেলে গান গেয়েছিলাম, বাকি কদিন, বুঝতেই পারছেন!'

'তুমি একা ছিলে?'

'না। আরও তিনটে মেয়ে ছিল। ওখানে প্রচুর বাঙালি মেয়ে পার্মানেন্টলি থাকে। হোটেলে গান গায়। সে সময় একজনের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।'

'কার সঙ্গে?'

'ওরা যাকে ভাই বলে, তার খুব কাছের লোক।'

'কাকে ভাই বলে?'

'আমি ওই নাম মুখে আনতে পারব না।'

'তা সেই ভাই-এর কাছের লোক তোমাকে কীভাবে বাঁচাল?'

'যারা নিয়ে গিয়েছিল তারা ওখানকার কয়েকজন শেখের কাছে আমাকে বিক্রি করে দেওয়ার ধান্দা করেছিল। রহমানসাহেব আমার পাশে আসায় কেউ কিছু বলেনি।'

'রহমানসাহেব তোমাকে সাহায্য করলেন কেন?'

'আমাকে নাকি ভাল লেগেছিল। মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা করেন। খুব ভাল লোক। এবার আমি উঠব।'

'তোমার ম্যাডামকে ডাকো।'

নীলা উঠে ভেতরে চলে গেল। পরমুহূর্তেই ম্যাডাম দেখা দিলেন। রাসেল তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে দিতে মহিলা বললেন, 'সত্যি, আপনি পাগল। এখানে এসে শুধু শুধু টাকা দিয়ে যান। আমার গায়ে লাগে।'

রাসেল বলল, 'ধন্যবাদ, আপনার এখানে আর মিনিট পাঁচেক থাকব।'

'নিশ্চয়ই।' তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মোবাইলের বোতাম টিপল রাসেল বলল, 'এবার বাড়ির ফোন বাজছে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সুলতান সাহা হ্যায়? হোয়াট? মাই গড়!'

মোবাইল অফ করে উঠে দাঁড়াল রাসেল, 'চলুন সপ্তম।'

'কি হয়েছে?'

'আজ দুপুরে যে বড়দাদাকে আমি ডেকে এনেছিলাম সে খুন হয়ে গিয়েছে।'

'সেকি?'

'চল, যাওয়া যাক।' রাসেল এগোল।

গাড়িতে উঠে রাসেল বলল, 'চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

সপ্তম খুশি হল। ক্যামাক স্ট্রিটের এই অঞ্চল থেকে বাস ধরতে অনেকটা হাঁটতে হত। সে বলল, 'বাস বা মেট্রো স্টেশনে ছেড়ে দিলেই চলবে।'

রাসেল কথা বলছিল না। চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিল। সপ্তমের মনে হল লোকটা তার কথা যেন শুনতেই পায়নি। টেলিফোন পাওয়ামাত্র বেশ নার্ভাস হয়ে গেছে। ধর্মতলা পার

হয়ে আসার পর রাসেলের মোবাইল বেজে উঠল। গাড়ি চালাতে চালাতে সে মোবাইল অন করল নাম্বারটা দেখে, 'কী ব্যাপার সুভাষদা, আপনি?' সপ্তম চমকে তাকাল।

'হ্যাঁ, আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি। না না, আপনাকে না-জানিয়ে আমি কারও সঙ্গে কথা বলব না। কী নাম বললেন? জনি! প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক আছে।' মোবাইল অফ করল রাসেল। তারপর হেসে বলল, 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।'

চুপচাপ শুনছিল সপ্তম, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। রাসেলের যদি বলতে ইচ্ছে করে তাহলে সে নিজেই বলবে। কিন্তু জনি নামটা কীরকম চেনা চেনা লাগছে। জনি—জনি। ও হ্যাঁ, ওই ইমরান রহমানের পার্সের মধ্যে লুকনো কাগজটায় যে চারটে নাম লেখা ছিল তার প্রথম নাম জনি। সে কথাটা রাসেলকে বলল। রাসেল চমকে উঠে গাড়ি রাস্তার এক পাশে দাঁড় করাল।

'যে চারজনের নাম ওই কাগজে লেখা আছে তার একজন জনি?'

'হ্যাঁ।'

'বাকি তিনজনের নাম মনে পড়ছে?'

'নাঃ। তবে বাড়িতেই তো কাগজটা আছে।'

একটু ভাবল রাসেল, 'সপ্তম, আপনার আবিষ্কৃত কাগজটা খুব মূল্যবান। বুঝতেই পেরেছেন, সুভাষদা ফোন করেছিলেন। ওই মাফিয়া দাদার মৃত্যুর পর খুব দ্রুত ক্ষমতা হাতবদল হচ্ছে। এখন যে দাবিদার তার নাম জনি। এই জনি যে আপনার পাওয়া কাগজের জনি তা নাও হতে পারে। আবার হতেও পারে। তাই অন্য তিনটে নাম জানা দরকার।'

সপ্তম উত্তেজিত হল, 'আমার মনে হচ্ছে একই লোক। কারণ রশিদ সরাসরি না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছে। টাকাপয়সা হারালেও ক্ষতি তেমন হয় না কিন্তু কোনও মূলব্যন জিনিস হারিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ হয় না, এইরকম যেন বলেছিল। ও যে আমাকে ডলার ফেরত দিলে কমিশন দিতে চেয়েছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে টাকার চেয়ে এই কাগজটা ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

'রাইট। মনে হচ্ছে রশিদ নামগুলো জানে না। ইংরেজিতে লেখা?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে ইমরান জানে। রশিদ বোধহয় তার কাছে জানতে পারছে না।'

রাসেল আবার গাড়ি চালু করতে যেতেই সপ্তম ওদের দেখতে পেল। স্বামী-স্ত্রী আসছে। স্ত্রীর সাজসজ্জা আজ আরও আকর্ষণীয়, অন্তত স্বামীর পাশে তাই লাগছে! ভদ্রমহিলাই ওকে দেখতে পেলেন, 'কেমন আছেন?'

রাসেল দাঁড়িয়ে গেল। সপ্তম বলল, 'একদিনে আর কত খারাপ হব বলুন।'

ওঁরা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'তা বলবেন না। একদিনে একটা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। আপনি তো কাল পেছনের সিটে ছিলেন ও তাই এখন চিনতে পারেনি।

আমি কিন্তু দূর থেকে দেখেই চিনে ফেলেছি। মহিলা হাসলেন।

'হ্যাঁ, আমি পারিনি।' ভদ্রলোক মাথা দোলালেন, 'ওর দূরদৃষ্টি খুব ভাল।' রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁরা কি নর্থে যাবেন?'

ভদ্রমহিলার নাম মনে পড়ে গেল এবার, সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনাদের এখন প্রোগ্রাম কী?'

'আমাকে সুজলা বললে খুশি হব। প্রোগ্রাম? দেখুন না, বাড়ি যাব কিন্তু ট্যাক্সি পাচ্ছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার দত্তগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছেন?'

রাসেল এবাব কথা বলল, 'পেছনের দরজা খুলে উঠে বসুন।'

তৎক্ষণাৎ ওঁরা গাড়িতে উঠলেন। রাসেল গাড়ি চালু করলে সপ্তম তার দিকে তাকাল। রাসেল বলল, 'মাথা খুব ভারি হয়ে গিয়েছে, বুঝলেন? সুভাষদার ফোন পাওয়ার পর আরও বেড়েছে।'

সুজলা বললেন, 'এই জন্যে ওকে বলি বেশি পরিশ্রম কর না। আমার তো সেই উপায় নেই। যখনই কেউ ডাকে তখনই ছুটে যেতে হয়। জানেন সপ্তম, আর মাস ছয়েকের মধ্যেই,' বলে থেমে গিয়ে বললেন, 'না বাবা বলব না, বললে যদি কেটে যায়।'

সপ্তম অবাক হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা যে তার নাম মনে করে রেখেছেন তা সে ভাবতে পারেনি। হঠাৎ দত্তগুপ্ত বললেন. 'ও হো, আপনার সঙ্গে লোকটার দেখা হয়েছে?'

'কার সঙ্গে?'

'নিরীহ চেহারার দেখতে। অবাঙালি বলে বোঝা যায় না। আপনার খোঁজে আমাদের পাড়ায় গিয়ে হাজির। আপনার যা বর্ণনা দিল তাতে চিনে ফেললাম। বললাম আরে, এই ভদ্রলোকের ট্যাক্সিতেই তো আমরা এসেছিলাম। আপনার ঠিকানা জান না তো, তাই বলতে পারিনি। ভদ্রলোক জানালেন।

'আঃ, বড্ড বকো তুমি। বলেছি না আমি পাশে থাকলে তুমি বেশি কথা বলবে না!

'কোথায় কথা বললাম।'

'বাঃ। দেখুন সপ্তম, কীরকম উজবুক লোকের সঙ্গে আমাকে ঘর করতে হয়!'

রাসেল হাসল, 'উজবুক। শব্দটা অনেকদিন পরে শুনলাম।'

'একে উজবুক তার ওপর রোজ মাল খাওয়া চাই। এমন হাড়কিপ্টে যে অর্ডিনারি রাম খাবে। কত বলেছি খেতে হলে প্রিমিয়াম হুইস্কি খাও, ফুরফুরে গন্ধ পাব। এখন পাশে বসে আছে ঠিক ডাস্টবিনের মত। উজবুক তো কম বলেছি।' সুজলা বললেন। 'উনি কি রোজ সন্ধের সময় ধর্মতলায় আসেন পান করতে?'

'উপায় কী বলুন। তারপর ফোন যায়, ওগো এস।'

সপ্তম হেসে ফেলল, বাড়িতে বসে খেলে আপনাকে ছুটতে হয় না।'

'কী যে বলেন! বাড়িতে শাশুড়িমা আছেন না! নর্থ ক্যালকাটার বাড়িতে বসে মায়ের সামনে ছেলে মদ খেতে পারে? তাছাড়া আর একটা কারণে আমি না বলি না!' হাসলেন সুজলা।

কথাটা শোনামাত্র দত্তগুপ্ত হিক হিক শব্দ করে হাসলেন।

'মাল খেয়ে নেশা হলে ওদের সঙ্গে কাজ করতে আমার সুবিধে হয়।'

'মানে?' চমকে উঠল রাসেল।

'তখন তো সব সমুদ্রের মত মন। না মিসেস গুপ্ত, আপনি বলছেন আর আমি না বলব তা কি হয়!' গলা নকল করলেন সুজলা, 'আমার অ্যামওয়ের ব্যবসা তো ওঁদের কল্যাণেই বড় হচ্ছে।'

'দত্তগুপ্তের বদলে মিসেস গুপ্ত বলে ডাকে তখন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'তবু তো মিসেস গুপ্ত বলে, অন্য কিছু বললেই বা কী বলতাম!' কথাটা শেষ করতে না করতেই ধমকে উঠলেন, 'আঃ, গায়ে পড়ো না তো! মাল খেলেই ঘুমাবে!'

'কই, ঘুমাইনি তো!'

'সোজা হয়ে বস। এই হয়েছে জ্বালা, বুঝলেন। তিন গ্লাস পেটে পড়লেই ঢুলতে আরম্ভ করে। তখন অন্য লোকগুলো সুযোগ খোঁজে। চটাতেও পারি না। এই যে আজই, লোকটা নাকি সিরিয়ালের প্রোডিউসার-ডিরেক্টার, বেশ ভদ্রলোকের মত বলছিল, যেই ওর এই হাল হল অমনি তার মুখ ফুটল। আপনি একবার হ্যাঁ বলুন, আমার নেক্সটা প্রোজেক্টের হিরোইন করব আপনাকে। এই অ্যামওয়ে করে কত টাকা পান? সোনায় মুড়িয়ে দেব আপনাকে। আহা, কী ফিগার!'

'তারপর?' রাসেল হাসল।

'বোকার মত বলে ফেলেছি, না না কী এমন ফিগার আমার! ব্যস, বলে কিনা, কী বলছেন, আপনার মত বুক কোমর হিপ বাংলার কোনও হিরোইনের আছে? বলছে আর টেবিলের তলা দিয়ে আমার পায়ে চাপ দিচ্ছে। এসব ওর জন্যে। হুঁশ যখন রাখতে পার না তখন খাও কেন? খচ্চর।'

রাসেল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। মনে হচ্ছিল এত মজা সে অনেকদিন পায়নি। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি খচ্চর শব্দটা কী সুন্দর গলায় উচ্চারণ করলেন!'

সুজলাও খুব হাসলেন। সপ্তম বুঝতে পারছিল রাসেল সুজলার কথাবার্তা খুব উপভোগ করছে। হয়ত কিছুক্ষণ আগেও যে বিরাট চাপ ওর ওপর ছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

বিবেকানন্দ রোড পেরিয়ে সুজলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কিন্তু জানা হল না!'

'রাসেল, আমি রাসেল।'

'ওমা! এ তো বিদেশি নাম। বাঙালির হয়?'

'হয়। রিটা তো রীতা হয়েছে বাংলায়, তাই না?' রাসেল হাসল।

'তা বটে। বেশ নাম, রাসেল, অ্যাই ঢ্যামনামো করো না।' ধমকালেন সুজলা।

'আমায় বললেন?' গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করল রাসেল।

'দূর, আপনাকে কেন বলব। এমনভাবে গায়ে পড়ছে যেন নেশায় ডুবে আছে। কিন্তু পুরো হুঁশ আছে, কান খাড়া করে শুনছে।'

'সে কী!' সপ্তম পেছন ফিরে তাকাল। মিস্টার দত্তগুপ্ত স্ত্রীর কাঁধে মাথা রেখে পড়ে আছেন। দেখে মনে হয় খুব ঘুমোচ্ছেন।

'আসলে বাড়িতে কাছে ঘেঁষতে দিই না তো, তাই চান্স নিচ্ছে!' সুজলা বললেন।

'অ্যাঁ, সে কি? শব্দ করে হাসল রাসেল।

'যাক গে রাসেল, আপনি নিশ্চয়ই অ্যামওয়ে সম্পর্কে কিছুই জানেন না? সুজলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ভাসা ভাসা।'

'গুড। তাহলে একটা সময় দিন—!'

'ওইটেই খুব মুশকিল ম্যাডাম। সময় আমার হাতে নেই।'

'বিয়ে করেছেন?'

'সময় পাচ্ছি না।'

'দূর, তা কি হয়! আপনার কার্ড আছে?'

'তা আছে।' বাঁ হাত দিয়ে কার্ডটা বের করে দিয়ে দিল রাসেল।

এবার উঠে বসলেন দত্তগুপ্ত, 'কোথায় এলাম? আরে আরে, থামান, চলে যাচ্ছে'

গাড়ি থামল রাসেল, 'আপনাদের বাড়ি কোনদিকে?'

দত্তগুপ্ত বললেন, 'বাঁ দিকের রাস্তায়। এই নামো।'

'দাঁড়ান। গাড়ি ঘোরাল রাসেল, 'বলবেন ঠিক কোথায় থামাতে হবে।'

সুজলা বললেন, 'এ কী! আপনি পৌঁছে দেবেন নাকি?'

'আপনার জন্যে এটুকু করলে খুশি হব।'

'মেরেছে।' দত্তগুপ্ত বললেন।

'মেরেছে মান?' সুজলা চেঁচালেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'আরে মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে না?'

'ও হ্যাঁ, রাসেল গাড়ি থামান' তো। মেয়ে বাপের বাড়ি আছে, ওকে নিয়ে যাবে ও।

'অ্যাঁ, আমি নিয়ে যাব? এই অবস্থায়?'

'আলবত নিয়ে যাবে। মেয়ে তার মাতাল বাবাকে দেখুক। নামো।' স্ত্রীর ধমকে স্বামী গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। সুজলা বললেন, 'ওই মোড়ের বাড়িটা—।

যেখানে পৌঁছে হাত তুলে দোতলা দেখালেন সুজলা, 'ওই ফ্ল্যাট। আর ও গেল আমার মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে আনতে। শাশুড়িমাকে বিরক্ত করতে চাই না, বুঝলেন।'

হঠাৎ সপ্তম একটু ফাজিল হল, 'আচ্ছা আপনার স্বামী কি রোজ মদ্যপান করেন?'

'ওই চব্বিশ ঘণ্টায় তিন পেগ্। আসলে ওর তো কোনও রিক্রিয়েশন নেই তাই এটুকু অ্যালাউ করতেই হয়। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে।'

'না না। অনেক ধন্যবাদ। চলি।' রাসেল গাড়ি ঘোরাল। সপ্তম মুখ ফিরিয়ে দেখল ফুটপাথ ফাঁকা। ভদ্রমহিলা এর মধ্যেই উধাও।

রাসেল হাসল, 'আজব স্বামী-স্ত্রী। দেখবেন এদের কখনও ছাড়াছাড়ি হবে না।'

সপ্তম বলল, 'ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমার তো খারাপ পাড়ার মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। ওইসব শব্দ—! এমনকি ট্যাক্সিওলাও ওদের দর্জিপাড়ায় নামাতে চেয়েছিল।'

'দর্জিপাড়ায়? ও হো!' হেসে ফেলল রাসেল, 'আমরা কেউ খবর রাখি না মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারের সম্পর্কগুলো, কথাবার্তায় কীরকম পরিবর্তন এসে গেছে। আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগল। ওঁরা বেশ রিলিফ দিলেন। সিনেমায় কমেডিয়ানরা যেমন করে। হ্যাঁ, কোনদিকে যাব?'

'কোনদিকে মানে?'

'আপনি ভুলে গেছেন। আপনার বাড়িতে যাওয়ার কথা হয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ। রাস্তাটা ক্রশ করে এগিয়ে চলুন।'

মা দরজা খুললেন। অত রাতে একজন অচেনা লোককে সঙ্গে নিয়ে সপ্তম বাড়িতে ফিরেছে দেখে একটু অবাক এবং বিরক্ত হলেন। বললেন, 'জ্যোতি দত্ত ফোন করেছিলেন।'

'ও। মা এঁর নাম রাসেল—।'

রাসেল নমস্কার করল, মা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন।

রাসেল বলল, 'এত রাতে আসাটা ঠিক হয়নি।'

'এমন কিছু রাত নয়। বসুন।'

নিজের ঘরে গিয়ে সপ্তম এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ডলারগুলো নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। ডলার দেখে রাসেল কী করবে! সে ইমরানের কার্ড; পার্স এবং কাগজটা নিয়ে বাইরের ঘরে এল। কাগজটাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা এই ভাঁজের মধ্যে এমনভাবে রাখা ছিল যে চট করে নজরে পড়বে না। কাগজটাও দেখুন, খুব পাতলা কিন্তু দামি।'

রাসেল কাগজটা হাতে নিয়ে তাকাল, 'জনি, বস্বাস, হায়দার, কানাই। সর্বনাশ।'

'মানে?'

'এরা কলকাতার নাম করা মস্তান। নিজেদের মাফিয়া বলতে চায় কিন্তু সেটা হতে হবে যে পরিকাঠামো থাকা দরকার তা এদের নেই। লোকটার নাম ইমরান রহমান। একে পুলিস ধরেছে দুবাইয়ের লোক বলে। আর এর ব্যাগেই ডলার এবং এই কাগজটা ছিল!' রাসেল যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিল।

'হ্যাঁ।'

'এই চারটে কুখ্যাত লোকের নাম ওর ব্যাগে কেন বলে মনে হয় আপনার?'

'এদের সঙ্গে ইমরান যোগাযোগ করতে চাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, রশিদের নাম নেই। রশিদও তো বেশ ক্ষমতাবান আর ইমরানের কাছের মানুষ।'

'ঠিক। এবং রশিদ এই নামগুলো কাদের তা জানে না।'

'কী করে বুঝলেন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'ও যে এত মরিয়া হয়ে ব্যাগটা খুঁজছে তার কারণ এই কাগজটা।'

রাসেলের কথা শেষ হওয়ামাত্র সপ্তমের মাথায় দুপুরের কথাগুলো ভেসে এল। সে বেশ উত্তেজিত গলায় বলল, 'রাসেল, এরাই সেই চারজন নয় তো?'

'কোন চারজন?'

'চীনে রেস্টুরেন্টে আলোচনা হচ্ছিল যে কলকাতার মাস্তানদের মধ্যে ঝাড়াইবাছাই করে দুবাইয়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। মনে আছে? সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

রাসেল নির্বাক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এই কাগজটার মূল্য কতখানি তা জানেন?'

এই সময় মা আবার দরজায় এলেন, 'বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সুভাষবাবু দুবার ফোন করেছেন।'

'ও।'

'তুই ফেরামাত্র যেন ফোন করিস বলেছেন।'

'করছি।'

মা চলে গেলেন।

রাসেল বলল, 'সুভাষদা টেলিফোনে আমাকে সতর্ক করেছেন এই বলে এখন জনি নামের এক মাস্তান আমাদের এলাকা দখল করতে চাইছে। আমি যেন তার সঙ্গে কোনওরকম সহযোগিতা না করি। এই জনি যদি সেই জনি হয় তাহলে খুব সমস্যা হয়ে গেল।'

'কেন?'

'সুভাষদাকে চটানো যাবে না আর এই লিস্টের জানি যদি সেই জনি হয় তাহলে তাকে রোখা যাবে না। আমাদের অবস্থা একেবারে স্যান্ডউইচ হয়ে যাবে। আপনি সুভাষদাকে ফোন করুন তো!'

'এখন?'

'হ্যাঁ। উনি তো বলেছেন বাড়িতে ফেরামাত্র ফোন করতে।'

'ঘুমিয়ে পড়েননি তো!'

'না না। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে টিভি দেখেন। আর হ্যাঁ, আমি যে এখানে আছি তা ওঁকে বলার দরকার নেই।' রাসেল বলল।

অতএব টেলিফোনের বোতাম টিপল সপ্তম। রিং হচ্ছে। একজন মহিলা কথা বললেন।

সপ্তম তাঁকে বলল সুভাষদার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ভদ্রমহিলা বললেন, 'উনি এখন বিশ্রাম করছেন। কাল সকালে করবেন।'

'উনিই বলেছিলেন টেলিফোন করতে। আমার নম সপ্তম।'

'ধরুন, দেখছি।'

তারপরেই সুভাষদার গলা পাওয়া গেল, 'কোথায় থাক?'

এই একটু কাজে বেরিয়েছিলাম।'

'সদর স্ট্রিটে কী করছিলে?' সুভাষদা হাসলেন।

'সদর স্ট্রীটে? ও, ওখানে একজন ক্লায়েন্ট ছিল।'

'দেখ সপ্তম, তোমাকে আমি ভাল ছেলে বলে জানি। কিন্তু তোমার তো অভ্যেস নেই, তাই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করলে আছাড় খেয়ে পড়বে। ডলারগুলো তোমার বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে যায়নি। তুমিই ওগুলো পৌঁছে দিয়ে এসেছ।' সুভাষদা হাসলেন আবার।

'কী বলছেন আপনি?'

'আমার লোক তোমাকে অনুসরণ করেছে। তুমি হোটেলে গিয়েছ। সেখান থেকে বেরিয়ে ফোন করেছ। তারপর তোমাকে পথ দেখিয়ে যে ডেরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখান থেকে একটা লোক ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বেরিয়েও কোনও নালিশ করতে চায়নি। কে লোকটা?'

গলা শুকিয়ে গেল সপ্তমের। বলল, 'বোধহয় ট্যাক্সি ড্রাইভার।'

'এই প্রথম সত্যি কথাটা বললে। আমার ভাল লাগে না জানো, যাদের পছন্দ করি; সাহায্য করতে চাই, তারাই যদি মিথ্যে বলে। আচ্ছা, পরে দেখা করো।' লাইন কেটে গেল।

'কী বলল?'

উত্তর দেওয়ার আগেই রাসেলের মোবাইল বেজে উঠল। সে স্ক্রিনে নাম্বার দেখে বলল 'সুভাষদা। কথা বলব না।'

'কেন?'

'একটু আগে আপনার ওই দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক নিশ্চয়ই ওঁর কানে গিয়েছে, মোবাইল অন করলেই আবার শুনতে পাবেন। আমি যে এখানে আছি তা ওঁকে জানাতে চাই না। অনেকক্ষণ বেজে বেজে একসময় থামল যন্ত্রটা। স্ক্রিনে ফুটে উঠল 'মিস কল।'

রাসেল যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল প্রয়োজন হলেই সপ্তম যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ব্যাপারটা যে ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই।

সে চলে যাওয়ার পর মা এসে বললেন, 'এই লোকটা কে?'

'কেন?'

'আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোর কি বলতে অসুবিধে আছে?'

'বাঃ অসুবিধে থাকবে কেন? ওর নাম রাসেল, আগেই বলেছি তো।'

'ওর গা থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছিল।' মা বললেন।

অবাক হল সপ্তম। রাসেল যখন সেই ফ্ল্যাটে বসে মদ খাচ্ছিল তখন সে গন্ধ পেয়েছিল। তারপর অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই আর গন্ধটা নিয়ে সে বিব্রত হয়নি, পরে সুজলারা যখন গাড়িতে উঠেছিল তখন তারাও গন্ধ পায়নি কারণ দত্তগুপ্তের পেটে মদ ছিল। কিন্তু এতক্ষণ বাদে মায়ের নাকে গন্ধ পৌঁছবে এটা সে ভাবতে পারেনি। সে বলল, 'হতে পারে কিন্তু ও খুব নর্মাল কথা বলেছে।'

'কী করে লোকটা?'

'প্রমোটরি।'

'তার মানে প্রচুর টাকার মালিক। তোকে ব্যবসা দেবে?'

'চেষ্টা করছি।'

'দ্যাখ সপ্তম, তুই এই শেয়ার বিক্রির ব্যাপারটা ছেড়ে দে। একটা ভদ্র চাকরি করার চেষ্টা কর। আজ বিকেলে যে লোকটা এসেছিল তাকে দেখে খুনি বলে মনে হচ্ছিল। এখন এল একটা মদো লোক। তোর কিছু হয়ে গেলে আমি কীভাবে থাকব?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আশ্চর্য! আমার কী হবে? তুমি ফালতু চিন্তা করছ।'

কথাগুলো বলে মাকে থামিয়ে দিলেও শোয়ার পর সে ভেবেছে। এই ডলার, গুপ্ত নামের লিস্ট, কলকাতার মাফিয়া নেতা ইত্যাদি সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এদের খবর রেখে তার কোনও আর্থিক লাভ হবে না। হ্যাঁ, যে আটশো ডলার রশিদ তাকে নিতে বলেছে সেটা বিক্রি করলে প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হাজার টাকা রোজগার হবে। এটা নিশ্চয়ই অনেক টাকা। এটা যখন পাচ্ছে তখন কাগজসমেত ব্যাগ ফেরত দিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলাই সঙ্গত কাজ হবে। শেয়ারের ব্যাপারে রাসেল যে আগ্রহী হবে না তা আন্দাজ করা যাচ্ছে। ওর সঙ্গে তাই দূর থেকে একটা হ্যালো হ্যালো সম্পর্ক রাখতেই হবে। আর সুভাষদা? লোকটাকে না চটিয়ে যদি ধীরে ধীরে সম্পর্কটা কাটানো যায় তার চেষ্টা

করতে হবে, সুভাষদা উপকার যেমন করতে পারেন তেমনি ক্ষতি করতে একটুও দ্বিধা করবেন না।

তারপরেই খেয়াল হল। আজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েই সন্দেহ হয়েছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। পরে বুঝেছিল লোকটা রশিদের। কিন্তু রশিদের লোক ছাড়াও সুভাষদা যে অনুসরণকারী পাঠিয়েছিলেন তা ফোনেই বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ সুভাষদা তাকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু সে-ই অনুসরণকারী কতক্ষণ তার পেছনে ছিল? ট্রেনে মাধবিকার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে, হোটেলে যেতে দেখেছে, রশিদের লোকের সঙ্গে ওদের ডেরায় যেতেও দেখেছে। তারপর? লোকটা কি সেখানেই অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছিল? উত্তরটা না হলে তাকে রাসেলের গাড়িতে উঠতে দেখেছে। ওই পর্যন্ত অনুসরণ করা সম্ভব ছিল কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর নিশ্চয়ই তাল রাখতে পারেনি। অর্থাৎ ক্যামাক স্ট্রিটের মহিলার ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা সুভাষদা জানেন না। কিন্তু তার সঙ্গে রাসেলের দেখা হয়েছিল কিনা তা সুভাষদা জিজ্ঞাসা করেননি। অথচ তাকে টেলিফোন করার পরই তিনি রাসেলকে ফোন করলেন। কেন? রাসেল বলেছে উনি যাচাই করতে চাইছিলেন রাসেল সপ্তমের বাড়িতে আছে কিনা! এই সন্দেহ ওঁর মনে আসবে কেন যদি কোনও সূত্র না থাকে? সপ্তম ঠিক করল কাল সকালবেলায় অন্য জীবন শুরু করবে!

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মা জানালেন একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঠিকঠাক হয়ে সে দরজা খুলে দেখল লোকটা কপালে আঙুল ঠেকিয়ে নমস্কার করছে। একে সে গতরাতে রশিদের ওখানে দেখেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

লোকাটা একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল। খাম খুলতেই সপ্তম পড়ল। 'প্লিজ হ্যান্ডওভার এন্টায়ার থিংস টু দি ক্যারিয়ার অফ দিস লেটার। আর।'

সপ্তম দেরি করল না। লোকটাকে দাঁড়াতে বলে ডলারগুলো, কাগজটা এবং কার্ড পার্সে ঢুকিয়ে এনে দিল। লোকটা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'এর মধ্যে কত ডলার আছে?'

'চার হাজার।'

ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে একটা প্যাকেট বের করল লোকটা, 'এর মধ্যে পাঁচশো টাকার মোট সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আছে। দয়া করে এটা নিয়ে আটশো ডলার দিন।'

হকচকিয়ে গেল সপ্তম। রশিদ ওই ডলারগুলো তার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইছে। ভালই হল, তাকে ডলার ভাঙাতে এখানে-সেখানে ছুটতে হবে না।

টাকা দিয়ে ডলার নিয়ে বিদায় হল লোকটা। দরজা বন্ধ করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'অত টাকা তোকে কেন দিল?'

'কমিশন।'

'এত কমিশন? কই এর আগে তো এত কমিশন কখনও কেউ দেয়নি।'

'দেয়নি বলে কখনও দেবে না তা কি হয়?'

সপ্তম হাসল।

'ডলারের কথা বলছিল কেন? তোর কাছে ডলার কী করে এল?'

'একজন রাখতে দিয়েছিল।' কথা না বাড়তে দিয়ে সে সোজা চলে এল নিজের ঘরে। মায়ের কাছে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগছে। কিন্তু সত্যিটা কী? আমি একজনের ডলার

ভর্তি মানিব্যাগ ট্যাক্সিতে কুড়িয়ে পেয়েছি বলে আটশো ডলার বখশিস নিচ্ছি? বলা যায়? কিন্তু ইতিমধ্যেই মায়ের মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। নাঃ। আর নয়। এই লোকগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে আসতেই হবে তাকে। কিন্তু এত টাকা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক হবে? মায়ের ঘরে একটা লোহার সিন্দুকে আছে যার চাবি মায়ের কাছেই থাকে। ওখানে রাখলে চিন্তা থাকত না কিন্তু। নাঃ। মায়ের কাছে রাখলে খরচ করার সময় কৈফিয়ত দিতে হবে। এমন তো হতে পারে মন বদলে রশিদ টাকাগুলো চেয়ে পাঠাল। তখন মাকে কী বলবে?

নিজের আলমারিতে না রেখে পুরনো জুতোর বাক্সে টাকার প্যাকেট রাখল সপ্তম। এখানে থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না। বাক্সটাকে খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিল সে। মায়ের নজর ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সকালে প্রথমে জ্যোতি দত্তের কাছে গেল সপ্তম। লোকটার মাথা ভর্তি টাক। সেটা আজ যেন একটু বেশি চকচক করছে। বসামাত্র জ্যোতি দত্ত বললেন, 'তোমার ব্যাপারটা কি?'

'কেন? কাল তো অনেকটাই এগিয়েছি।'

'কি এগিয়েছ?'

'মিসেস সামতানি রাজি হয়েছেন। আজই কাগজপত্র নিয়ে যেতে বলেছেন। এই ব্যাপারটা আপনি হ্যান্ডেল করলে ভাল হয়।'

'অসম্ভব। ভদ্রমহিলা টাক সহ্য করতে পারেন না।'

'আপনি একটা উইগ পরে নিন। আমিও সঙ্গে থাকব।'

'কেন? তুমি নিজে পারবে না?'

'একটু টাফ। তাছাড়া ওঁর স্বামী এসবের বিরুদ্ধে। আমাকে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল নয়।' সপ্তম বলল।

'তোমাকে বলেছি যে কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না। জল যেদিকে গড়াবে সেদিকে হাঁটবে। ওরা ঝগড়া করুক, তোমার কি? ডি ম্যাট আছে?

'না। সেটাও খুলতে হবে।'

'ছবি নিয়ে এসেছ?'

'না। ওঁকে তো ব্যাঙ্কে যেতে হবে।'

'সেটা ম্যানেজ করতে হবে। এ যা ক্লায়েন্ট, যেতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ। ঠিক আছে, কখন যাবে? কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ। আজই, দুপুরে।

'ঠিক আছে। বারোটার সময় জারাং রেস্টুরেন্টের সামনে থাকব। দেরি করো না।'

'জারাং?'

'ওঃ, কলকাতায় থাক তবু জারাংয়ের নাম শোননি? সদর স্ট্রিটের মুখে।'

'আচ্ছা। কিন্তু উইগ—?'

'আমার কাছে বেশ দামি তিনটে উইগ আছে। চিন্তা কর না।' জ্যোতি দত্ত বললেন।

জ্যোতি দত্তের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠল সপ্তম। এখনও অনেক সময় আছে। বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া করে টিউবে উঠলে স্বচ্ছন্দে বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। তার আগে সুভাষদার সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার। লোকটাকে চটিয়ে লাভ নেই।

সুভাষদার বাড়িতে এখনও ভিড় জমেনি। নিচের ঘরে বসার সময় হয়নি তাঁর। আর একবার দরবারে বসলে কথা বলা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। সে পাশের দরজায় শব্দ করল। যে লোকটা দরজা খুলল সে তাকে চেনে। বলল বাবুর তো এখনও নিচে নামার সময় হয়নি।'

'জানি। উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। খুব দরকার।'

'কী যেন নাম আপনাব?'

'সপ্তম।'

দরজা বন্ধ করে লোকটা চলে গেল। আশ্চর্য! এতবার এই বাড়িতে আসছে তবু নামটা ওরা জানল না? খানিক পবে লোকটা দরজা খুলে আসতে বলল। ভেতরে ঢুকেই দ্বিতীয় ঘরটায় সুভাষদাকে দেখতে পেল সে। একা চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ছেন। তাকে দেখে বললেন, 'আসুন সপ্তমবাবু। আপনি তো এখন বড়লোক!'

'কী বলছেন সুভাষদা?'

'বসো।' সুভাষদা গম্ভীর হলেন।

সপ্তম বসল। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

'রশিদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কী করে?' সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন সুভাষদা।

'ইমরান রহমান নামের একটা লোকের মানিব্যাগ আমি ট্যাক্সিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আপনাকে বলেছি। ট্যাক্সিওয়ালাকে জেরা করে ও আমার বাড়িতে পৌঁছেছিল।'

'মিথ্যে কথা। একটা লোক রাত এগারটায় ট্যাক্সি থেকে নেমে পনের মিনিট হেঁটে একটা গলিব মধ্যে বাড়িতে চলে গেল আর তাকে খুঁজে বের করা হল ড্রাইভারের কথা শুনে? বিশ্বাস করা যায়? ট্যাক্সিওয়ালা যেখানে তোমাকে নামিয়েছিল তার আধ মাইলের মধ্যে কলকাতায় কত বাড়ি আছে কল্পনা কর। সব বাড়িতে গিয়ে ঢুঁ মারা সম্ভব?'

'সেটাই তো সম্ভব করল লোকটা।'

'তুমি কাগজে পড়নি ইমবান রহমান পুলিসের হাতে ধবা পড়েছে। সে এজেন্ট!'

'পড়িনি! তবে শুনেছি।'

'তার ম্যানিব্যাগ পুলিসের হাতে না দিয়ে আর একটা গুণ্ডার হাতে তুলে দিয়েছ—এই খবর পুলিস পেলে তুমি জেলের বাইরে থাকতে পারবে?'

'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম—।'

'তোমাকে পুলিস যাতে হ্যারাস না করে তাই ডলারগুলো আমাকে দিয়ে যেতে বলেছিলাম। আমি সি পি-র হাতে ওগুলো তুলে দিতাম। কিন্তু তুমি শোননি। নিজে রশিদের ডেরায় পৌঁছে দিয়ে এলে।'

'এ কথা ঠিক নয় সুভাষদা।' সপ্তম প্রতিবাদ করল।

'চুপ করো। রশিদের ডেরা থেকে আহত হয়ে যে ট্যাক্সি ড্রাইভার বেরিয়ে এসেছিল সে জানিয়েছে ভুল বুঝে ওকে মারধর করা হয়েছিল। আসল লোক, মানে তুমি, পৌঁছে যাওয়ায় ওরা ভুল বুঝতে পেরেছে। যাক গে, কেউ আমাকে ঠকালে আমি তাকে সহজে ছেড়ে দিই না। কিন্তু তোমার ওপর আমি অতটা কড়া হতে চাই না, তবে তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।' সুভাষদা বললেন।

সপ্তম কথা না বলে তাকিয়ে থাকল।

'জনি নামের কারও কথা শুনেছ?'

'না।' সরাসরি বলল সপ্তম।

'তোমার না শোনারই কথা। জনি একটি মাস্তানের নাম। চুনোপুঁটি ছিল। হঠাৎ কাতলা হওয়ার চেষ্টা করছে। তাতে আমার কিছু এসে যেত না যদি না এদিকে নাক গলাতো? খবর পেলাম ওই লোকটার টিকি রশিদের কাছে বাঁধা। তাই তুমি রশিদের কাছে যাবে, গিয়ে বলবে, ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?' সুভাষদা জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার কথা রশিদ শুনবে কেন?'

'অত ডলার ফেরত দিয়েছ এক কথায়, শুনতেও পারে। অন্তত আমার নামটা ওর কানে তুলে দিলে দু'বার ভাববে, বুদ্ধিমান হলে ঠিক ব্যবস্থা নেবে। ব্যস, আর তোমাকে দরকার নেই।'

'ঠিক আছে। আমি রশিদের কাছে যাব।'

'গুড। তোমার শেয়ার বিক্রির ব্যবসা কেমন চলছে?'

'মোটামুটি।'

'সেকি? জ্যোতি বলল তুমি মিসেস সামতানিকে ভাল বুঝিয়েছ!'

'চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনও অনেক বাকি।'

'এই নিয়েই থাক সপ্তম। যাও।'

বাইরে বেরিয়ে এল সপ্তম। ইতিমধ্যে ভাল ভিড় হয়েছে। এই মানুষেরা মূলত এই অঞ্চলেরই। বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে সুভাষদার কাছে আসেন। উপকৃত না হলে প্রতিদিন এত লোক সুভাষদার কাছে আসত না।

একটি দামি উইগ মানুষের চেহারা কি আশ্চর্যজনকভাবে পাল্টে দেয় তা জ্যোতি দত্তকে দেখে বুঝতে পারল সপ্তম। সত্যি কথাই, সে প্রথমে চিনতে পারেনি। জারাং রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে যখন এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে তখন গলা শুনল,

'চল।'

প্রায় উত্তমকুমারের চুল নিয়ে যে জ্যোতি দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন সে ধরতেই পারেনি। আর ও রকম চুল মাথায় থাকায় যেন মুখের আদলটাও বদলে গিয়েছে।

মিসেস সামতানির পরিচারিকা প্রীতি ওদের বসতে বলে ভেতরে চলে গিয়েছিল। পাঁচটা মিনিটকে প্রায় আধঘণ্টা মনে হচ্ছিল সপ্তমের। তারও পরে প্রীতি ফিরে এল, 'ইনি কে?'

'আমার সিনিয়র।' সপ্তম বলল।

'ম্যাডাম বললেন কাল তো আপনি কথা বলে গেলেন, আজ ওঁকে আনলেন কেন?'

'উনি আমার চেয়ে ভাল বোঝাতে পারবেন।'

'তাহলে উনি থাকুন। আপনার কাজ থাকলে চলে যেতে পারেন।'

মুখচোখ লাল হয়ে গেল সপ্তমের। যে জ্যোতি দত্তের দিকে তাকাল। এমনিতেই ওঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছে, এখন যেন আরও উদাসীন বলে মনে হল। সপ্তম উঠে দাঁড়াল, 'বেশ।

জ্যোতিদা, আপনি কথা বলুন। আমি হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছি, যদি প্রয়োজন লাগে জানাবেন।'

'তাই ভাল।' জ্যোতি দত্ত সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

ওঁর ভঙ্গি দেখে খুব রাগ হল সপ্তমের। মিসেস সামতানি তাকে অপমান করলেন দেখেও কোনও প্রতিবাদ করলেন না জ্যোতি দত্ত? উল্টে মজা পেলেন বলে মনে হল।

সে নিচে নেমে যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল তার উল্টোদিকে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল। যখন খেয়াল হল তখন বুঝতে পারল হোটেলের প্রধান গেটে চলে এসেছে। আর তখনই গাড়িটা ভেতরে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামলেন মিস্টার সামতানি। ওকে দেখে তিনি অবাক। ইশারায় কাছে ডাকলেন, 'তুমি আবার এসেছ?'

'মিসেস সামতানি ডেকেছিলেন।'

'অ। আমার ঘরে এসো।' অতএব ওঁর ঘরে যেতে হল।

'কাল তো তুমি বলে গেলে না তোমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল?'

'বলা নিষেধ ছিল।'

'মানে?' চোখ ছোট করলেন বৃদ্ধ।

'মিসেস সামতানি বলেছেন তাঁর ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে যেন কথা না বলি।'

বৃদ্ধের মুখ লাল হয়ে গেল। খপ্ করে রিসিভার তুললেন, তারপর কী ভেবে নামিয়ে রাখলেন। রুমাল বের করে মুখ মুছে বললেন, 'আমি চাই না আমার স্ত্রী শেয়ার মার্কেটে টাকা ঢালুক। ওখানে শুধুই ঝুঁকি আর সেটা তদারকি করার সময় ওঁর নেই।'

'ওঁর হয়ে কাজটা আমরাই করব।'

'কোথাও যুদ্ধ বাধলে, বোমা ফাটলে বা তেমন কেউ গ্রেপ্তার হলে শেয়ার বাজারের দাম হু হু করে পড়ে যায়। তখন তোমরা কী করবে? কত টাকা ও নষ্ট করতে চাইছে?'

'নষ্ট করা মানে?'

'শেয়ার কেনা মানে টাকা নষ্ট করা। একসময় রেস খেলত। রোজ দশ হাজার নিয়ে যেত এক লক্ষ নিয়ে আসবে বলে। এক পয়সাও আনতে পারেনি। অথচ ইচ্ছে করলে দশ হাজার বাগিয়ে তের হাজার পেতে পারত। কিন্তু অল্পে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। কী কথা হল?'

'আমার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি।'

'তার মানে?'

'আমার সিনিয়র সঙ্গে ছিলেন বলে দেখা করেননি।'

'আচ্ছা! সিনিয়রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?'

'উনি প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করবেন তাই—।'

বৃদ্ধ দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরলেন। যেন কিছু করতে পারছেন না আর সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ রকম ভঙ্গি ছিল তাঁর।

সপ্তম বলল, 'আমি যেতে পারি?'

বৃদ্ধ কোনও কথা বললেন না। ওঁর অবস্থা দেখে হঠাৎ ভাবান্তর হল সপ্তমের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার স্ত্রী যদি ওই ভদ্রলোককে চলে যেতে বলেন তাহলে খুশি হবেন?'

'অ্যাঁ' চোখ তুললেন বৃদ্ধ, 'কীভাবে?'

'ফোন করে ওঁকে বলুন, যে ভদ্রলোক ওঁর সামনে বসে আছেন তার মাথায় বিশাল টাক আছে, উইগ পরে আছেন।'

'তাতে কী হবে?'

'আপনার স্ত্রী টাক পছন্দ করেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ রিসিভার তুললেন। বেরিয়ে এল সপ্তম। বেরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়াল। মিনিট তিনেকের মধ্যে জ্যোতি দত্ত হনহন করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মাথা এখন গড়ের মাঠ। সপ্তম গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?'

'তাড়াতাড়ি এখান থেকে চল।' হাঁটতে-হাঁটতে জ্যোতি দত্ত বিড় বিড় করল, 'মহিলার চোখে বোধহয় এক্সরে ফিট করা আছে। নইলে উইগটাকে ধরল কী করে!'

একেই বলে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করা। ভদ্রমহিলা যদি তাকে চলে যেতে না বলতেন, যদি জ্যাতি দত্তকেই চলে যেতে হত, তাহলে সে কি কাজটা ভণ্ডুল করে দিতে চাইত? অবশ্যই নয়। আর এখন এই ভণ্ডুল হওয়ার ফলে জ্যোতি দত্ত যেমন তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলেন, সপ্তমেরও নিশ্চিত রোজগার খারিজ হয়ে গেল। সদর স্ট্রিটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিজেকে কী রকম গর্দভ বলে মনে হচ্ছিল সপ্তমের।

যথেষ্ট অপমানিত জ্যোতি দত্ত চলে গিয়েছিলেন এক মাথা টাক নিয়ে। মিসেস সামতানির এই ব্যবহার তাঁর কাছে রহস্যজনক। ঠিক কী ব্যবহার করেছেন মহিলা? হঠাৎ উঠে জ্যোতি দত্তের চুল ধরে টান দিয়েছেন? দৃশ্যটা শোভন নয়।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সপ্তম ভাবছিল আর একবার হোটেলে ঢুকবে কি না। মিসেস সামতানির সঙ্গে দেখা করে জ্যোতি দত্তের জন্যে ক্ষমা চাইলে ভদ্রমহিলা যদি নরম হন, তাহলে কাজটা পাওয়া যেতে পারে। জ্যোতি দত্ত পারেনি, সে আর একবার চেষ্টা করতে তো পারে। সাহসে ভর করে সে এগোল। হোটেলের গেটে পৌঁছে দেখল একটা ঢাউস গাড়ি বের হচ্ছে। উর্দি পরা ড্রাইভার চালাচ্ছে আর পেছনের সিটে আরাম করে বসে আছেন মিসেস সামতানি। তাকে চিনতে পারলেন বলে মনেই হল না। গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর আর হোটেলে ঢোকার কোনও মানে হয় না। কীরকম আপসোস হতে লাগল। তখন মাথা গরম না করলেই হত।

ঘড়ি দেখল সে। এখন ভরদুপুর। সুভাষদা বলেছেন, রশিদের সঙ্গে আজই কথা বলতে। কথা বলতে বললেই বলতে হবে? এসময় তো রশিদ তার ডেরায় নাও থাকতে পারে। তখনই কথাটা মনে এল। সুভাষদা তার পেছনে ফেউ পাঠায়নি তো? কিস্যু বিশ্বাস নেই। সেই লোকটা নিশ্চয়ই রিপোর্ট করবে যে সপ্তম না-গিয়ে বলেছে, রশিদ ডেরায় ছিল না। সপ্তম চারপাশে তাকাল। সদর স্ট্রিটটা বেশ স্বাভাবিক। যারা হাঁটাচলা করছে তাদের দেখে সন্দেহ করার কিছুই নেই। কিন্তু যে অনুসরণ করে সে বুঝতে দেবে কেন?

অতএব রশিদের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল সপ্তম। কথা হচ্ছে, রশিদ তার সঙ্গে দেখা করবে কেন? ওর যা দরকার তা সপ্তমের কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছে। এখন সপ্তম যে উদ্দেশ্যে আসছে তাতে ওর তো কোনও লাভ হবে না। সপ্তম মনে মনে প্রার্থনা করছিল রশিদ যেন তার সঙ্গে দেখা না করে। চেনা রাস্তা দিয়ে বাড়িটায় ঢুকতেই সপ্তম দেখল যে

লোকটা ওর বাড়িতে গিয়ে ডলার এবং ব্যাগ নিয়ে এসেছে, সে বেরোচ্ছে। সপ্তমকে দেখে লোকটা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন?'

'রশিদ ভাই আছেন?'

'না। নেই।'

'কখন পাওয়া যাবে?'

'বলা যাচ্ছে না। জরুরি কাজে গিয়েছে।'

'ও।'

'কোনও দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

'নাঃ, ঠিক আছে।' কথাগুলো বলে সপ্তম রাস্তায় নেমে এসেই ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করে বলল, 'রশিদ ভাইকে বলবেন আমি এসেছিলাম। ঠিক আছে?' তারপর হাঁটতে লাগল।

তার খুব ভাল লাগছিল। যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে আসে তাহলে নিশ্চয়ই তার চিৎকার শুনতে পেয়েছে. অতএব সুভাষদা দুজনের কাছেই সত্যি কথা শুনবে।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট দিয়ে পার্ক স্ট্রিটে চলে এল সে। আর তখনই মনে পড়ল মাধবিকার কথা। এইসব টেনশনে মাধবিকাকে ভুলেই গিয়েছিল সে। মাধবিকা তাকে একটা কার্ড দিয়েছিল। সেটা বাড়িতেই পড়ে আছে। মাধবিকা বলেছিল রাসেল স্ট্রিটে অফিস। পার্ক স্ট্রিট থেকে ঢুকে ডান হাতের তিনটি বাড়ির পর দোতলায়।

বাড়িটায় ঢুকে দোতলায় উঠতেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লেখা বোর্ড চোখে পড়ল। হ্যাঁ, এই নামই তো বলেছিল মাধবিকা। সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা ঝকঝকে ট্রাভেল এজেন্সি দেখতে পেল। কাউন্টারের ওপাশে সুন্দরী মেয়েরা কাজ করছে। এপাশে তিনজন ক্লায়েন্ট দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েদের মধ্যে মাধবিকাকে দেখতে পেল না।

একজন বেয়ারা গোছের লোক এগিয়ে এল, ইয়েস স্যার।'

অর্থাৎ এখানকার বেয়ারারাও ইংরেজি বলে। সপ্তম বাংলায় বলল, 'মাধবিকার সঙ্গে দেখা করতে চাই, উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

'আপনার কার্ড—?'

'ওসব আমার সঙ্গে নেই।'

'কী নাম বলব?'

'সপ্তম, সপ্তম চ্যাটার্জি।'

লোকটা চলে গেলে সপ্তম চারপাশে তাকাল। গোটা পৃথিবীটাকেই যেন এখানে ধরা যায়। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে লন্ডনে চলুন। থাই, সিঙ্গাপুর, এয়ার ইন্ডিয়া, জর্ডন এয়ারলাইন্স, কত, কত। এসব প্লেনে উঠে বিদেশে যাওয়ার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তারপরেই মনে পড়ল টাকাটার কথা। ডলারের বিনিময়ে পাওয়া টাকাটা তার কাছে এসেছে নিতান্ত আকস্মিকভাবে। ওটা আসার কথাই ছিল না। ওই টাকায় কোথাও যাওয়া-আসার টিকিট পাওয়া যায়?

লোকটি কাছে এল, 'আসুন।'

একটা দরজা খুলে ধরল লোকটা, ভেতরে ঢুকল সপ্তম। কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে আছে মাধবিকা। আজ ওর পরনে জিনস আর শার্ট। না তাকিয়েই বলল, 'বসো।'

টেবিল জুড়ে অনেক ফোন। কাগজপত্র। এপাশে বসল সপ্তম। বসে বলল, 'কাজের সময় এসে বোধহয় বিরক্ত করলাম। আসলে এদিকে এসেছিলাম—।'

বেশ দ্রুত হেঁটে এসে চেয়ারে বসল মাধবিকা, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে চুরির দায়ে ধরা পড়েছ।' বলতে না বলতেই ফোন বাজল। রিসিভার তুলল মাধবিকা, 'ইয়া—?' কোথায় কোন প্যাসেঞ্জারের কী সমস্যা হয়েছে, তা নোট করে নিল সে। সেটা রাখতে না রাখতেই আবার ফোন। পাক্কা দশ মিনিট ধরে শুধু একটার পর একটা ফোনে কথা বলে গেল মাধবিকা। শেষ পর্যন্ত বলল, 'ওরা কী করে জানতে পারল যে তুমি এই ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছ! '

'তার মানে?'

'এত ফোন কখনও আসে না। আজ তো আসেইনি।' ঘড়ি দেখল মাধবিকা। 'বাঃ। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেল! চল, কোথাও গিয়ে কিছু খাই।' বলা মাত্র আবার টেলিফোন। এবার একটু যেন সতর্ক মাধবিকা, 'সিওর। আমি এখনই যাচ্ছি। ওকে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মাধবিকা উঠে দাঁড়াল, 'হাতে সময় আছে?'

'অঢেল। কেন?'

'এয়ারপোর্টে যেতে হবে। বসের হুকুম। আমার সঙ্গে চল। ওখানকার রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা মারা যাবে।' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ইন্টারকমে নির্দেশ দিল গাড়ি তৈরি রাখতে। তারপর ব্যাগের স্ট্র্যাপ কাঁধে ঝুলিয়ে মাথা নাড়ল।

অগত্যা সঙ্গী হল সপ্তম।

গাড়িটা অফিসের। উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনের সিটে খানিকটা দূরত্ব রেখে বসে সপ্তম বলল, 'তোমাদের অফিসে ঢুকে মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা খুব ছোট, যেখানে ইচ্ছে চট করে চলে যাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ, পৃথিবীটা এখন সত্যি ছোট হয়ে গিয়েছে, নইলে তোমার সঙ্গে দেখা হয়?'

'সত্যি। এরকম দুর্ঘটনা ঘটে বলেই জীবন স্থির হয়ে যায় না।' সপ্তম দেখল গাড়ি এখন চার নম্বর ব্রিজ দিয়ে বাইপাসে ঢুকছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন এই কাজ করছ?'

'বহুদিন।'

'বাইরে গিয়েছ?'

'যেতেই হয়। মাঝে মাঝে টিম নিয়ে বিদেশে যাওয়া চাকরির অঙ্গ।'

'কী মজায় আছ?'

মজা? আমি একা বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় গিয়ে যে মজা পাই, চাকরি রাখতে একগাদা ট্যুরিস্টকে নিয়ে ভেনিসে গিয়ে তার এক বিন্দুও পাই না।' মাধবিকা বলল।

'ভেনিস? তুমি ভেনিসে গিয়েছ?'

'পৃথিবীটাকে মোটামুটি দেখে ফেলেছি। ছাড় এসব কথা। বিয়ে করোনি কেন?'

'যেসব মহিলাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে চাই, তাঁদের কাছে পৌঁছতে যে রোজগারের প্রয়োজন তা আমার নেই।' সপ্তম বলল।

'কোন সব মহিলা?

'এই যেমন ধর, তোমার মত।'

'বাজে বকো না।' মুখ ঘোরাল মাধবিকা রাস্তার দিকে।

'খুব সত্যি কথা বললাম।'

'বেশ, তাহলে কলেজে আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে না কেন? তখন তোমার মনে আমার জন্যে বিন্দুমাত্র ভাললাগা ছিল না। তাহলে?'

'আসলে তখন তোমার চারপাশে যাদের ভিড় হত, তাদের বাবার অঢেল পয়সা ছিল প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া অনিবার্য ছিল বলে এগোইনি। সপ্তম হাসল।

কিছুক্ষণ কথা বলল না মাধবিকা।

সময়টা বেশি বেড়ে যাচ্ছে দেখে সপ্তম বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও। সেদিন তুমি বিয়ের প্রসঙ্গে বললে, করেছিলাম। মানে কী?'

'বিয়ে করেছিলাম। টিকল না।'

'ওঃ।'

'বাবা। তুমি এমন ভাবে ওঃ বললে, যেন ভয়ঙ্কর কিছু শুনলে!'

'বিয়ে ভেঙে যাওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার নয়।'

'কে বলেছে? বিবাহিত জীবন যখন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, তখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার মত আনন্দ আর কী আছে?' মাধবিকা তাকাল।

'ও।'

'তোমার কেয়াকে মনে আছে? খুব কোঁচকানো চুল ছিল?'

'হ্যাঁ। বড় টিপ পরত। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল না।'

'কলেজে আলাপ না থাকলেও পরে দেখা হলে ঠিক কথা বেরিয়ে আসে। এই তোমার সঙ্গেই বা আমার কতটুকু আলাপ ছিল? কেয়া নেই।'

'নেই মানে?'

'আত্মহত্যা করেছে গর্দভটা। প্রেম করে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর ভুল বুঝতে পারল। তখন অ্যাডজাস্টমেন্টের চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের রাস্তায় না গিয়ে নিজেকে মেরে ফেলল।' মাধবিকা বলতে বলতে সোজা হয়ে বসল, 'ও কেন ডিভোর্স চায়নি জানো? নিজে বিয়ে করে আবার বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, এই লজ্জায়।'

গাড়ি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছিল। সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখন কোথায় থাক?'

'কেন? আমার বাড়িতে। বাবা চলে গিয়েছেন বছর পাঁচেক হল। আমার ডিভোর্সের আগেই। এখন মা আর আমি। ডোভার লেনের অতবড় বাড়িটা বিক্রি করে দেব ভাবছি।'

'কেন?'

'তার চেয়ে একটা ভাল ফ্ল্যাট কিনে থাকা অনেক ভাল। তুমি কী করছ?

উত্তরটা দেওয়ার আগেই এয়ারপোর্ট চত্বরে গাড়ি ঢুকে গেল। গাড়িতে বসে কথা বলার অবকাশ নেই। মাধবিকার সঙ্গে সপ্তম নেমে পড়তেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পার্কিং লটে চলে গেল। সপ্তম দেখল মাধবিকা সোজা একটা কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে ফিরে এল। 'তুমি ঢুকে পড়। দোতলায় রেস্টুরেন্ট। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যে চলে আসছি।'

সপ্তম কিছু বলার আগেই এক ভদ্রলোক হেসে এগিয়ে আসতে মাধবিকা তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। অগত্যা টিকিট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকল সপ্তম। ডোমেস্টিক ফ্লাইটের প্লেনগুলো এখান থেকে ছাড়ে। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে. বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদের যাত্রীদের

এখনই সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য যেতে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গায় দুই-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে চলে যাওয়া যায়। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল মাধবিকা নেই। সে এই এয়ারপোর্টে ঢোকেনি।

দোতলায় সুন্দর সাজানো রেস্টুরেন্টে বসে সপ্তমের হঠাৎ মনে হল, যদি মাধবিকা না আসে। হয়ত কাজে আটকে গেল। সে তো অনন্তকাল এখানে বসে থাকতে পারে না। রেস্টুরেন্টের যা আবহাওয়া, তা পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টগুলোর থেকেও ভাল। অর্থাৎ দাম কম হবে না। পকেটে যা টাকা আছে, তাকে বড়জোর এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে। মেনুকার্ড না দেখেই সে চায়ের অর্ডার দিল।

নরম আলো, মৃদু বাজনা বাজছে। উল্টোদিকের টেবিলে একটা লোক সমানে কথা বলে যাচ্ছে মোবাইলে। মাঝে মাঝে নিজের মনে ঘাড় নাড়ছে। এই সময় আর একজন লোক ওই টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে লোকটা বেশ সম্ভ্রম দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল। সপ্তম বুঝতে পারল লোকটা একা আসেনি! ওর খানিকটা দূরত্বে দুজন ঢুকেছিল এবং তারা ওপাশের টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বললেও মাঝেমাঝে চারপাশে তাকিয়ে নিচ্ছে। যে লোকটা মোবাইলে কথা বলছিল, সে ততক্ষণে মোবাইল অফ করেছে। আগন্তুক বসার পর সে বসল।

আগন্তুক হিন্দিতে বলল, 'আপনি আগেই এসে গেছেন।'

'হ্যাঁ, একটু আগে। বলুন, কী খাবেন?'

'নাথিং। লিস্টটা এনেছেন?'

'হ্যাঁ'। ব্রিফকেস খুলে একটা কাগজ বের করে দিল প্রথম লোকটা। চোখ বোলাল আগন্তুক। 'এগারজন।'

'হ্যাঁ, এই এগারজনই ভি আই পি-র দুপাশ কন্ট্রোল করে।'

'এই এগারজনের সঙ্গে কথা বলুন।'

'একটু মুশকিল হয়ে যাবে জানি সাহেব।'

'কীসের মুশকিল?'

'এরা সুভাষদার কন্ট্রোলে।'

'তো?'

'সুভাষদা আমাকে শেষ করে দেবে।'

'আপনি সুভাষদার সঙ্গে আমার একটা মিটিং ফিক্স-আপ করুন।'

প্রথম লোকটা একটু চিন্তা করল, 'তা হয়ত পারি।'

'হয়ত না। পারতেই হবে। আপনারা কেউ জানেন না, আমার পেছনে কে আছে। দুদিন আগের আমি একা যা করার করেছি। এখন আমি একজনের রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

'কার?'

'বেশি কথা বলছেন! আমি কালকের মধ্যে মিটিং চাই। আর হ্যাঁ, ওই যন্ত্রটা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমার লোক সময়টা জেনে নেবে।'

'একটা কথা বলতে পারি স্যার?'

'বলুন।'

'সুভাষদার সঙ্গে ক্ল্যাসে না যাওয়াই ভাল।'

'কেন? ওর পলিটিক্যাল কানেকশন ভাল বলে? ওসব দিন শেষ হয়ে গেছে অফিসার এখন ইনডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে কেউ কিছু করতে পারে না, যতই কানেকশন থাকুক এই এগারজনের মধ্যে কারও মনে সুভাষবাবুর সম্পর্কে রাগ আছে?

'থাকতেই পারে। মুখে বলে না।'

লোকটা আর বসল না। হঠাৎই উঠে চলে গেল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অন টেবিলে বসে থাকা লোক দুটো ওকে অনুসরণ করল। মোবাইল ধরে থাকা লোকটা চো বন্ধ করল। তারপর উঠে পড়ল।

চা এসে গেল। কিন্তু ধাতস্থ হতে সময় লাগল সপ্তমের। ভি আই পি রোডের দুপাশে দখলদার মানে প্রমোটর? এগারজন প্রমোটর আছে? তাদের কন্ট্রোল করেন সুভাষদা ঠিকই তো। রাসেল নিশ্চয়ই তাদের একজন। এই লোকটা ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় শেষ পর্যন্ত সুভাষদার সঙ্গে মিটিং করতে চাইল। লোকটা কে? অফিসার যাকে বলা হল সে একবার জনি সাহেব বলে ডেকেছিল।

সোজা হয়ে বসল সপ্তম। জনি। রশিদ যে কাগজটা নিয়ে গিয়েছে, তার প্রথম না ছিল জনি। এই জনির ব্যাপারেই সুভাষদা রাসেলকে ফোন করে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এই লোকটাই সেই জনি? দেখে বেশ শিক্ষিত সভ্য বলে মনে হয়। এত বড় একটা তথ পাওয়া গেল, অথচ সে কিছুই করতে পারছে না। কাকে বলা যায়? সুভাষদাকে সতব করার কোনও মানে হয় না। উল্টে উনি তাকে সন্দেহ করবেন। রাসেল, রাসেলকে বল দরকার।

এই সময় মাধবিকাকে দেখতে পেল সে। হেঁটে আসছে। হাঁটার ধরনেই বোঝা যা নিজেকে সুন্দরী প্রমাণ করতে সে সচেষ্ট।

'কী ব্যাপার? চা নিয়ে বসে আছ, শুরু করোনি?'

'তোমার জন্যে বসে আছি।'

'আমি তো চা খাই না।' হাসল মাধবিকা,-'দূর! আমি কোথায় ভাবলাম তুমি বিয়া নিয়ে বসে আছে, শেয়ার করা যাবে।'

'তুমি মদ খাও?'

'বিয়ারকে তুমি এখনও মদ বল বুঝি।' সজোরে হেসে উঠল মাধবিকা। তারপ বেয়ারাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিল, 'খুব খিদে পেয়ে গেছে।'

'কাজ হল?'

'আর বলো না, দশ ভরি সোনার বিস্কুট নিয়ে এসেছে, ডিক্লেয়ার করেনি, ছেড়ে দা এসব কথা। তুমি কী করছ?'

'শেয়ার কেনা-বেচার দালালি।'

'ইন্টারেস্টিং। কীরকম থাকে?'

'হিসেব করিনি। মাধবিকা, চল্লিশ হাজার টাকায় পৃথিবীর কোথায় যাওয়া যায় ব তো? যাওয়া-আসার টিকিট চাই? হবে?' সপ্তম কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল।

মাধবিকা যে খাবারের অর্ডার দিয়েছিল তা পরিমাণে যেমন কম নয় তেমনি স্বাদ এব দামেও মাত্রাছাড়া।

খেতে খেতে মাধবিকা জানাল, 'তুমি এখন আমার গেস্ট।'

'তার মানে?'

'বাঃ তোমাকে আমি এয়ারপোর্টে নিয়ে এসেছি, তুমি তো আমার অতিথি।'

হঠাৎ এই কথা?'

মাধবিকা হাসল, 'অফিস আমার জন্যে একটা অ্যালাউন্স বরাদ্দ করেছে, সেটা হল গেস্ট অ্যালাউন্স। এ মাসে এখনও সেটা নেওয়া হয়নি। তোমাকে পেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম।'

'তার মানে আমি সঙ্গে না-থাকলে তুমি এ সব খেতে না?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'না। নিজের জন্যে, শুধু নিজের জন্যে অফিসের পয়সা খরচ করার অধিকার আমার নেই। খিদে পেলে পকেটের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিনে খেতাম।'

'কিন্তু আমি তোমার গেস্ট হতে পারি, অফিস মানবে কেন? আমি তো তোমার অফিসকে কোনও ব্যবসা দিতে পারছি না।' সপ্তম খেতে খেতে বলল।

'এখন পারছ না, কিন্তু হয়ত ভবিষ্যতে পারবে।'

'কি করে মনে হচ্ছে?'

'আমি বুঝতে পারি।'

'মানে?'

'তুমি অনেক ওপরে উঠবে। তোমার মুখ-চোখ বলছে যে মধ্যবিত্ত হতাশায় আটকে থাকা মানুষ তুমি নও। পরে আমার কথা মিলিয়ে দেখ।'

'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।'

মাধবিকা সোজা হয়ে বসল, 'আচ্ছা, কাউকে ধন্যবাদ জানাতে এ-কথা বলা হয় কেন বল তো? ফুল বা চন্দন খাওয়ার জিনিস নয়। মানুষ মারা গেলে মুখে চন্দন এবং ফুল তুলসীর পাতা দেওয়া হয়। ধন্যবাদ জানানোর জন্য এই মেরে ফেলার ব্যবস্থা কেন? অদ্ভুত সব ব্যাপার।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একটা কার্ডে পেমেন্ট করে মাধবিকা বেরিয়ে এল সপ্তমের সঙ্গে। এয়ারপোর্টে মাধবিকা যে বেশ পরিচিত তা বুঝতে পারছিল সপ্তম। দু-পা যেতে না-যেতেই ওকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে।

গাড়িতে উঠে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো অফিসে ফিরে যাবে?'

ঘড়ি দেখল মাধবিকা, 'ছুটির সময় হয়ে যাবে যেতে-যেতে। তবু যেতে হবে। মোবাইলে বলতে পারতাম কিন্তু কাগজপত্র সব ছড়িয়ে রেখে এসেছি।'

'তাহলে আমাকে ভি আই পি রোডে নামিয়ে দাও।'

'ভি আই পি রোডে?

'হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'এটা কখন ভাবলে?'

'মানে?'

'আমার সঙ্গে এয়ারপোর্ট না-এলে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসতে না।'

'না। তা এসে গেছি যখন, তাছাড়া, তুমিও তো অফিসে ফিরে যাবে।'

বেশ, কোথায় নামাব বল।'

'হলদিরামের দোকানের সামনে।'

ড্রাইভারকে নির্দেশ জানিয়ে দিয়ে মাধবিকা বলল, 'আবার কবে দর্শন পাব?'

'তোমার অফিসে? ওর বাবা। ওখানে তুমি খুব ব্যস্ত থাক।' সপ্তম হাসল।

'হ্যাঁ। তা ঠিক। বাড়িতে আসতে বলতে পারতাম, কিন্তু বলছি না।'

'কারণ?'

হাসল মাধবিকা, 'আমার ডিভোর্সের পর মায়ের চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তা হল, আমার কী হবে? ডিভোর্সি মেয়েকে তো সম্বন্ধ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায় না। অতএব আমি যদি কারও প্রেমে পড়ি তাহলে উনি খুব খুশি হন। এর আগে দু-একজন বন্ধু স্রেফ ভদ্রতার জন্যে বাড়িতে গিয়েছিল, মা তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কল্পনা করে ফেললেন।'

'তা মায়েব কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করলে না কেন?'

'পাগল। প্রত্যেকের বাড়িতে সুন্দরী বউ আছে। তাছাড়া আমি তো বিয়েব জন্যে হাঁ করে বসে নেই। তাই তোমাকে নিয়ে গেলে যে সমস্যা মা তৈরি করবে সেটা আমি চাই না।'

গাড়িটা রাস্তার বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে যেতে সপ্তম হলদিরামের দোকানটাকে দেখতে পেল

মাধবিকা বলল, 'আমার কার্ডটা যদি থাকে তাহলে ইচ্ছে হলে ফোন। ছুটির পর ব ছুটির দিনে না হয় কোথায় বসা যাবে।'

গাড়ির দরজা খুলে সপ্তম বলল, 'আমাকে খুব সস্তায় টিকিট করিয়ে দিও।'

'ওটা পরের দিনের এজেন্ডায় থাক।' হাসল মাধবিকা।

গাড়িটা চলে গেলে সে রাস্তা পেরিয়ে এল। রাসেলের সঙ্গে তার এখানেই দেখা হয়েছিল। মাধবিকার গাড়িতে বসার আগেই তার মনে হয়েছিল রাসেলের সঙ্গে দেখা করা দরকার। যে বিরাট জাল চারপাশে ছড়ানো হচ্ছে তা ওকে জানানো প্রয়োজন। যে রাস্তা দিয়ে রাসেল তাকে ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেটা চিনতে অসুবিধে হল না। কিন্তু গিয়ে দেখল নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় তালা দেওয়া। তখন খেয়াল হল, এই বাড়ি অথবা বাড়িগুলো রাসেল তৈরি করেছে কিন্তু তার তো এখানে থাকার কথা নয়। ওকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে তা-ও তার জানা নেই। দূর। এভাবে হুট করে ভাবামাত্র মাধবিকার গাড়ি থেকে নেমে পড়া উচিত ছিল না।

'কী চান বাবু?'

সপ্তম দেখল একটা মিস্ত্রি গোছের চেহারার লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'রাসেলবাবু?'

'ও, আপনি তো সাহেবের সঙ্গে এসেছিলেন ফ্ল্যাট দেখতে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সাহেব তো এখানে থাকেন না।'

'কোথায় থাকেন?'

'লেকটাউনে। তবে এখন সাইটে পাবেন।'

'সাইটে মানে?'

'বাঙুরে ঢুকেই খালের পাশ দিয়ে কিছুটা গেলে দেখবেন নতুন কনস্ট্র্যাকসন হচ্ছে,

:খানে সাহেব বিকেলবেলায় যাবেন বলে জানি।' লোকটা চোখ ছোট করল, 'আপনার ্যাটের দরকার?'

'না।'

বেশ জোরে জোরে পা ফেলে ভি আই পি রোডে চলে এল সপ্তম। তারপর হঠাৎ াড়িয়ে পড়ল। এসব সে কী ভাবছে? পুরো ব্যাপারটা নিয়ে সে নতুন করে চিন্তা করল। ্যাক্সিতে একটা পার্স সে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তার মধ্যে ডলার ছিল। পার্সটা যার সে এখন জলে। তার লোকজন এসে ওটা ফেরত নিয়ে গিয়েছে এবং নেওয়ার সময় দয়াপরবশত াকে মোটা টাকা উপহার দিয়েছে। ব্যস, ব্যাপারটা এখানে শেষ। ওই লোকগুলো অ্যান্টি সাস্যাল, ওদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাখার কথা নয়, উচিতও নয়। অত্যন্ত নির্বাধের মত স ব্যাগটার কথা সুভাষদাকে জানাতে গিয়েছিল। সেই সমস্যারও সমাধান সে করেছিল ়করকমভাবে। যার ব্যাগ সে নিয়ে গিয়েছে বলে চুকিয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা। দুবাইয়ের কান ক্ষমতাবান লোক কলকাতায় রাজত্ব বিস্তার করতে চাইছে—তাতে তা কী দরকার? ভাষদার সঙ্গে তাদের সংঘাত হলে সেটার মোকাবিলা সুভাষদা তার মত করেই করবেন। ়তকাল নিশ্চয়ই তিনি সপ্তমের ওপর নির্ভর করেননি। তাছাড়া সুভাষদার ওপরতলায় ় যোগাযোগ থাক না কেন, মূল কাজটা তিনি অন্ধকারে করে থাকেন তাতে তো কোনও নেই। অর্থাৎ সেই অর্থে ধরলে সুভাষদাও অ্যান্টিসোস্যাল। তার এই সুভাষদার ়ই রাসেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। রাসেল মানুষটা হয়ত এমনিতে ভাল। কিন্তু ়মোটারি করায় অ্যান্টিসোস্যালদের হালচালের খবর রাখে। সুভাষদার মুখোমুখি হতে ায় না অথচ তাঁকে এড়িয়ে যেতে চায়। ওর সঙ্গে তার তো কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত য়। অতএব এইসব হাঙ্গামায় জড়ানোর কী দরকার? সে যেটা করছিল, অর্থাৎ জ্যোতি ়ত্তের সঙ্গে থেকে শেয়ার কেনাবেচার ব্যবসা কবা, সেটাই তো করা উচিত। আগামীকাল ়সেস সামতানির কাছে গিয়ে কোনওমতে যদি তাকে রাজি করাতে পারে তাহলে ়রাজগার তো খারাপ হবে না।

সপ্তম হাসল। ব্যাপারটা মাথায় আসেনি কেন? রশিদ তাকে যে টাকা দিয়েছে তা দিয়ে স নিজেই তো শেয়ার কিনতে পারে। ক্লিওক্লিনের শেয়ার তো এখন পঁচিশ টাকায় যাচ্ছে, াসখানেক আগেও ছিল উনিশ টাকা। তার কাছে যে টাকা আছে তাতে ষোলশো শেয়ার ়য়ে যাবে। মাসখানেক বাদে যদি ওটা আঠাশ টাকাও হয় তাহলে সাড়ে চার হাজারের ওপর প্রফিট। গল্প শুনেছে দশ টাকার শেয়ার কিনে তালেগোলে শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ াটশ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। না, অতটা লোভ সে করবে না। কিনবে আর বিক্রি । কোনওরকম ঝুঁকি নেবে না। মাসে দশ হাজার রোজগার হলেই তার আর কোন নেই। সঙ্গে তো দালালি রইল। দালালি শব্দটাকে খুব খারাপ লাগে সপ্তমের। এজেন্ট ়বু খারাপ নয়!

তাহলে এটাই ফাইনাল হয়ে গেল। মনে-মনে বলল সপ্তম।

রাড়িতে আসামাত্র মা জানাল, সুভাষদা দুবার ফোন করেছিলেন। শোনামাত্র মনটা ততো হয়ে গেল। সুভাষদার আবার কী দরকার? ইচ্ছে হল, এখনই টেলিফোন করে ়ুভাষদাকে বলে দিতে, আপনি আমার তেমন কোনও উপকার করেননি যে আমি াপনার চামচাগিরি করব। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি নিজে যা পারি তাই করব। াপনার সাহায্যের আর দরকার নেই। তাই দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না।

মনে-মনে বললেও নিজের কাছেই একটু কড়া লাগল কথাগুলো। আরও নরম করে বলা উচিত। আর তখনই খেয়াল হল, সুভাষদার লোক তাকে অনুসরণ করেছিল অনুসরণ করে রশিদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। রশিদের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিল সুভাষদা। সেটা না বললে তাকে কি নিষ্কৃতি দেবে? যদিও ওর লোক দেখে গিয়েছে রশি তখন ছিল না কিন্তু পরে আবার গেল না কেন এই বলে কৈফিয়ত চাইতে পারে।

অর্থাৎ সে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেও সুভাষদা তাকে সহজে ছাড়বে না। নিজের বারোটা সে নিজেই বাজিয়েছে। নিজেকে গালাগাল দিচ্ছিল সপ্তম। কী দরকার ছিল আগবাড়িয়ে নাক গলাতে? এখন ছেড়ে দাও কেঁদে বাঁচি বললেও নিস্তার পাওয়া মুশকিল মা আবার ঘরে এল, 'কী হয়েছে রে?'

'কিছু না।'

'তুই সত্যি বলছিস না। ক'দিন ধরে দেখছি অদ্ভুত অদ্ভুত লোক বাড়িতে আসছে। কই এদের তো কখনও দেখিনি। তুই কি কোনও অন্যায় করেছিস?'

'না। কেন?'

'না করলেই ভাল। শোন, আমি বলি কী, তুই একবার ছোটমাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। ছোটমেসোর এখনও ক্ষমতা আছে। একটা কিছু হিল্লে করে দিতে পারেন।'

'কাউকে আমার হিল্লে করতে হবে না। যা করার আমিই করব।' সপ্তমের কথা শেষ হতেই মা চলে গেল। মুখ শক্ত করে রিসিভারের বোতাম টিপল সপ্তম।

যে লোকটি টেলিফোন ধরল তার গলা আজ প্রথম শুনল সপ্তম।

'সুভাষদা আছেন?'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি সপ্তম।'

'না। উনি বাড়িতে নেই।'

'ওর মোবাইলের নাম্বারটা বলবেন।'

'উনি নিজে ছাড়া অন্য কারও দেওয়া নিষেধ।' লাইন কেটে দিল লোকটা। যাক গে এটা ভাল হল। সুভাষদা ফিরে এলে জানতে পারবেন সে ফোন করেছিল।

সন্ধে হয়ে এল। সপ্তম ঠিক করল সে আজ বাড়ি থেকে বের হবে না। চা খাওয়ার পর সে নিজের ঘরের টেবিলে বসে সকালের কাগজে ছাপা শেয়ারের দরগুলো লক্ষ করছিল। ক্লিওক্লিনের শেযার কাল ছিল পঁচিশ টাকা। নিয়ারেন্স-এর দাম বেশ কমে গেছে গত সপ্তাহে ছিল আটান্ন, আজ বাহান্ন। শেয়ার কেনার সময় কপালে একটি তৃতীয় নয়ন থাকা দরকার। কোন শেয়ারের দাম কমবে বাড়বে তারা আগাম হিসেব অনেকেই করতে পারে। কোম্পানিতে গোলমাল হচ্ছে খবরটা পেলেই বিক্রি করে দিতে হয় শেয়ার যাতে অবধারিত পতন থেকে রক্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও আন্তর্জাতিক ঘটনা যা ঘটায় পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর চাপ পড়ে তার কারণে শেয়ারের দাম হু হু করে পড়ে যায়। সেটার আন্দাজ আগাম কোনও পণ্ডিতও করতে পারবে না। এই যেমন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পর হয়েছে। আচ্ছা, বিন লাদেন যদি খবরটা কাউকে দিত, দিয়ে বলত আমি ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করতে যাচ্ছি তুমি যা করার করে নাও, তাহলে হাজার হাজার কোটি টাকার শেয়ার সকাল নটার মধ্যেই বিক্রি হয়ে যেত।

সপ্তম কাগজটা রাখল। মাধবিকার কার্ড টেবিলের ওপর পড়ে আছে। অফিস এবং াড়ির নাম্বার দেখল সে। এখন নিশ্চয়ই অফিস ছাড়েনি সে। তবু বাড়িতে টেলিফোন রল সপ্তম। টেলিফোন বাজছে। তারপর একজন বয়স্কা মহিলার গলা শুনল সে, হ্যালো।'

'মাধবিকা ফিরেছে?' জিজ্ঞাসা করল সপ্তম।

'না। কে বলছেন?' মহিলা বেশ নিরাসক্ত।

'আমার নাম সপ্তম। আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

'তাই বুঝি!'

'আপনি কি মাসিমা?'

'আমি মাধবিকার মা।'

'আপনাকে একবার কলেজে দেখেছিলাম। ওকে বলবেন আমি ফোন করেছিলাম।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সপ্তম। তার মুখে মাসিমা সম্বোধন ভদ্রমহিলা বোধহয় মেনে বতে পারলেন না। বাড়িতে ফিরে মাধবিকা খুব অবাক হয়ে যাবে।

জ্যোতি দত্তকে টেলিফোন করল সে, 'জ্যোতিদা, কোনও খবর আছে?'

'নাঃ। কোথায় তুমি?'

'বাড়িতে। আচ্ছা, ক্লিওক্লিনের শেয়ার কি আরও উঠবে?'

'কেন? খদ্দের আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কত কিনবে?'

'পঁচিশ করে যাচ্ছে, ধরুন ষোলশো।'

'আঃ সপ্তম। ছুঁচোর পেছনে ছুটছ কেন? অত অল্প টাকার শেয়ারে যে খাটনি পোষায় া তা তোমাকে অনেকবার বলেছি। ছুঁচো ছেড়ে হাতি গণ্ডার ধরার চেষ্টা কর, নইলে এ াইন থেকে সরে গিয়ে অন্য কিছু কর।' জ্যোতি দত্ত টেলিফোন রেখে দিলেন।

অন্য কিছু কর। যেন হাতের মোয়া। বললেই করা যায়।

মায়ের কথা মনে পড়ল। ছোটমাসির কাছে যেতে বলছে। ছোটমেসো মুম্বাইতে বড় কাম্পানিতে আছেন। হয়ত এতদিনে এম ডি হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক ইচ্ছে করলে চাকরি দতে পারেন। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা তাঁর এতকাল হয়নি কেন? তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে ার স্ত্রীর দিদির ছেলে বেকার। শিক্ষিত বেকার। নিজে থেকেই তো কাছে ডাকা উচিত
।

তাছাড়া চাকরি করতে হবে তো যেতে হলে মুম্বাই। মাকে একা রেখে যেতে হবে। যাক তাকে আট হাজার টাকা মাইনের চাকরি জোগাড় করে দিলেন ছোটমেসো। সে মাসির বাড়িতে বডি ফেলবে না। সাত-দশ দিন ঠিক আছে, পার্মানেন্টলি থাকা খতেও তো খারাপ লাগে। অতএব মেস বা ঘর জোগাড় করতে হবে। মুম্বাইতে নিসের যা দাম তাতে সব খরচ করার পর আট হাজারের কয় পয়সা সে জমাতে ারবে? মাকে পাঠাতে পারবে? হ্যাঁ, একথা ঠিক, বাবা যা রেখে গেছেন তাতে মায়ের ানওদিন অর্থাভাব হবে না। এখানে সে টুকটাক যা রোজগার করেছে তা মাকে দিতে

চাইলেও মা নেয়নি। বাড়িটাও নিজেদের। কলকাতায় যদি পাঁচ হাজারও রোজগার হ তার পুরোটাই তো বেঁচে যাচ্ছে। গাড়িভাড়া ইত্যাদি ছাড়া তো কোনও খরচ নেই।

টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলল সপ্তম, 'হ্যাঁলো।'

'সপ্তম?' মাধবিকার গলা।

'বলছি।'

'তুমি ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী ব্যাপার? বাড়িতে ফিরেই শুনলাম।'

'এমনি।'

'যাকগে। আমি ভাবলাম, দারুণ কোনও খবর শোনাবে।'

'যেমন?'

'এই যেমন, তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এইসব।'

'দূর। আমার ওসব আসে না।'

'বুঝলাম। তবু ফোনের জন্যে ধন্যবাদ।'

'শোন, এখান থেকে দুবাইয়ের প্লেন ভাড়া কত?'

'দুবাই? হঠাৎ দুবাই কেন?'

'একটু বিদেশে যাব বলে ভাবছি।'

'আমেরিকায় যেতে বলব না, ওখানে এখন প্রচুর বেকার। তুমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাও। হাজার তিরিশের মধ্যে হয়ে যাবে।' হাঁটাহাঁটি করলে চাকরি পেয়ে যাবে

'বলছ?'

'ওহো, শোন। বুড়িদের সামলাতে পারবে।'

'বুড়ি?'

'হ্যাঁ চারজনের একটা দল আসছে প্যারিস থেকে। তাদের নর্থ বেঙ্গল ঘুরিয়ে আনতে হবে। আমাদের এখানে প্রফেশনাল লোক আছে তবু কাজটা তোমাকে দিতে পারি। ভাল টাকা। তবে একটু ট্রেনিং নিতে হবে তোমাকে।'

'ইন্টারেস্টিং। কাল ফোন করব।' টেলিফোন রেখে বেশ খুশি হল সপ্তম। এটা মন্দ নয়। বিনা পয়সায় বেড়ানো প্লাস রোজগার। অন্তত কিছুদিন কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রিসিভার তুলেই গলা শুনল সপ্তম। সুভাষদার গলা।

হ্যাঁ বলুন। আমি আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'লোকটার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'না। আমি গিয়েছিলাম, দেখা পাইনি।'

'তারপর?'

'আর যাওয়া হয়নি। আপনি বললে কাল যাব।'

'বিদেশে যাচ্ছ নাকি?'

'বিদেশে?' অবাক হয়ে গেল সপ্তম, 'কী যে বলেন।'

'সে কী! লোকে বিনা কারণে ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে যায় না সপ্তম।'

'ও। আসলে ওই অফিসে আমার এক কলেজের সহপাঠিনী চাকরি করে। যদি কোনও শেয়ার কিনতে চায়, সেলসম্যান হিসেবে সব জায়গায় তো যেতে হয় আমাদের।'

'রাসেলের সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়েছে?'

'না তো!'

'তুমি একবার এখানে এসো।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, ঠিক আছে।'

'কোথায় আসতে বলছি জিজ্ঞাসা করলে না তো!'

'আপনার বাড়িতে?'

ডনা, লেকটাউনে। ভি আই পি রোড দিয়ে ঢুকে কিছুটা এলে একটা কম্পিউটার সেন্টার দেখবে। তার ওপরে। তাড়াতাড়ি এসো।' সুভাষদা লাইন ছেড়ে দিল।

কীরকম শীত শীত করতে লাগল সপ্তমের। সুভাষদার এইভাবে ডেকে পাঠানোটা তার একটুও ভাল লাগছে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলব আছে। লোকটা তার পেছনে স্পাই লাগিয়েই রেখেছে। রশিদের বাড়িতে যাওয়ার পর সে ভেবেছিল আর কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। সেই লোকটা নিশ্চয়ই মাধবিকার গাড়ির পেছন পেছন এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছায়নি। পৌঁছতে পারলে কলকাতার বড় বড় ডিটেকটিভ এজেন্সিগুলো ওকে ডেকে চাকরি দিত।

মাধবিকার কথা মনে আসতেই আর একটা অস্বস্তি শুরু হল। আগামী কাল যদি সুভাষদার লোক মাধবিকাকে জিজ্ঞাসা করে সপ্তম কী ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিল, তাহলে মাধবিকা আর যাই বলুক শেয়ারের ব্যাপারে কোনও কথা বলবে না। ব্যস, সে মিথ্যেবাদী এটা প্রমাণিত হলে সুভাষদা যে কী ব্যবস্থা নেবেন তা সপ্তম ভাবতে পারছিল না। টেলিফোন বাজতে এবার মাধবিকা নিজেই ধরল। সপ্তম বলল, 'আবার বিরক্ত করছি। তোমার কাছে আজ কেন গিয়েছিলাম সে ব্যাপারে কেউ কৌতূহল দেখালে বলো আমি শেয়ার কেনাবেচার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিলাম।'

'তার মানে?'

'প্লিজ, যা বললাম, তাই বলো।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি কেন এসেছিলে তা নিয়ে কার কৌতূহল হবে?'

'হবে। তোমাকে বলা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু কেন হবে? তুমি কি কাউকে বলেছিলে আমার সঙ্গে ব্যবসার কথা বলতে যাচ্ছ?'

'না। টেলিফোনে তোমাকে বলতে পারছি না সব কথা। আমি জানতাম না আমাকে কেউ অনুসরণ করেছিল। প্লিজ।'

'ইন্টারেস্টিং। বেশ। কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোর।'

'রুফটপে।' মাধাবিকা বলল।

'সেটা আবার কোথায়?'

'উঃ। তুমি একটা—। লি রোড চেনো?'

'না।'

'কলকাতায় আছ কেন? হোটেল হিন্দুস্থানের পাশের যে রাস্তা এলগিন রোডের দি‍ গিয়েছে সেখানে ঢুকেই বাঁদিকে একটা মার্কেট কম্পপ্লেক্স দেখতে পাবে। নতুন হয়েছে লিফটে চেপে সোজা ওপরে চলে যাবে। ছাদে সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে। না রুফটপ।'

'আচ্ছা! কখন?'

'সাড়ে ছটায়। রাখছি।'

লেকটাউনে পৌঁছতে রাত আটটা বেজে গেল। বাড়িটা খুঁজে পেল সপ্তম। বাড়ি‍ সামনে তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আব তার একটা যে রাসেলের ভ্যান তা সে বুঝতে পারল নিচের কম্পিউটাব কেন্দ্র পুবোদমে চলছে। পাশের গেট খুলতেই দুজন লোক এগিয়ে এল 'কাকে চাই?'

'সুভাষদা আসতে বলেছেন?'

'নাম?'

'সপ্তম চ্যাটার্জি।'

দ্বিতীয় লোকটা মাথা নাড়ল, 'ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যান।'

সপ্তমেব মনে হল এই লোকদুটো মোটেই দারোয়ান গোছের দেখতে নয়। দেখলে‍ বোঝা যায় পুলিসি ট্রেনিং নেওয়া আছে।

দোতলাতেও আর এক দফা ইন্টারভিউ দিতে হল। তারপব একটা হলঘরে সুভাষদা‍ সামনে সে পৌঁছল। সুভাষদা একা ছিলেন না। রাসেল এবং আরও দুই ভদ্রলোক সেখানে বসে। আড়চোখে সপ্তম দেখতে পেল রাসেলেব মুখ গম্ভীর।

'বসো।' সুভাষদা আদেশ করলেন।

সপ্তম বসল। সুভাষদা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

'সপ্তম, তুমি যখন প্রথম এসেছিলে তখন তোমাকে আমি নিরীহ নিম্নবিত্ত বঙ্গসন্তা‍ হিসেবে ভেবে নিয়েছিলাম। চাকরি করতে নিষেধ করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী তোমার সম্পর্কে আমার মনে একটু দুর্বলতা এসেছিল।' সুভাষদা খুব শান্ত গলা‍ বলছিলেন।

অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। সপ্তম দেখল, বাকি লোক দুজন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি এখনও ভাবতে চাই না আমার অ্যাসেসমেন্ট ভুল হয়েছিল।'

'না মানে—।'

'তোমাকে কথা বলতে আমি বলিনি।' সুভাষদার গলার স্বর বদলাল, 'ওই ডলার-ভর্তি পার্স কি তোমার কাছে এখনও আছে? তুমি কি ওদের সঙ্গে দরাদরি করছ?'

'না। বিশ্বাস করুন, ওরা নিয়ে গেছে।'

'ওরা নিয়ে যাওয়ার আগে ওটা আমাকে দিলে না কেন?'

'কী কবব, আমি সুযোগ পাইনি।'

'ওরা শুধু শুধু নিয়ে গেল? তোমাকে কিছু দেয়নি?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'কত?'

'আটশো ডলার। মানে ডলার না দিয়ে ওটা ভারতীয় মুদ্রায় যা হয় তাই দিয়েছে।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা পাগল? অত টাকা কেউ কাউকে বিনা কারণে বখশিস দিয়েছে বলে কখনও শুনেছ?' সুভাষদা জিজ্ঞাসা করলেন।

চুপ করে রইল সপ্তম। কী বলবে সে!

'অত টাকা তোমাকে কেন দিয়েছে?'

'পার্সটা ফেরত দিয়েছি বলে।'

'পার্সে আর কী কী ছিল?'

'আমি দেখিনি।'

'ন্যাকামি কোর না। কত ডলার তুমি সরিয়েছ ওখান থেকে?'

'এ কী বলছেন আপনি?'

'যার ডলার সে জানে কত ছিল। যারা নিয়ে গেলে, তোমার কথা সত্যি হবে অবশ্য, তাদের জানার কথা নয়। অতএব তুমি ওখানে যা ছিল তা থেকে হাজাব দুয়েক স্বচ্ছন্দে সরিয়ে রাখতে পার। সপ্তম, এটা না করাই অস্বাভাবিক।'

'তা হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমি স্বাভাবিক কাজটা করিনি।'

সপ্তমের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে অবাক হয়ে তাকালেন সুভাষদা, 'ভাল। তোমার মত হাফবেকার বাঙালি ছেলে ট্রাভেল এজেন্সিতে যাচ্ছে, ভাল ভাল।'

এই সময় দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'আপনি কি জানেন পার্সটা কার?'

'না।'

'একজন আন্তর্জাতিক মাফিয়ার অন্যতম এজেন্টের। গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহ, ওর কাছে হাজার দশেক ইউ এস ডলার ছিল। লোকটি খুব গম্ভীর গলায় বলল।

'দশ হাজার ডলার যদি একশো ডলারে হল তাহলে তা ওই পার্সে ঢোকানো কি সম্ভব?' সপ্তম খুব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'একশো কেন ভাবলেন? পাঁচশো, হাজারের নোটও হতে পারে।'

'হাজার ডলারের নোট কলকাতায় ভাঙানো যায়?'

'আপনি জানেন না?'

'আমি কী করে জানব? অবাক হল সপ্তম।

সুভাষদা বললেন, 'সপ্তম, আমি এখনও তোমাকে সাহায্য করতে চাই। একজন বিদেশির ব্যাগে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ করা এক ধরনের অপরাধ, আর একজন আন্তর্জাতিক মাফিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করা আর এক ধরনের অপরাধ। বোধহয় দ্বিতীয়টা আরও মারাত্মক। এই কারণে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। যে আইনে গ্রেপ্তার করা হবে তাতে ছাড়া পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমি চাই না ওই পর্যন্ত ব্যাপারটা যাক।'

মেরুদণ্ডে যেন বরফের ছোঁয়া লাগল।

এতক্ষণ রাসেল চুপচাপ বসেছিল। এবার কথা বলল, 'সপ্তমবাবু যখন বলছেন ব্যাগটা কার তা তিনি জানতেন না এবং কোনও ডলার সরাননি, তখন কথাটাকে সত্যি ভাবলে ক্ষতি কী!'

'কোন ও ক্ষতি নেই। কিন্তু সপ্তম সত্যিকথা বলছে না।' সুভাষদা বললেন।

'আপনি কী শুনতে চাইছেন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার কাছ থেকে পার্সটা পাওয়ার পর থেকেই রশিদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। সে টনির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। টনি যে হঠাৎ একটা উত্তেজিত হয়েছে তা ওই ঘটনার পরেই। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে পার্সে ডলার ছাড়া আরও কিছু ছিল।'

'হ্যাঁ, একটা কাগজ ছিল।' সপ্তম বলল।

'তাই বল। কথাটা এতক্ষণ চেপে না রাখলে আমরা সময় বাঁচাতে পারতাম। হ্যাঁ—।'

'খুব পাতলা একটা কাগজে চারটে নাম লেখা ছিল যার প্রথমটা টনি।'

'গুড।'

রাসেল বলল, 'বুঝতে পারছি। কাল চীনেপাড়ায় খেতে গিয়েছিলাম। তখন একজনের কাছে শুনতে পাই কলকাতার মাস্তানদের নাকি বায়োডাটা দুবাইতে চলে গিয়েছে। সেই বায়োডাটা যাচাই করে চারজনকে কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

'হ্যাঁ, এরকম একটা গালগল্প আমার কানেও এসেছে। কলকাতা কি কারও জমিদারি? এখানে নির্বাচিত সরকার নেই? পুলিস নেই? বিদেশ থেকে কেউ আঙুল নাড়বে আর সেইমত এখানকার জীবন চলবে? পাগল হয়েছ তোমরা? কে টনি? একটা খুচরো মাস্তান! বিরক্তিতে হাত নাড়লেন সুভাষদা। যেন মাছি তাড়ালেন।

দুই ভদ্রলোকের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাকি তিনজনের নাম কী?'

সপ্তম মনে করার চেষ্টা করল। কী আশ্চর্য, কোনও নামই তার মনে আসছে না। সে রাসেলের দিকে তাকাল। রাসেল চোখ সরিয়ে নিল। অর্থাৎ সে এদের কিছু জানাতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সপ্তম বলল, 'আমি লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন মনে করতে পারছি না।'

লোকটি বলল, 'সুভাষবাবু, এ কো-অপারেট করছে না। অতএব—'

'দাঁড়ান'— সুভাষদা ওঁকে হাত তুলে থামালেন, 'সপ্তম, তুমি বুঝতেই পারছ না কী ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ।'

'আমি কোনও ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই। আর ওদের নামগুলো যদি এই মুহূর্তে আমার মনে না পড়ে তা হলে আমি কী করতে পারি? সপ্তমের হঠাৎ মনে হল মাথা নিচু করে বিনা প্রতিবাদে সব হজম করার কোনও মানে হয় না। সে বলল, 'তাছাড়া ধরুন আমি অস্বীকার করলাম, কারও মানিব্যাগ আমি কুড়িয়ে পাইনি। ডলার পাওয়ার ব্যাপারটা স্রেফ গ্যাঁজা, তা হলে কেউ প্রমাণ করতে পারবেন আমি মিথ্যে বলছি?'

'পারব। দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'যে লোকটি আপনার বাড়ি থেকে ডলার এবং পার্স এনেছে সে এখন পুলিসের হেফাজতে। তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'যে কোনও লোককে সাজিয়ে এসব বলাতে পারবেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ আপনি পাবেন কোর্টে গেলে সেটা করতে হয়ত কয়েক বছর লেগে যাবে। জীবনের শুরুতেই যদি এরকম ধাক্কা খেতে চান তা হলে অবশ্য আমাদের কিছু করার নেই।'

লোকটির দিকে তাকাল সপ্তম, 'ঠিক কী চান আপনারা?'

'বাকি তিনজনের নাম বলুন।'

'বাড়িতে না গেলে বলতে পারব না।'

'ওরা কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?'

'আমার সঙ্গে ওদের কোনও দরকার নেই যে যোগাযোগ করবে!'

'একটা দরকার তৈরি হয়েছে। রশিদের সেই লোক অ্যারেস্টেড হয়েছে, যে আপনার বাড়িতে গিয়েছিল। আপনি ধরিয়ে দিয়েছেন বলে ওদের ধারণা হতে পারে।'

'কী বলছেন?'

'যা স্বাভাবিক। আপনার বাড়ি থেকে ডলার আনছে, এটা তো সারা কলকাতার মানুষ জানতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই জানিয়েছেন।'

'কিন্তু ডলারসুদ্ধু লোকটা ধরা পড়েনি, আমি জানি।'

'কী করে জানালেন?'

'আজ যখন রশিদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন ওকে দেখেছি।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে গেল। সুভাষদা মুখ খুললেন, 'তোমার পাসপোর্ট আছে?'

'না। কেন?'

'তোমার বান্ধবীকে ফোন করলে সে বলবে যে তুমি শেয়ারের কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমার ফোন পাওয়ার পর তুমি ওকে অ্যালার্ট করে দাওনি তো?'

বিশ্বাসযোগ্য হাসি হাসার চেষ্টা করল সপ্তম, 'অদ্ভুত ব্যাপার।'

রাসেল বলল, 'সুভাষদা, আমি তাহলে উঠি?'

'একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, তোমার যেসব কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে সেগুলো দিন সাতেকের জন্যে বন্ধ রাখ। রাইট ফ্রম টুমরো।' সুভাষদা বললেন।

'সে কী? মরে যাব দাদা।' আঁতকে উঠল রাসেল।

'না বন্ধ করলে একেবারে মরে যাবে। সরকার চাইছে ভি আই পি রোডের দু'পাশে আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন ভেঙে ফেলতে। যাদের ফ্ল্যাট বিক্রি করেছ তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। তাই না?' সুভাষদা বললেন।

'এর জন্যে আমাকে কম খরচ করতে হয়নি।'

'এই লাইনে অতীতের কোনও মূল্য নেই রাসেল। সাতটা দিন তো, দেখতে দেখতে চলে যাবে। আমার কথা শোনো।'

সুভাষদার কথা শুনে রাসেলের মুখে অবস্থা এমন হল যে মায়া লাগল সপ্তমের। রাসেল তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি এটা সে বুঝতে পারছিল।

সপ্তম বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

সুভাষদা তাকালেন। কথা বললেন না।

'টনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?'

'না। আর যোগাযোগ করতে চাইলেই আমি তাকে কৃতার্থ করব, এটা ভাবলে কী করে?'

'সেটাও টনির সমস্যা।'

'তার মানে?'

টনি যে করেই হোক যোগাযোগ করবে। নিজে নয়, অন্য কাউকে দিয়ে করবে।'

'কাকে দিয়ে?'

'নাম জানি না। ওকে অফিসার বলে ডাকে।' সঙ্গে সঙ্গে রাসেল চিৎকার করে উঠল, 'মাই গড। অফিসারকে আপনি চিনলেন কী করে?'

'চিনি না, দেখেছি।'

'কোথায় দেখেছ?'

'এয়ারপোর্টে।'

'তুমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলে?'

খবরটা সুভাষদা জানেন না, বুঝতে পারল সপ্তম। মাথা নেড়ে বলল, 'একজন ক্লায়েন্ট দিল্লি চলে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে টনি এসেছিল ওই অফিসারের কাছে। অফিসার ওকে একটা লিস্ট দিল।' সপ্তম দেখল সবাই মন দিয়ে শুনছে।

'কীসের লিস্ট?'

'প্রমোটরদের। মোট ১১ জন।'

রাসেল চেঁচিয়ে উঠল, 'সপ্তম পুরো সত্যি কথা বলছে সুভাষদা।'

'তারপব?' সুভাষদা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই ১১ জনের সঙ্গে মিটিং করে তাদের আনুগত্য চাইবে টনি। কিন্তু তার আগে অফিসারকে দায়িত্ব দিয়েছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

'তুমি পুরোটা সত্যি বললে?' সুভাষদাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

'হ্যাঁ।'

প্রথম লোকটা বলল, 'অফিসারকে ডেকে পাঠান, এখনই। আপনি আর ওকে শেল্টার দেবেন না।'

মোবাইলের নাম্বার টিপলেন সুভাষদা।

এত তাড়াতাড়ি লোকটা এসে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি সপ্তম। ইতিমধ্যে চা এসেছিল। সবাই এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলছিল যার মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই। সুভাষদা চট করে নিজেকে পাল্টাতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে সঙ্গীদের পাল্টে ফেলতে সাহায্য করেন। এখন যে গলায় ভারতীয় ক্রিকেট টিম নিয়ে আলোচনা করছেন, তাতে বোঝাই যাবে না একটু আগে অতখানি উত্তেজিত হয়েছিলেন।

লোকটিকে দেখতে পেল সপ্তম, হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে। দু'হাত মাথার ওপর তুলে একগাল হেসে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। একটু আগে আপনাকে যেই ফোন করার কথা ভেবেছি অমনি আপনার ফোন গেল আমার কাছে। আগে আপনার আদেশ শোনা যাক!'

'বসুন।' সুভাষদার গলার স্বর বেশ গম্ভীর।

ভদ্রলোক বসলেন। তারপর চারপাশে তাকিয়ে রাসেলের দিকে মাথা নেড়ে পরিচিতি বোঝালেন। রাসেল কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

সুভাষদা বললেন, 'আপনার চাকরি জীবনে আমার কোনও ভূমিকা আছে?'

'একি বলছেন? আপনি না-থাকলে আমি ভিখিরি হয়ে যেতাম।'

'ভিখিরি শব্দটা মানে আপনি জানেন না। তবে নিশ্চয়ই এতদিনে সুন্দরবনের কোনও—।'

ভদ্রলোক হাত তুলল, 'জানি। কেন মুখে বলে লজ্জা দিচ্ছেন। আমার কোনও আচরণ কি আপনার খারাপ লেগেছে? যদি লেগে থাকে তাহলে বিশ্বাস করুন, অজান্তে করে ফেলেছি।'

'আপনি অত্যন্ত ধড়িবাজ, যা করেন ভেবেচিন্তেই করেন। কিন্তু আপনার মত ধড়িবাজ অফিসারদের কী করে শায়েস্তা করতে হয় সেটা আমি জানি আর একথা আপনিও ভাল করে জানেন।'

'স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আমার অপরাধ কী! তা ছাড়া যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আমাকে একটু আলাদা করে বললে সম্মান থাকে।' অফিসারের মুখ করুণ হয়ে উঠল।

'সম্মান? এই বোধ আপনার আছে নাকি? আজ এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন?'

'এয়ারপোর্ট? হ্যাঁ স্যার, সেইজন্যেই তো আপনাকে ফোন করতে চেয়েছিলাম।'

'আবার এটা কী ধরনের ছক?'

'ছক? কী বলেন। কিন্তু এসব কথাবার্তা এত গোপনীয় যে—।'

'টনির সঙ্গে আপনার কী করে যোগাযোগ হল?'

'টনি—?'

'তাকে অপনি এগারজন প্রমোটরের লিস্ট দিয়েছেন, তাই তো?'

'আপনি—।'

'ওই প্রমোটরের সঙ্গে লোকটা মিটিং করিয়ে দিতে বলেছিল আপনাকে?'

'আপনি স্যার একদম অন্তর্যামী। আমি ভেবে পাচ্ছি না এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে বসে যে কথা হয়েছে তা আপনার কানে কী করে চলে এল'? হাত তুলল অফিসার, 'দাড়ান দাঁড়ান, আমাকে বলতে দিন, হ্যাঁ, এরকম প্রস্তাব আমার কাছে এসেছিল কিন্তু আমি রাজি হইনি। আমি মুখের ওপর বলে দিয়েছি সুভাষদাকে ডিঙিয়ে আমার পক্ষে ওই মিটিং অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব নয়। তোমার যদি খুব দরকার থাকে তাহলে আগে সুভাষদার সঙ্গে মিটিং করো।' কথা বলে অফিসার সুভাষদার দিকে একটু তাকিয়ে থাকলেন, 'স্যার, এই কথাটা নিশ্চয়ই আপনার কানে এসেছে। ওর প্রস্তাবে আমি রাজি হইনি।'

'ওর সঙ্গে কী করে যোগাযোগ হল?'

'আমাকে ওর লোক ফোন করেছিল। ওর পরিচয় পাওয়ার পর মুশকিল হয়ে গেল।'

'মুশকিল কেন?'

'ধরুন আমার পাড়ায় রাজনীতি করে বলে যে ছোকরাকে জানতাম, চাঁদা চাইতে আসত, হঠাৎ ইলেকশনে নমিনেশন পেয়ে এম এল এ হয়ে গেল। তারপর মন্ত্রিসভায় ঢুকে পড়ল। শুধু ঢোকাই নয়, হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি মিনিস্টার হয়ে গেল। সেই ছেলেকে দেখলে মুশকিলে পড়ব না? উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম না করলে চাকরি চলে যাবে। চাঁদা চেয়ে পাঠালে আগের মত কুড়ি টাকা দিলে হবে? দুহাজার দিতে হবে। পদমর্যদা বলে

যে ব্যাপার আছে তাকে অস্বীকার করব কী করে? আর এটাই হয়েছে মুশকিল। আমি বোঝাতে পেরেছি?'

'জনির পদমর্যাদা বেড়েছে?'

'তাহলে এঁদের সামনেই বলি?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'কী বলব স্যার, এসব স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। এত বছর চাকরি করছি, জেনে গেছি আমার এলাকায় আমি শেষ কথা। শুধু আপনি আর রুলিং পার্টির নেতা ছাড়া কারও কথা শোনার দায় আমার নেই। বড়কর্তাদের কাছে কেউ কমপ্লেন করলে তাঁরা অ্যাকশন নিতে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। অ্যাকশন নেব কি, না নেব তা আমিই ঠিক করি। কিন্তু আপনাদের ইশারা পেলেই চোখ বন্ধ করে দিই। কারণ আপনারা আমায় দেখছেন। কিন্তু এখন এই অঙ্ক বানচাল হয়ে যাবে স্যার। মুশকিল এখানেই।'

'বুঝলাম না।'

'আপনি আমার সঙ্গে খেলা করছেন স্যার।'

'আপনার মত এক আধবুড়ো দামড়ার সঙ্গে খেলা করব, এটা ভাবলেন কী করে?'

'না, না, ওই খেলা নয়। তাহলে বলি। এই যে কলকাতা শহর, সেই গড়িয়া থেকে বেলঘরিয়া, বেহালা থেকে বেলেঘাটা হয়ে সল্টলেক, এখানে আর কোনও পাড়ার মাস্তান থাকবে না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ স্যার। এই বিশাল এলাকাকে চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক-একটা ভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক-একজন নির্বাচিত আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকের ওপর। অর্থাৎ এই চারজন কলকাতা চালাবে।'

'বলে যান।'

'স্যার, কেউ ইচ্ছে করলেই কলকাতা চালাতে পারে না। এই যে টনি, লোকটা বুদ্ধিমান, কথাবার্তায় বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু এতকাল তো ও একশোজনের একজন ছিল। হঠাৎ রাতারাতি লাইমলাইটে চলে এসেছে কারণ-- ভদ্রলোক থামলেন, 'কারণটা আপনি জানেন স্যার।'

'আপনি ভয় পেলেন কেন?'

'স্যার, আমি তো হরিদাস পাল, দিল্লি-মুম্বাইয়ের কত মহারথী ওঁর ভয়ে সিঁটিয়ে আছে তা আজ সবাই জানে। এই যে মুম্বাইয়ের নামী-দামি স্টারগুলো, সেই উনি তু-তু করে ডাকছেন অমনি ছুটে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? কারণ না গেলে হয় লাশ পড়ে যাবে, নয় কাজকর্মের বারোটা বেজে যাবে।' অফিসার জানালেন।

'বেশ রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন। এটা কলকাতা, এই শহরের ঐতিহ্য আলাদা মুম্বাইতে যা চলতে পারে এখানে তা অচল। তবু, কোনও কারণ যদিও নেই, আপনার কথা সত্যি ধরে নিয়ে বলছি, একজনের নাম বললেন টনি, বাকি তিনজনের নামটা জানান।' সুভাষদা হাসলেন।

'এ আপনি রঙ্গ করছেন স্যার।' অফিসার বিগলিত' হলেন।

'আপনি রঙ্গ করবেন না।'

'ওই তো, উত্তরে টনি, দক্ষিণে বশ্বাস, পূর্বে হায়দার আর পশ্চিমে কানাই নামে একজন।'

'এই এলাকা কি উত্তরের মধ্যে পড়ছে?

এটাকে উত্তর-পূর্ব বলা যেতে পারে।'

'ওদের জুরিসডিকশন কীভাবে ভাগ হল তা আমি বলতে পারব না স্যার।' হাত জোড় করলেন অফিসার, 'আমার অনুরোধ, পাঁচ মিনিটের জন্যে ওঁর সঙ্গে বসে কথা বলুন।'

'আরে, আমি কেন বসব? আমার স্ট্যাটাস কি'

'আপনি তো আমাদের মঙ্গল চান—?'

'তা চাই। কিন্তু একজন মাস্তান আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে আর আমি তাকে সময় দেব এ কথা ভাবলেন কী করে? আর সেটা করার দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিলেন?'

সুভাষদা সোজা হলেন।

'দায়িত্ব মানে সেই রকম কিছু নয়—'

'চুপ করুন। মিথ্যে বলবেন না। কি সপ্তম কি শুনেছিলে?'

আচমকা তার নাম শুনে সপ্তম নড়ে উঠল। এতক্ষণ বেশ চলছিল, যেন নাটক দেখছে এমনভাবে সে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। সুভাষদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে সে বলল,'হ্যাঁ, লোকটা একে বলে আপনার সঙ্গে একটা মিটিং ফিক্সআপ করার জন্যে। উনি বলেছিলেন, তা হয়ত পারি।'

'এ কে স্যার? অফিসার চোখ ছোট করে তাকালেন। 'আমার এক ভাই। আপনাদের কথাবার্তা শুনেছে।'

'অ। আচ্ছা ভাই, বুকে হাত দিয়ে বলত, আমি টনিকে আর কী বলেছি?' অফিসার প্রশ্ন করেন। সপ্তম চুপ করে রইল। সে কথা বলুক এটা সুভাষদা চান কি না তার জানা নেই।

'আচ্ছা, মুখ বন্ধ করে থেকো না। ভাতের তলায় যেমন তেতো থাকে তেমনি ওপরে নুনও দেওযা হয। তুমি নুনের কথা বললে, তেতো আছে কিনা জানাও।' অফিসার গলা কাঁপালেন।

অতএব বাধ্য হল সপ্তম কথা বলতে, 'হ্যাঁ, উনি লোকটাকে অনেকবার বলেছেন যেন ও সুভাষদার সঙ্গে ক্ল্যাশে না যায়। কিন্তু লোকটা কথাগুলো শুনতে চায়নি।'

'গুড। শুনলেন তো স্যার' যেন খুব কৃতিত্বের কাজ করেছে এমন ভঙ্গি করলেন অফিসার। সুভাষদা তাকালেন, 'সপ্তম, বাকি তিনজনের নাম কি ঠিক? এখন কি তোমার মনে পড়ছে?'

অফিসার যখন নামগুলো উচ্চারণ করছিলেন তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল, সে মাথা নেড়ে জানালো যে কোনও ভুল নেই।

সুভাষদা এবার অন্য দুই ভদ্রলোককে বললেন, 'সব রেকর্ড করেছেন?'

একজন মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। আমরা আজই হোম সেক্রেটারিকে জানাব।'

'মশা মারতে কামান দাগবেন।' সুভাষদা হাসলেন। দ্বিতীয়জন বললেন, 'কিন্তু সব শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা হালকা করে দেখা উচিত নয়।'

'তা দেখছি না। হোম সেক্রেটারিকে বললে ওটা মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে। ব্যস, মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে দেবেন যে বিদেশী মাফিয়ারা কলকাতায় ঢুকে পড়েছে। কলকাতায় প্যারালাল শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তারা। আমরা শিগগিরই ওদের ধরে ফেলব।' হাসলেন সুভাষদা, 'এই ঘোষণার পর আর ওদের টিকি দেখা যাবে না।'

'তাহলে?' প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন।

'বলছি অফিসার। আমি টনি, আপনার পক্ষে দুমুখো নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। আর আপনাকে এখানে রাখলে সেটা আরও বেড়ে যাবে। অতএব পছন্দ আপনার। কোথায় যেতে চান বলুন।'

'স্যার।' আঁতকে উঠলেন অফিসার।

'মুশকিল হল আপনাকে সুন্দরবনে পোস্টিং দিলে সেখানেও বাংলাদেশি ডাকাতদের সঙ্গে ব্যবসার সম্বন্ধ তৈরি করে ফেলবেন। ঠিক আছে, আপনি টনির সঙ্গে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করুন।'

আচমকা বিষয় বদলে যেতে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অফিসার।

'আপনি শুনতে পাননি?'

'হ্যাঁ। মানে, আপনি যাবেন? এনি টাইম, বলুন—।'

'আমি যাব মানে'

'না-না। ওকে বলব আসতে। আপনি কেন যাবেন? গরজ তো ওর। কী বলতে কী বলেছি। আমি আজই কথা বলে ব্যবস্থা করে ফেলছি।' অফিসার উঠে দাঁড়ালেন।

'তার মানে ওর সঙ্গে যোগাযোগের নাম্বার পেয়ে গেছেন।'

'না মানে, ওই বলেছে আজ আমায় ফোন করে জেনে নেবে।'

'বেশ। ওকে বলুন কাল দুপুরে এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে কথা হবে। ঠিক সাড়ে বারোটায়। আর হ্যাঁ, আমি নয়, আমার হয়ে কথা বলতে এই ছেলেটি যাবে।' হাত তুলে সপ্তমকে দেখিয়ে দিলেন সুভাষদা।

হতভম্ব হয়ে গেল সপ্তম। সুভাষদা তাকে পাঠাচ্ছে কথা বলতে? সে কেন যাবে? কিন্তু প্রতিবাদ করার আগেই অফিসার সপ্তমের দিকে আবার তাকালেন, 'খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন, কোথায় যেন।'

'আপনারা যখন এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে কথা বলছিলেন তখন ও সেখানে ছিল।'

'আই সি। কিন্তু একে তো আগে দেখিনি স্যার।'

'দেখার দরকার হয়নি বলে দ্যাখেননি।' সুভাষদা মাথা নাড়লেন, 'এবার যেতে পারেন।'

'কিন্তু স্যার, জনি যদি আপত্তি করে?'

'মানে?'

'ও যদি শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চায়।

'তাহলে মিটিং হবে না।'

'আমি একটা কাজ করব স্যার?'

'বলুন।'

'আপনি যে ওকে পাঠাচ্ছেন তা আজ জনিকে বলব না।'

'যা ইচ্ছে করুন।'

'তাহলে আজ বিদায় দিন।'

'অনেকক্ষণ আগেই আপনাকে চলে যেতে বলেছি।'

নমস্কার জানিয়ে অফিসার বিদায় নিলেন। এবার ওই দুই ভদ্রলোকের একজন বললেন, 'একে এখনই সাসপেন্ড করা উচিত।'

হেসে ফেললেন সুভাষদা, 'একে না হয় সাসপেন্ড করল, কিন্তু এর জায়গায় যিনি আসবেন তিনি যে সতী-সাবিত্রী হবেন তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? পরিসংখ্যান বলছে একশো জনে কুড়ি জন। কিন্তু ওই কুড়ি জন কারা তাই খুঁজে বের করা মুশকিল। ক্যাসেটটা কি আপনারা রাখবেন?'

'হ্যাঁ। সেটাই নিয়ম। তাহলে আজ উঠি।'

'আসুন।'

ওই দুই ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার পর সপ্তম মুখ খুলল, 'সুভাষদা।'

'বল ভাই।'

'আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন?'

'কারণ আমি যেতে চাই না বলে।'

'কিন্তু আমি কেন? ওরকম একজন মাফিয়া নেতার সঙ্গে কথা বলতে কেন যাব?'

'কারণ তুমি আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে চাও। আমাদের কলকাতা শহর একজন বিদেশী মাফিয়া দখল করে নিতে চায়, এটা নিশ্চয়ই তুমি পছন্দ করছ না। তাই না?'

'না। করছি না। কিন্তু এটা আপনার সঙ্গে ওর বোঝাপড়ার ব্যাপার।'

'বোঝাপড়া? ওরকম একটা মাস্তানের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করতে যাব তুমি ভাবলে কী করে? কিন্তু শুরুতেই অশান্তি চাই না বলে তোমাকে পাঠাচ্ছি। ও কী বলতে চায় শুনে আসবে। কোনও কথা দেবে না। হয়ত তোমাকে বলবে ওই এগারজন প্রমোটারকে ও কন্ট্রোল করবে, এটা ওকে বলতে দাও। যা যা দাবি ওর আছে শুনে চুপচাপ চলে আসবে।'

'কিন্তু সুভাষদা, আমাকে আপনি পাঠাবেন না।'

'কেন?'

'এরকম ব্যাপারের সঙ্গে আমি জড়াতে চাই না।'

'চাই না বললে তো হবে না ভাই, তুমি জড়িয়ে আছ।'

'জড়িয়ে আছি মানে?' অবাক হল সপ্তম।

'বশিদের সঙ্গে তো তোমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।'

'আহা! সেটা আমি ওদের পার্স কুড়িয়ে পেয়েছিলাম বলে। সম্পর্ক কিছু হয়নি।'

'শোন সপ্তম, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল, তুমি খুব নিরীহ ছেলে, অনেস্ট। তাই তোমার সম্পর্কে একটা ভাললাগা তৈরি হয়েছিল আমার মনে। কিন্তু এই ইমরান রহমানের মানিব্যাগ পাওয়ার পর থেকেই তুমি পাল্টে গেছ। তুমি আমার সঙ্গে দু-নম্বরি ব্যবহার করেছ। সত্যি কথা লুকিয়েছ। অন্য কেউ হলে এর জন্যে ভয়ঙ্কর শাস্তি পেত। তোমাকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করছিলাম। কিন্তু তার জন্যে তো একটা প্রায়শ্চিত্য করা দরকার। তাই তুমি যাবে।' সুভাষদা উঠে দাঁড়ালেন।

সপ্তম কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সন্দেহ ছিল আগেই, এখন মনে হচ্ছিল সুভাষদা এ ব্যাপারে অনেকটাই জানেন। তার পেছনে লোক লাগিয়ে খবর জানতে চাওয়া মানে তাকে উনি সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। এরকম এক ধূর্ত মানুষকে বেশিক্ষণ মিথ্যে বলে ভোলানো যায় না।

এতক্ষণ রাসেল একটাও কথা বলেনি। বাড়ির বাইরে এসে রাসেল কথা বলল, 'আপনি ফেঁসে গেলেন।'

সপ্তম ঠোঁট কামড়াল। বেরিয়ে আসার আগে একটা পাঁচশো টাকার নোট দিয়েছেন সুভাষদা এয়ারপোর্ট যাওয়া-আসা এবং ওখানকার কফির খরচ। বাধ্য হয়েছে সে টাকাটা নিতে। রাসেলের গাড়ির কাছে পৌঁছে সপ্তম বলল, 'এই শেষবার।'

'শেষবার মানে?'

'কাল গিয়ে কথা শুনলে যদি সুভাষদা খুশি হন তাহলে এখানেই সম্পর্ক শেষ।'

'হ্যাঁ। সেটাই উচিত। আপনার মত ভদ্রশিক্ষিত ছেলে কেন এসবের মধ্যে থাকবেন?'

'আমি কি থাকতে চেয়েছি? পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করছে।'

'আপনি তো উল্টোডাঙার দিকে যাবেন, উঠে পড়ুন।'

গাড়িতে ওঠার পর রাসেল বলল, 'আমার আজ কেমন যেন মনে হচ্ছে, সুভাষদা বেশ ভয় পেয়েছেন। ভয় না পেলে আপনাকে পাঠাতেন না।'

'কী করত?'

'তুড়িমেরে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতেন, পাত্তাই দিতেন না।'

'কেন ভয় পাচ্ছেন? প্রশাসন তো ওঁর হাতের মুঠোয়।'

'ওই দুবাইয়ের মাফিয়ার হাত যদি এতদূরে চলে আসে তাহলে এখানকার যে কেউ ভয় পাবে। ওদের নেটওয়ার্ক অসাধারণ।' রাসেল গাড়ি চালাতে চালাতে বলল।

কিছুক্ষণ দুজনে কোনও কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত রাসেল মুখ খুলল, 'ওই এগারোজনের লিস্ট আপনি দেখেছেন'

'কোন এগারোজন?'

'প্রমোটরদের লিস্ট, সেটা জনিকে দেওয়া হয়েছে।'

'নাঃ, আমার দেখার কোনও সুযোগ ছিল না।'

'আমার নাম থাকলে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে।'

'অবশ্যই। অবশ্য টনি অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওই এগারোজনের মধ্যে কে কে সুভাষদার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ।'

'আচ্ছা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতলব। অফিসার কী বলল'

'রাগ থাকতে পারে তবে সুভাষদার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলে না।'

উল্টোডাঙার মোড়ে এসে গাড়ি থামাল রাসেল, 'সপ্তম, আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। যদি মনে করেন একা যেতে অস্বস্তি হবে, আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু সেটা বোধহয় সুভাষদা পছন্দ করবেন না। বরং কাল দুপুর একটায় আপনি যদি এয়ারপোর্টে কার পার্কিংয়ে অপেক্ষা করেন তাহলে খুব ভাল হয়।' সপ্তম বলল।

'থাকব। ডোমেস্টিক্যালে তো? ঠিক আছে।' রাসেল চলে গেল।

বাড়িতে ফিরে এল সপ্তম। এসে দেখল বাইরের দরজা খোলা। অবাক হয়ে সেখানে পৌঁছে দেখল রশিদ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে।

সে অবাক, 'আপনি?'

রশিদ হাসল, 'হাতি কাদায় পড়ে গেলে ব্যাঙও তাকে লাথি মারে সপ্তমবাবু।'

মানে বুঝতে পারলাম না।'

'বসুন। দাঁড়িয়ে থাকলে কথা বলতে অসুবিধে হয়।' হাসল রশিদ, 'আপনার বাড়িতে এসে আপনাকেই বসতে বলছি।' ঘড়ি দেখল সে।

সপ্তম আন্দাজ করল, গুরুতর কিছু ঘটেছে। তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। সে বসল।

'আপনাকে আমি নিরীহ বাঙালি বলে মনে করেছিলাম।' রশিদ বলল।

'আপনি ঠিকই মনে করেছিলেন।' মিনমিন করে বলল সপ্তম।

'ঠিক হলে আমার চেয়ে কেউ খুশি হত না। এখন আপনার সম্পর্কে যে খবর পেলাম তাতে ধারণা পাল্টে গেছে। আমাদের লাইনে এরকম হলে কঠোর শাস্তি দেওয়ার নিয়ম।' রশিদ বলল।

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রশিদ সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সুভাষবাবুর লোক'

এবার কেঁপে উঠল সপ্তম। তারপর দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না। আমি ওর লোক নই।'

'আবার মিথ্যেকথা বলছ সপ্তমবাবু। এক হাজার সত্যি কথার পুণ্য একটা মিথ্যে কথায় নষ্ট হয়ে যায়। আপনি তো সুভাষবাবুর সঙ্গে আজ মিটিং করেছেন।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'তাতে তো আপনার কোনও দরকার নেই। তবে একথা জানুন, সুভাষবাবু আপনাকেও বিশ্বাস করেন না। আমার খোঁজে যখন গিয়েছিলেন তখন আপনার পেছনে ওর লোক ছিল। যাকগে, শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। দু-নম্বরী আমি মানতে পারি না '

'আমি কি দুনম্বরী করেছি'

'করেননি? ওই পার্সে যে কাগজ ছিল তার বিষয়বস্তু সুভাষবাবুকে বলেননি?'

'বিশ্বাস করুন আমি নামগুলো ভুলে গিয়েছিলাম।' আজ একজন অফিসার নামগুলো বলার পর মনে পড়ে গিয়েছিল।'

'সেই অফিসারের সঙ্গে জনির যে কথাবার্তা এয়ারপোর্টে হয়েছিল তা সুভাষবাবুকে জানানোর জন্যে ওর ডেরায় গিয়েছিলেন। তাই না?'

সপ্তম হতভম্ব। এরা কি অন্তর্যামী? সব কথা ঠিকঠাক বলে দেয় কী করে!

'শুনুন। প্রথমবার বলে আমি অল্পের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। ইমরান ভাইয়ের ব্যাগটা ফেরত দেওয়ার জন্যে যে টাকা আপনাকে দিয়েছিলাম সেটা ফেরত দিন'

'টাকা?'

'দয়া করে বলবেন না খরচ করে ফেলেছেন বা কাউকে দিয়ে দিয়েছেন।'

'না। টাকাটা আমার কাছেই আছে।'

'গুড। আপনাদের মত বাঙালির একটা গুণ হল বেশি টাকা হঠাৎ করে পেয়ে গে কীভাবে খরচ করতে হয় তা জানেন না। নিয়ে অসুন। রশিদ হাসল।

'টাকাটা সত্যি ফেরত নেবেন?'

'হ্যাঁ। নইলে জানে না মারলেও অন্তত মাস খানেকের জন্যে আপনাকে হাসপাতা পাঠাতে হয়। আমি প্রথমবার বলে সেটা করতে চাই না। টাকাটা দিন। আর ভুলে যা কোনও ব্যাগ পেয়েছিলেন বলে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এতে আপনার মঙ্গ হবে।' রশিদ বলল।

টাকাটা দিতে যদি দায় মিটে যায় তাহলে সেটা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। না দিলে একমা হাসপাতালে শোওয়ার জন্যে ওরা যে মার তাকে মারবে তাতে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। অতএব এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে এতদিন যেমন ছিল তাই থাকতে সপ্ত নিজের ঘরে গেল টাকা আনতে। সেটা বের করে উঠে দাঁড়াতেই মাকে দেখতে পেল সে মা জিজ্ঞাসা করত, 'কত টাকা আছে ওখানে?'

'কেন?' অস্বস্তিতে পড়ল সপ্তম।

'বলতে তোর আপত্তি আছে?'

'আটত্রিশ হাজার টাকার মত।'

'অত? অত টাকা তুই লোকটাকে দিয়ে দিচ্ছিস?'

'এটা আমার টাকা নয় মা। যার টাকা আছে দিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি তোদের সব কথা শুনেছি। সেদিন যে লোকটা ওই টাকা দিয়ে গিয়েছিল তা কথাও শুনেছি।

তুই কি এমন কাজ করেছিস যে শাস্তি হিসাবে দেওয়া টাকা ও ফেরত চাইছে?'

সপ্তম ফাঁপড়ে পড়ল। মা-কে সব কথা বুঝিয়ে বললেও বুঝবে বলে মনে হয় না তাছাড়া সে সময় এখন নয়। ওপাশের ঘরে রশিদ বসে আছে। সে বলল, 'সবই যখ শুনেছ, তখন জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'তোর যা ইচ্ছে কর, আমি পাগল হয়ে যাব।' মা সরে গেল।

টাকার বান্ডিলটা টেবিলের ওপর রেখে সপ্তম বলল, 'গুণে নিন।'

রশিদ হাসল, 'আপনি কত টাকা সরাতে পারেন? একশ, পাঁচশ? তার বেশি তো নয়

চেয়ারে বসে সপ্তম বলল, 'আপনি ব্যঙ্গ করছেন, আমি আর এসবের মধ্যে থাক চাই না।'

'চান না?'

'না।' 'কিন্তু আগামীকালই তো সুভাষবাবুর হয়ে জনির সঙ্গে কথা বলতে হ আপনাকে।'

চমকে তাকাল সে। এই খবরও লোকটা জানে? তার মানে অফিসার ওখান থে বেরিয়েই তার কথা জনিকে বলেছে। জনিকে বলা মানে রশিদের জানা। শোনামাত্র রশি চলে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলতে?

'আমি যাব না।'

'যাবেন না?'

'না। এসবের মধ্যে আমি আর নেই।'

'সুভাষবাবুকে না বললে তিনি আপনাকে ছেড়ে দেবেন? দেখুন, আমরা ছাপমারা। আমাদের মনে ভয় ডর আছে আবার দয়ামায়াও আছে' সুভাষবাবুরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ। তাঁর হাত বহুৎ লম্বা' কিন্তু ওঁর ছায়া থেকে যে সরে যায় তার ওপর বিন্দুমাত্র দয়া ওঁর থাকে না। এমনকি, ছায়ায় থাকা অবস্থায় কেউ যদি বোকার মত পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাহলে তিনি তাকে চিনতে পারেন না। দেখুন, যদি না বলতে পারেন তাহলে আপনারই ভাল হবে।' টাকাগুলো নিয়ে রশিদ চলে গেল।

সপ্তম লক্ষ্য করল তার বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। রশিদ হেঁটে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। এভাবে আসা রশিদের পক্ষে বেমানান। হয় তো বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছে লোকটা। এদের ঠিকঠাক বোঝা যায় না।

টাকাগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল বলে এখন কষ্ট হতে লাগল। মাধবিকাকে বলে একটা টিকিট এই টাকায় স্বচ্ছন্দে যোগাড় করা যেতে পারত। এই চক্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে শুধু মাধবিকার সঙ্গ পেলে জীবনটা অনেক সুস্থির হত।

'টাকাটা শেষ পর্যন্ত দিয়েই দিলি।' পেছনে মায়ের গলা।

'আর। বললাম তো, ওটা আমার টাকা নয়।'

'এরা কি গুণ্ডা?'

'জানি না।'

'সুভাষবাবু কি এদের শত্রু?'

'হ্যাঁ। প্লিজ আর প্রশ্ন করো না। আমার একদম ভাল লাগছে না।'

'শোন খোকা, এসব বদমাস গুণ্ডাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়িস না, তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোর কিছু হলে আমি কী করব তা কি একবারও ভেবেছিস?' মা জিজ্ঞাসা করল।

সপ্তম ঘুরে দাঁড়াল, তুমি অযথা চিন্তা করছ। এদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখছি না।'

'তাহলে এরা বাড়িতে আসছে কেন?'

'আর আসবে না।' নিজের ঘরে চলে এল সপ্তম।

যত সময় যাচ্ছিল তত টাকাগুলোর জন্যে আফসোস হচ্ছিল। সুভাষদার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার কারণে টাকাগুলো হাতছাড়া হল। সুভাষদা কি এর ক্ষতিপূরণ করবে? একমাত্র জ্যোতি দত্তের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া ছাড়া সুভাষদা তার কোনও অর্থকরী উপকার করেননি। আজ প্রথমবার সপ্তম আবিষ্কার করল তার কোনও বন্ধু নেই যার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে। পরিচিত মানুষ যারা আছে তাদের সঙ্গে সে সব সময় একটি দূরত্ব রেখে মিশেছিল। এখন বোধহয় চট করে কেউ কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না। বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে তার মাধবিকাকে মনে পড়ল। মাধবিকাকে কি এসব কথা বলা যায়? মাথা নাড়ল সপ্তম। ও ঘাবড়ে যাবে। কলেজে থাকার সময় তো কোনও কথাই হত না। দেখা হল এত বছর পরে। পরপর দুটো দিন মাধবিকা যে ব্যবহার তার সঙ্গে করেছে তা সদ্যপরিচিতা কোনও মহিলা নিশ্চয়ই করবে না। এককালে সহপাঠী ছিল শুধু এই তথ্যটি অনেক ব্যবধান কমিয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

মাধবিকাকে টেলিফোন করল সপ্তম। চারবার রিঙ হওয়ার পর ওর মা ফোন ধরল, 'কে?'

'আমি সপ্তম। মাধবিকা আছে?'

'না। বাড়িতে নেই। ডিনারে গেছে।'

'ডিনারে?'

'হ্যাঁ। কোনও ফাইভ স্টার হোটেলে। কিছু বলতে হবে?'

'না। এমনি ফোন করেছিলাম।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সপ্তম।

কোথায় খাপ খুলতে গিয়েছিল সে। যে মেয়ে ভাল চাকরি করে, ফাইভ স্টারে ডিনা খেতে যায় সে কি করে তাকে বন্ধু বলে ভাববে? নাস্ট্যালজিক হওযা ক্ষণিকের জন্যে, ত থেকে একধরনের সুখ পাওয়া যায়, তাই। সেটাই চব্বিশঘণ্টা কেউ আঁকড়ে বসে থাক না। তাছাড়া এই জীবনে যে অভ্যস্ত বন্ধু হিসাবে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ি পারবে? অসম্ভব।

আগামীকাল আবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে। জনির সঙ্গে কথা বলতে হবে। কারণে যে টাকাটা না দিলে নয় তা সুভাষদা দিয়েছেন। কিন্তু সে যাবে না। অবশ্য কিছু জানিয়ে ডুব দেওয়াটা ঠিক হবে না।'

আজই জানিয়ে দিলে সুভাষদা অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। এটা ভদ্রতা। ঝোঁকের ব নাম্বার টিপল সপ্তম.' সুভাষদা আছেন? আমি সপ্তম।'

'এই যে সপ্তমবাবু, কী খবর? সুভাষদার গলা।

'ভাল। সুভাষদা।' গলা কী রকম শুকিয়ে যাচ্ছিল সপ্তমের।

'হ্যাঁ, বলো।'

'মানে।'

'যা বলার তা চটপট বল সপ্তম, আমি ব্যস্ত আছি।'

'কাল এয়ারপোর্ট যাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলম।' বলে ফেলল সে।

'কি কথা? কথা তো হয়েই গেছে। ও শোন সপ্তম, সুভাষদা কাউকে কখনই বি পয়সায় খাটায় না। লোকটার সঙ্গে কথা বলে এসে আমাকে জানালে তুমি পারিশ্রমি পাবে। আজ যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকব আমি। আশ্চর্য। টাকা চাই এটা সোজাসু বলতে পার না?'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

ঠোঁট কামড়াল সপ্তম। কী যে হয় তার। তার হাতের বুড়ো আঙুলটাকে সহজেই পেছ দিকে হেলেয়ি দেওয়া যায়। কোথায় যেন পড়েছিল, যাদের মনে দৃঢ়তা আছে, চটজল সিদ্ধান্ত নিতে যাদের অসুবিধে হয় না তাদের হাতের বুড়ো আঙুল জানি পেছনে হেলানে যায় না। তার কুষ্ঠিতে আছে সে সব সময় পেন্ডুলামের মত দুলবে। রাত আটটা নাগা রাসেলকে টেলিফোন করল সপ্তম। এই লোকটাকে বন্ধু বলা যায় কিনা তা সে জানে ন তবে প্রথম আলাপের পর থেকেই রাসেল তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছে। আ সুভাষদার সামনে রাসেল যে মুখ খোলেনি সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। ওরক পরিস্থিতিতে পড়লে সে-ও চুপচাপ থাকত।

'হ্যালো সপ্তম। কোথায়?' রাসেল নিশ্চয়ই মোবাইলে ভেসে ওঠা নাম্বার দেখেই চি ফেলেছে।

'বাড়িতে। তুমি'

'আউট্রাম ক্লাবে। চলে এসো।'

'কোথায় ক্লাবটা?'

রাসেল রাস্তাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি এখানে মিস্টার মিসেস সোমের গেস্ট। তুমি রিসেপশনে মিস্টার সোমের নাম বলবে। ও কে?'

ফোন নামিয়ে হাসল সপ্তম। আচমকাই রাসেল তাকে তুমি বলল। আজকেও সামনাসামনি ও আপনি বলেছে। গলা শুনে বোঝাই গেল ভাল পান করেছে। এখন এই সময়ে অতদূরে যাওয়া কি ঠিক হবে। ইতস্তত করছিল সপ্তম। তারপরে মনে হল মিস্টার সোমের সঙ্গে আলাপ হলে ভদ্রলোককে যদি শেয়ারের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড করানো যায় তাহলে—। সে তৈরি হয়ে নিল!

'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস' মা বসার ঘরের দরজায়।

'এমন কী রাত! কাজ আছে।'

'রাত দুপুর ছাড়া তোর কাজ হয় না?'

'মা, তুমি খুব রেগে আছ। আমি ছেলেমানুষ নই।'

'দরজার চাবি নিয়ে যা। আমি রাত জেগে বসে থাকতে পারব না।'

অতএব চাবি নিতে হল। দুটো জিনিস সচরাচর নিতে চায় না সপ্তম। একটা হল, ছাতা। ছাতা হারানো তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যটি হল চাবি। কী করে যে পকেট থেকে বেরিয়ে টুক করে পড়ে যায় ঠিক বুঝতে পারে না সপ্তম।

থিয়েটার রোড থেকে আউট্রাম ক্লাবে পৌঁছাতে একটু ঘুরতে হল। বেশ হাঁটাহাঁটিও। রিসেপশনে মিস্টার সোমের কথা বলতেই ভদ্রলোক ইশারা করলেন ভেতরে যেতে। বাঁ দিকে হল ঘর। সেখানে অনেকেই আড্ডা মারছেন। তাদের মধ্যে রাসেলকে দেখতে পেল না। ওপাশের কাচের দরজার ভেতর দিয়ে আর একটা ঘর দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল। এখানেই রাসেল বসে আছে। তাকে দেখে হাত তুলল সে। রাসেলের উল্টোদিকের চেয়ারে দুজন বসে আছেন। ভদ্রলোককে বৃদ্ধই বলা যায়। পরনে কমপ্লিট স্যুট, পাকা চুল, চশমা। মুখ নিচের দিকে নামানো। পাশে বসে আছেন যিনি তিনি একদা ডানাকাটা সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়সের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে হেরে যেতে যেতেও তিনি যে হাল ছাড়তে রাজি নন তা প্রসাধনে স্পষ্ট।

রাসেল বলল, 'বসো। আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার সি কে সোম, মিসেস সোম আর সপ্তম চ্যাটার্জি। সপ্তম খুব ভাল ছেলে।'

ভদ্রমহিলা ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন, 'প্লিজ-।'

সপ্তম বসল। বৃদ্ধ চোখ তুললেন, 'গোপালও খুব ভাল ছেলে ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমশাই লিখেছিলেন। সুবোধ বালক। 'আপনি তাকে চেনেন?'

সপ্তম মাথা নাড়ল 'না।'

'আমরা কেউ চিনি না। ফানি বেশ মজার। বলেই মাথা নামালেন'

মিসেস সেসব জিজ্ঞাসা করলেন। 'কী খাবেন বলুন?'

রাসেল বলল, 'ও মদ খায় না। একটা কোক বলা যেতে পারে।'

'মাই গড!' মহিলা চোখ ঘোরালেন এবং শেষ পর্যন্ত বেয়ারাকে ডেকে তাই আনতে বললেন।

রাসেল বলল, 'এঁরা আমাকে খুব ভালবাসেন। এঁদের মেয়ের জন্যে একটা ফ্ল্যাট কিনবেন বলে আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

সপ্তম মাথা নাড়ল। মিসেস সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও কি প্রোমোটিং বিজনেসে আছেন?'

'না-না।' দ্রুত বলল সপ্তম 'আমি শেযার মার্কেটের সঙ্গে আছি।'

'শেয়ার মার্কেট? ইন্টারেস্টিং, মিসেস সোম বললেন, 'আমার ভাই দিল্লিতে থাকে। প্রতিদিন বিভিন্ন কাগজ থেকে কীসব নোট করে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, কোনও কোম্পানির শেয়ারের কি দাম বাড়ছে বা কমছে তাই স্টাডি করছে সে। বছর পাঁচেকের মাথায় সে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করেছে।' 'ঠিকই। চোখ খোলা রাখলে এবং বেশি লাভ না থাকলে শেয়ার থেকে ভাল রোজগার করা সম্ভব।' সপ্তম বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলল।

মিসেস সোম মাথা নাড়লেন. 'না বাবা, আমার বেশি লোভ নেই। আমরা প্রত্যেক বছর ডার্বির দিন রেসকোর্সে যাই। সবাই দশটাকায় পঞ্চাশ ষাট টাকা পাওয়ার জন্যে ঘোড়া খেলে। আমি দেখি দশটাকায় ষোল টাকা, পনের টাকা পাওয়া যাবে। ঘোড়াটা যদি ফাস্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে আসে অথচ সেটা কেউ খেলছে না। অত কম টাকায় কারও মন ভরে না। আমি বলি দশটাকায় পনের টাকা মানে তো ফিফটি পার্সেন্ট প্রফিট। কোনও ব্যাঙ্ক একবছর টাকা রাখলে সাত পার্সেন্টের বেশি দেবে না। আর এ তো পাঁচ মিনিটে ফিফটি পার্সেন্ট। তার ওপর হেরে গিয়ে থার্ড হলেও পেমেন্ট পাওয়া যাবে। আমি তাই খেলি। আর ফেরার সময় দেখি সঙ্গীরা সবাই হেরে গিয়েছে একমাত্র আমি জিতেছি।' কথাগুলো একটানা বলে বেশ জোরে হেসে উঠলেন মিসেস সোম।

রাসেল বলল, 'তার মানে আপনি সেফ গেম খেলতে চান। নো ঝুঁকি।

ঠিক তাই। ঝুঁকি যখন নেওয়ার নিয়েছি, আর নয়।'

সপ্তমের এসব কথায় মন ছিল না। সে কোক খেল চুপচাপ। মিস্টার সোম, সেই যে মাথা ঝুঁকিয়েছেন আর তোলার নাম নেই। সেটা দেখতে দেখতে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর কি শরীর খারাপ?'

'নো। নট অ্যাট অল। আই অ্যাম এনজয়িং।' মুখ তুললেন মিস্টার সোম।

'ও'।

'তিন-চার পেগ মদ শরীরে যাওয়ার পর একধরনের আমেজ তৈরি হয়। সেটা চোখ বন্ধ করে উপভোগ না করলে মদ খাওয়াটাই বৃথা হয়ে যায়। মিস্টার সোম বললেন।

'নো। নট অ্যাট অল।' 'ঘন ঘন মাথা নাড়লেন মিসেস সোম, 'আমার পিতা, পিতামহ কখনই মদ স্পর্শ করেননি। ভাবতেও পারতেন না। এই চার পেগ খাওয়ার পর আমি চোখ বন্ধ করে তাঁদের মুখ মনে করার চেষ্টা করি। তারপর একে একে অল দোস রিলেটিভস, বন্ধু, পরিচিত যাঁরা পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন, তাঁদের মুখ মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ান, হেসে বলেন, খাও হে খাও। ব্যাস, মনটা আনন্দে ভরে যায়।'

মিস্টার সোম বললেন, 'স্যাডিজম।'

রাসেল বলল, 'আচ্ছা এবার আমাদের উঠতে হবে।'

মিসেস সোম ঠোঁট ফোলালেন, 'ওমা এখনই।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল রাসেল, 'তাহলে ওই কথাই রইল।'

ক্লাবের বাইরে এসে রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

সপ্তম লক্ষ্য করল রাসেল আবার তুমি থেকে আপনিতে ফিরে গেল।

'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সপ্তম বলল। 'কী রকম?' রাসেল অবাক হয়ে তাকাল।

'আগামীকাল এয়ারপোর্টে যাব না। এইসব সমাজবিরোধী ব্যাপারের সঙ্গে আমি আর জড়িয়ে থাকতে চাই না।' বেশ জোরের সঙ্গে বলল সপ্তম। 'ব্যাপারটা ভাবুন। চট করে এমন কিছু না করাই ভাল,' 'কেন'? 'আজ সন্ধেবেলায় জনির সঙ্গে হাত মেলানোয় চার মাস্তান খুন হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন।'

হাঁ হয়ে গেল সপ্তম।

রাসেল বলল, 'চলুন, গাড়িতে উঠে কথা বলি।'

'ওই চারজন কারা?'

'তথাকথিত মাস্তান। যারা টাকা নিয়ে কাজ কবে দেয়। জনির খবর তাদের কাছেও পৌঁছেছিল। হাওয়া যেদিকে সেদিকে যাওয়াই মঙ্গল ভেবে দলত্যাগ করেছিল।' গাড়ির কাছে পৌঁছে রাসেল বলল।

'কে খুন করল?'

'আইন।'

'মানে?'

'উঠে পড়ুন আগে।' রাসেল নিচু গলায় বলল, সপ্তম গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতেই ইঞ্জিন চালু করল সে 'ছোটবেলায় শুনতাম, দেওয়ালেরও কান' আছে। এখন দেখছি হাওয়ারও শ্রবণশক্তি প্রখর। খোলা আকাশের নিচে কথা বললে তা ঠিক জায়গায় ভেসে যায়।

সপ্তম চমকে পেছন দিকে তাকাল। দু'তিনজন দারোয়ান গোছের লোক ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মাইক খুন করেছে?'

'পুলিসের খাতায় তো নাম ছিল। আজ ধরতে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়েছে গুলি চালাতে। ব্যস। চারজনেই খতম।' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রাসেল।

'পুলিস এতদিন ওদের সন্ধান পায়নি?'

কেন পাবে না? কিন্তু দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। কলকাতায় যতগুলো থানা আছে খাতায় কত ক্রিমিন্যালের লিস্ট আছে তা জানেন? এদের সবাইকে কি ধরা যায়? ধরলেই বা কী হবে? দিন কয়েকের মধ্যে কোর্ট থেকে বেল পেয়ে যাবে। মিছিমিছি ওদের ধরে কিছু সরকারি পয়সা নষ্ট করতে পুলিস চায় না। নিতান্ত বাধ্য না হলে, এই যেমন আজ হয়েছে।'

'না ধরে খুন করল কেন?'

'আত্মরক্ষার জন্য। ওরা বোধহয় গুলিটুলি ছুঁড়েছিল।'

'আমি বুঝতে পারছি না। চারজন সমাজবিরোধীর পুলিসের হাতে খুন হওয়ার সঙ্গে

আমার এই সিদ্ধান্তের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?' সপ্তম বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাস করল।

হাসল রাসেল, 'সত্যি আপনি উত্তেজিত। আচ্ছা, যে চারজন এতদিন বীরবিক্রমে ঘু বেড়াত, তাদের পুলিস কিছু বলত না। আজ যেই জনির দলে ভিড়তে চাইল, অমনি পুলি এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে আত্মরক্ষার জন্য খুন করে ফেলল। ওরা যদি জনির দলে যে না চাইত তাহলে দিব্যি বেঁচে থাকত।'

'আমি তো কারও দলে যাচ্ছি না।'

'কারও সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইলে তার সন্দেহ হবেই যে আপনি বিপক্ষের সঙ্গে হা মিলিয়েছেন। এমনিতেই সুভাষদা আপনাকে ভাল চোখে দেখছেন না।' রাসেল এবা গম্ভীর।

'তাহলে?'

'তাহলে মন থেকে ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা সরিয়ে ফেলুন। কাল আপনার যাওয়া কথা, আজ যদি বলেন যাব না, সম্পর্ক রাখবেন না,' একটু থামল রাসেল, 'আপ সুভাষদাকে বলতে পারবেন?'

'ফোন করেছিলাম বলতে পারিনি।'

'নিজেই তো বুঝতে পারছেন। একেবারে চোরের মত সরে দাঁড়ানো আরও খারা কাজ হবে। আরে সোজা লোকটার সঙ্গে কথা বলবেন, ওর বক্তব্য শুনবেন তারপর ফি সুভাষদাকে সেটা রিপোর্ট করে বলবেন ওঁর অনুরোধ আপনি রেখেছেন এবং এরপ আর এসবের মধ্যে থাকতে চান না। ব্যস, মিটে গেল ব্যাপারটা।' রাসেল সহজ ভঙ্গি বলল।

সপ্তম কথা বলল না। রাসেলের কথায় যুক্তি আছে। ঠিক আছে, কাজটা করে দি নিষ্কৃতি চাইবে সে। হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। রাসেল বলল, 'আপনার পরিচিত মানুষ দুজ যাচ্ছেন।'

ফুটপাথের দিকে তাকাতেই ওদের দেখতে পেল। দুজনে বেশ হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছে।

সুজলা দত্তগুপ্ত এবং তাঁর স্বামী। রাসেল ইচ্ছে করে গাড়িটা ওঁদের পাশে নিয়ে এল ভদ্রমহিলা বেশ বিরক্ত হয়ে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠলেন, 'ও মা! কী ভাল! এই দ্যাখো কারা এসেছে?'

ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে তাকালেন, হাসলেন, তারপর স্ত্রীকে বললেন, 'এখা দাঁড়িয়ে কথা বললে সময়টা নষ্ট করা হবে না? শর্টকার্টে সারো।'

সুজলা ওই কথার জবাব না দিয়ে সোজা এগিয়ে এসে গাড়ির পেছনের দরজা খু উঠে বসে বললেন, 'আপনারা একটা ফয়সালা করে দিন তো। এরকম পুরুষের সঙ্গে আ ঘর করা যায় না'

রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'আর বলবেন না।' সুজলা নাক থেকে একটি বিরক্তিসূচক শব্দ বের করল, 'তখ থেকে আমাকে নিয়ে এই বার, সেই বার করে বেড়াচ্ছে। কিনা ওর ক্লায়েন্ট কোন বা থাকবে তা শুনতে ভুল করেছে। ভাবুন। এমন ঢ্যামনা ব্যাটাছেলে আমি কখনও দেখিনি

'সত্যি অন্যায়। একজন মহিলাকে নিয়ে বারে-বারে ঘুরে বেড়ানো বাড়াবাড়ি।' রাসেল বলল।

মিস্টার দাশগুপ্ত ততক্ষণে গাড়ির জানলায় চলে এসেছেন, 'জলা, একবারটি চল, আমার মনে পড়ে গেছে। গণেশ অ্যাভিনিউর বারে গেলেই ওঁর দেখা পাওয়া যাবে।'

'ইম্পসিবল।' সুজলা মাথা নাড়ালেন, 'আমার প্রেস্টিজ আছে।'

রাসেল বলল, 'উঠে আসুন মিস্টার দত্তগুপ্ত, আমি আপনাদের পৌঁছে দিচ্ছি।'

'দেবেন? খুব ভাল হয়, অনেকটা সময় বাঁচবে।' বলতে-বলতে উঠে বসলেন ভদ্রলোক।

গাড়ি চলতে শুরু করলে সপ্তম প্রশ্নটা না-করে পারল না, 'আপনাদের ক্লায়েন্ট মানে যাঁরা এ্যামওয়ে করতে চান তাঁদের সন্ধেবেলায় চৌরঙ্গির বারেই পাওয়া যায় বুঝি?'

দত্তগুপ্ত বললেন, 'হেঁ হেঁ, শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্যি।'

সুজলা বললেন, 'শুয়োরে চেনে কচু। যাক গে, সপ্তমবাবু. আপনাকে আমি কার্ড দিয়েছিলাম, কই, একটা টেলিফোনও করলেন না।'

'ঘন ঘন তো দেখা হয়ে যাচ্ছে—তাই।'

'তাতে কী! টেলিফোনে কথা বলার মজা কি সামনাসামনি বলায় পাওয়া যায়?'

'আসলে খুব ব্যস্ত আছি এখন!' সপ্তম কথা থামাতে চাইল।

গণেশ অ্যাভিনিউর বার-কাম রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছে মিস্টার দত্তগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রোককে, রোককে।'

সুজলা ধমকালেন, 'কী হচ্ছে অ্যাঁ? তুমি কি বাসে চড়েছ যে রোককে বলে চেঁচাচ্ছ?'

'সরি। উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলেছি।'

দত্তগুপ্ত গাড়ি থামতেই নেমে পড়লেন, 'এসো।'

'আচ্ছা।' সুজলা বললেন, 'কী ভাল যে লাগল আপনাদের দেখা পেয়ে।' বলে নেমে গেলেন।

সপ্তম দেখল ওরা বার-কাম রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। সে বলল, 'অদ্ভুত দম্পতি।'

রাসেল ঘড়ি দেখল, 'বেশ রাত হয়ে গেছে। ওদের তো এর মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার রুটিন। আজ এরকম ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? 'ভগবান জানেন।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? কর্তার পেটে আজ মদ পড়েনি।'

'সেরকমই তো মনে হল, গলার স্বর স্বাভাবিক আছে।'

গাড়িটা পার্ক করল রাসেল, 'চলুন ব্যাপারটা দেখে আসি।'

সপ্তমের ইচ্ছে হচ্ছিল না। কালকের ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব টেনশনে আছে। ওই ব্যাপারে রাসেলের সঙ্গে আর একটু আলোচনা করার কথা ভাবছিল। তাছাড়া তার বেশ খিদে পাচ্ছে এখন। সে বলল এখানে কিছু খেয়ে নিলে হয়।

রাসেলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে সপ্তম দেখল বার বেশ জমজমাট। প্রচুর লোক একসঙ্গে কথা বললে যে আওয়াজ হয় তা মোটেই সুখকর নয়। ওই ভিড়ে দত্তগুপ্ত পরিবার নেই। কারণ কোনও মহিলাকেই দেখা যাচ্ছে না এই হলঘরে। ওদের ইতস্তত করতে দেখে একজন স্টুয়ার্ট এগিয়ে এল, 'এনি প্রব্লেম স্যার?'

রাসেল বলল, 'হ্যাঁ। একটু আগে আমাদের পরিচিত এক দম্পতি ঢুকেছেন এখানে, দেখতে পাচ্ছি না।'

'মহিলারা ওপরে—।'

'ও। আমরা যেতে পারি?'

'সিওর। আপনাদের পরিচিত যখন।'

দোতলায় উঠে এল ওরা। দরজা ঠেলতেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নীল আলোজ্বলা পরিবেশে কিছু নারী-পুরুষকে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল ওরা।

'আরে। আপনারা? আপনারা এখানে আসবেন বলেননি তো?'

গলা পেয়ে ওরা দেখল দত্তগুপ্ত কথা বলছেন। ওঁর টেবিলের উল্টোদিকে বিশাল চেহারায় এক প্রৌঢ়ের পাশে সুজলা বসে আছেন।

'আপনাদের এখানে ঢুকতে দেখে খিদে পেয়ে গেল।' রাসেল হেসে বলল।

উল্টোদিকের টেবিলে বসল ওরা। এইসময় বেয়ারা দত্তগুপ্তের টেবিলে মদ পরিবেশন করে গেল। সপ্তর্ষি দেখল দত্তগুপ্ত ঝটপট জল মিশিয়ে চুমুক দিয়ে চিয়ার্স বলে চেঁচিয়ে উঠল। সুজলার সামনে সাদা পানীয়। সেটি সে মুখের সামনে তুলে ধরল। মোটা লোকটা বাঁ-হাত নেড়ে সুজলার কাঁধের ওপর আলতো করে রাখল। ফর্সা বিশাল লোকটাকে দেখলে সাদা হাতি ছাড়া কিছুই মনে আসে না। ওরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো মদ খাবেন না?'

মাথা নাড়ল সপ্তম। নিজের জন্য হুইস্কি বলে রাসেল হাসল, 'মিসেস দত্তগুপ্ত ভাল ক্লায়েন্ট পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ওরকম চেহারা প্রচুর ফালতু টাকা না জমলে হয় না।'

'ভদ্রমহিলার কাজ হবে কিনা জানি না তবে ভদ্রলোকের কাজ হয়েছে।'

'কী রকম?'

'সন্ধের পর এই প্রথম পেটে মদ পড়ল। দেখুন, ওঁর মুখ কেমন উদ্ভাসিত।'

'আপনি বলতে চাইছেন উনি নিজের পয়সায় মদ খান না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। এর আগের দুদিন অনেক আগেই মাতাল হয়ে ছিলেন। রোজ সন্ধের পর এই এলাকায় ঘোরেন, বৌকে ডেকে আনেন ক্লায়েন্ট ধরিয়ে দিতে। তখন ক্লায়েন্টের পয়সায় ওর মদ খাওয়ার তৃষ্ণা মেটে। খানিকক্ষণ পরে দেখবেন ওর হুঁস নবুইভাগ থাকবে না।' সপ্তম বলল।

'আর মিসেস দত্তগুপ্ত?'

'তুখোড় মহিলা। জলে নামবেন কিন্তু বেণী ভিজাবেন না।'

রাসেল বেয়ারার এনে দেওয়া গ্লাসে জল মেশাল, 'ভাল বলেছেন।'

খাবার এল। ওদিকের টেবিলে তখন দত্তগুপ্ত তৃতীয় পেগে চলে গেছেন। মিসেস দত্তগুপ্ত অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে শ্বেতহস্তীকে অ্যামওয়ে বোঝাচ্ছেন। লোকটির একটি হাত তখন ভদ্রমহিলার কাঁধের ওপর, চোখ বন্ধ। খাওয়া শুরু করে সপ্তম বলল, 'এই লোকটা সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'নাঃ। ওই অর্ধশিক্ষিত মাস্তান টাইপের কেউ হবে।'

'এরকম লোককে ওরা নির্বাচন করবে কেন?'

'সেটা ঠিক। কিন্তু এই নির্বাচনের ব্যাপারটা স্রেফ ভাঁওতা নয়ত?' রাসেল নিজের মনে বলল।

'না। তাহলে ইমরান রহমানের পার্সে ওর নাম থাকত না।'

'তা ঠিক।'

'এই জনি লোকটা সম্পর্কে যদি কিছু জানা যেত তাহলে কাল কথা বলতে সুবিধে হত।' রাসেল হাসল, 'একটু আগে কথা হল, আপনি এয়ারপোর্টে গিয়ে জনি যা বলবে তা চুপচাপ শুনে আসবেন। সেই শোনা কথা সুভাষদাকে জানিয়েই দিয়েই আপনার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে। এখন আপনি যখন জনি সম্পর্কে জানতে চাইছেন তখন মনে হচ্ছে ভালভাবে ইনভলভ্ড হতে চাইছেন।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো। আমার কী দরকার ওর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার। সরি।'

ঠিক এইসময় দুটো লোক এসে দাঁড়াল পাশের টেবিলের সামনে। লোক দুটো অবাঙালি এবং বেশ রুক্ষ ধরনের। একজন বলল, 'বস। জলদি চলিয়ে।'

শ্বেতহস্তী চোখ খুলল, 'কিঁউ?'

'সাবির মার্ডার হো গ্যায়া।'

'সা-বি-র।' লোকটা সোজা হয়ে বসতে চাইল, টেবিল নড়ে উঠল। 'কৌন?'

'নয়া হিরো, হায়দার।'

'হায়দার? ইতনা হিম্মত?'

লোকটা বলল, 'ম্যাডাম, আপ উধার বৈঠিয়ে!'

বলামাত্র সুজলা দত্তগুপ্ত সুড়ৎ করে স্বামীর পাশে চলে গেলেন। লোকটা নিচু হয়ে শ্বেতহস্তীর কানে কানে কিছু বলল। লোকটা অবিশ্বাসী চোখে তাকালেও উঠে দাঁড়াল। তারপর কোনওমতে বেরিয়ে এল চেয়ার ছেড়ে।

এক পা হেঁটে দাঁড়াল শ্বেতহস্তী, 'সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ টু গো। ব্যারা।'

বেয়ারা ছুটে এসে সেলাম করল।

শ্বেতহস্তী বলল, 'ইনলোগকো দেখভাল করনা। মেরা গেস্ট।'

বেয়ারা মাথা নাড়তে ওরা বেরিয়ে গেল বার থেকে।

সপ্তম নিচু গলায় রাসেলকে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝেছেন?'

'না। কেমন টিউবলাইট হয়ে যাচ্ছি। আপনি কি বুঝলেন?'

'ওই হায়দারের নাম ইমরানের কাগজটায় ছিল।'

'হ্যাঁ, তাই তো। চারজনের একজন। জনি যেমন আমাদেব এলাকার, হায়দার—।'

'তার মানে ব্যাপারটা ভাঁওতা নয়।' সপ্তম বলল।

'হুম। এরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েই খুব করতে শুরু করেছে। বোধহয় ভয় পাওযাতে চাইছে।'

'আমি এর মধ্যে নেই, একদম নেই।' সপ্তম মাথা নাড়ল।

রাসেল কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল সুজলা দত্তগুপ্ত ইশারা করছেন। বুঝতে না পেয়ে রাসেল জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছেন?'

অতএব সুজলা উঠে এসে রাসেলের পাশে বসলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার ক্লায়েন্টের কোনও লোক খুন হয়েছে—খবর পেয়ে চলে গেল।'

'তার মানে? এই মোটকুটা করেনি? সুজলা জানতে চাইল।

'সেটা আপনার স্বামী বলতে পারবেন।'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওকে, বলল জানে না।'

'তাহলে এর সঙ্গে আলাপ হল কি করে?'

'এইরকম মদের টেবিলে, ওর ঠিক মনে নেই।'

'আপনার স্বামীকে বলুন মদ খাওয়া বন্ধ করতে।'

'শুনলে তো? এমন হাভাতে লোক আমি কখনও দেখিনি। দিনের বেলায় ঠিক থাকে, সন্ধে হয়ে গেলেই মদের গন্ধ পাওয়ার জন্য ছটফট করে। এই যে লোকটা চলে গেল, কোনও বিকার নেই, আবার আনিয়েছে।'

'বিনা পয়সায় যা পাওয়া যায়।' রাসেল হাসল।

'আমি বাবা এরকম লোকের সঙ্গে ব্যবসা করব না।' মাথা নাড়লেন সুজলা।

'না করাই উচিত।' সপ্তম বলল, 'আপনার কাঁধ ঠিক আছে?'

'কাঁধ?' বুঝতে পারলেন না সুজলা।

'আপনার কাঁধটাকে উনি হাতল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন।'

চোখমুখ ঘুরিয়ে হাসলেন সুজলা, 'সত্যি! ওই হাতের যা ওজন, আমার তো দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। কিন্তু শরীরে এত মেদের ঢেউ যে চেপ্টে গেলেও আমার তেমন লাগছিল না।'

সপ্তম বলল, 'এবার ওঠা যাক।' রাসেল বেয়ারাকে ডাকতেই সুজলা স্বামীকে ইশারা করলেন শেষ করতে। মিস্টার দত্তগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াই?'

'বাঃ। রাত হয়ে যাচ্ছে, ওদের গাড়িতে চলে যাওয়া যাবে।'

'নো। গাড়ি অনেক পাওয়া যাবে। তোমার মত সুন্দরী বৌ পাশে থাকলে অনেকেই এগিয়ে এসে লিফট দিতে চাইবে। কিন্তু এই মেজাজ কখনও পাব না। কি বলে গেল শুনলে না? আমি যা ইচ্ছে খেতে পারি। হ্যা হ্যা। একটা টাকাও লাগবে না, সব ওঁর অ্যাকাউন্টে যাবে। এবকম সুযোগ হাতছাড়া করতে বল না ডার্লিং।' লোকটি যাত্রা করার ঢঙে সংলাপ বলল!

রাসেল বলল, 'যান, স্বামীকে সামলান।'

'ঘেন্না ধরে গেল। তবু আমি বাঁধ বেঁধে আছি। যদি চাই এক মুহূর্তে সব ভাসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু দিনের বেলায় লোকটা এত ভাল হয়ে যায় তখন ভাল না বেসে পারা যায় না।' সুজলা উঠে গেলেন তাঁর স্বামীর কাছে।

হাতিবাগানে এসে গাড়ি থামিয়ে রাসেল বলল, 'তাহলে, কাল ভাল হোক।'

'জানি না কী হবে।'

'যোগাযোগ রাখবেন। গুড নাইট।' রাসেল চলে গেল।

রাত হয়েছে বেশ। রাস্তায় লোকজন এখন খুবই কম। চুপচাপ বাড়ি ফিরে এল সপ্তম। এসে দেখল এখনও আলো জ্বলছে। মা দরজা খুললেন। 'এত রাত হল?'

'হয়ে গেল।'

'খাবি না?'

'না।'

মা ফিরে যেতে যেতে দাঁড়ালেন, 'মাধবিকা নামে কে একজন তোকে ফোন করেছিল।'

নিজের ঘরে এল সপ্তম। এখন রাত সাড়ে এগারটা। নিশ্চয়ই কোনও বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ৃনার করে বাড়ি ফিরে মাধবিকা শুনেছে সে ফোন করেছিল। এত রাতে ওকে কি ফোন :বা উচিত? দ্বিধা কাটিয়ে বোতাম টিপল সে। রিঙ হচ্ছে। তৃতীয়বারেই ঘুম জড়ানো গলা ানে এল, 'হ্যালো।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' নরম গলায় প্রশ্ন করল সপ্তম।

'কে বলছেন?'

'ওঃ। তুমি। সপ্তম, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি যদি কাল সকালে তোমাকে ফোন রি তাহলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না?' মাধবিকা বলল।

'না, না, ঠিক আছে।'

'গুডনাইট।' রিসিভার নামিয়ে দিল মাধবিকা। একটু ধন্দে পড়ল সপ্তম। মাধবিকার লায় শুধুই ঘুম না পানীয়ের প্রতিক্রিয়া? কীরকম খারাপ হয়ে গেল মনটা।

ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। ভাঙামাত্রই মন পড়ল আজ দুপুরে যেতে হবে এয়ারপোর্টে। কানও নিস্তার নেই। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি শুরু হল। বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরোতেই ায়ের সঙ্গে দেখা। মা বললেন, 'আজ সকালে তোর ফোন এসেছিল।'

'কে?'

কালকের মেয়েটা। ঘুমুচ্ছিস শুনে তোকে ডাকতে নিষেধ করল।'

ঘড়ির দিকে তাকাল সপ্তম। নটা পঁচিশ। মাধবিকা নিশ্চয়ই অফিসের জন্যে বেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য। বাড়িতে ফোন বাজল অথচ তার ঘুম ভাঙল না। খবরের কাগজ তুলে দল সে। প্রথম পাতার নিচের দিকের খবর, 'কলকাতার মাস্তানরা আতঙ্কিত।'

সাধারণত যা করে না আজ তা করল সপ্তম। ওব সেরা প্যান্ট এবং রঙ মেলানো ার্টের সঙ্গে একমাত্র টাই-টা বেঁধে নিল গলায়। এই টাই দিয়েছিলেন জামাইবাবু। মাইবাবু নিজে টাই পরেন না. কেউ হয়ত উপহার দিয়েছিল, সেটা শালাকে দিয়ে দিয়েছেন। টাই বাঁধতে একটু সময় গেল আজ।

'তোর ইন্টারভিউ আছে?' মা এসে দাঁড়ালেন।

'তোমায় কে বলল!'

'এরকম সেজে এ সময় বেরুচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'এয়ারপোর্টে।'

শব্দটা শোনামাত্র মায়ের মুখে হাসি ফুটল। কাছে এসে বললেন, 'তোর জন্যে খুব চিন্তা হয় রে! এই যে সারাক্ষণ তোকে কথা শোনাই, ওই চিন্তা থেকে ভয় আসে বলেই। এই ঘুরে ঘুরে ব্যবসা বা দালালি করার থেকে এক জায়গায় চাকরি নিয়ে থিতু হয়ে বসা ঢের ভাল।'

কথাগুলো গিললো সপ্তম। সত্যি কথা বলার কোনও মানে হয় না। বরং মা যদি তাঁর কল্পিত ধারণা নিয়ে এই মুহূর্তে ভাল থাকেন ওঁকে তাই থাকতে দেওয়া উচিত।

এখন এগারটা। সপ্তম ভেবেছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। ট্যাক্সিতে এয়ারপোর্টে গেলে প্রায় শ'খানেক টাকা লাগবে। লাগুক। টাকাটা সুভাষদা দিয়েছেন সুভাষদার টাকা পকেটে রাখার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার পাড়ার মোড়ে কোনও ট্যাক্সি নেই। ছুটন্ত সব ট্যাক্সির মিটার নামানো। মিনিট পাঁচেক চাতকের মত চেয়ে থাকল সে। কোনও লাভ হল না। এখন দুটো উপায়। মেট্রো রেলে চেপে দমদম স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সির সন্ধান করা। তাতে কিছুটা পথ দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু ওই ঘিঞ্জি এলাকাটায় ট্যাক্সি না পেলে মুশকিল। আর ওখানকার ট্যাক্সিওয়ালারা চাইবে শহরের মধে ঢুকতে, বেরুতে নয়। অতএব দ্বিতীয় পথটাই সহজ। হাতিবাগানের মোড়ে চলে এসে শেয়ারের অটো খুঁজতে লাগল সে। কী আশ্চর্য! অটোগুলোও ভর্তি। এত লোক ভি আই পি রোড যাচ্ছে!

ঘড়ি দেখল সে। প্রায় সাড়ে এগার। ট্যাক্সি পেলে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছানো যাবে না পেলে? হঠাৎ খেয়াল হল সুভাষদা আজ সকালে তাকে ফোন করেননি। এ ছাড়া একট দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। সে যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছায়, জনির সঙ্গে কথা না বলতে পারে তা হলে তার কপালে যে কি নাচছে তা সে কল্পনাও করতে পারছে না। এ সময় শোভাবাজার থেকে আসা একটা অটোয চালকের বাঁ দিকের জায়গাটা খালি হওয়ায় সপ্তম লাফিয়ে উঠে পড়ল।

যে রাস্তায় অটোয় মিনিট সাতেক লাগে সেটা আজ কুড়ি মিনিটে পৌঁছলো। অটো থেকে নেমে ভি আই পি রোডের মোড়ে ছুটল সপ্তম। ওখানে গেলে ট্যাক্সি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হুস হুস গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। শেয়ারের ট্যাক্সিগুলো লোক ডাকছে যার কোনওটাই এয়ারপোর্ট চত্বরে ঢুকবে না। বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর একটা প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার পাশে এসে দাঁড়াল, 'কোথায় যাবেন?'

'এয়ারপোর্ট।'

'পঞ্চাশ দেবেন?'

'ডোমেস্টিকে নামাবেন?'

'আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

পেছনের দরজা খুলতে যাচ্ছিল সপ্তম। ড্রাইভার বলল, 'সামনে বসুন। আপনি পেছনে বসলে যে কেউ ভাববে গাড়িটা আপনার। আর মালিকের পরিচিত কেউ দেখলে আমার চাকরি খতম হবে।'

'সামনে বসলে সেটা হবে না?' সপ্তম সামনে উঠে বসল।

মাথা নাড়ল লোকটা, 'না। বলব একা যাচ্ছিলাম তাই এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

সপ্তম লোকটার দিকে তাকাল। ওর পরনে ড্রাইভারদের উর্দি, একটু ময়লা হয়েছে আর সে টাই পরা সুদর্শন নবীন যুবক। বাইরে থেকে দেখে কেউ তাকে ড্রাইভারের বন্ধু বলে ভুল করবে? প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। অর্ধেক টাকায় একেবারে খোদ জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছে ঠিক সময়ে, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

সপ্তম দেখল গাড়িটা চলেছে ভি আই পি রোডের বাঁ ধার ঘেষে এবং যাবতীয় গাড়ি ওদের ওভারটেক করে সোঁ সোঁ শব্দ ছুটে যাচ্ছে। লেকটাউনের কাছে এসে সে না বলে পারল না, 'আপনার গাড়ি কি স্পিড নেয় না?'

'নেবে না কেন। জোরে গাড়ি চালাতে মালিকের নিষেধ আছে।'

'আপনার মালিক কি দেখতে পাবেন?'

'একি বলছেন আপনি? গতির চেয়ে জীবন দামি, তা জানেন না? আমার মালিক লেছেন, জোরে চালিয়ে তুমি হয়ত মিনিট পাঁচেক আগে পৌঁছবে কিন্তু তার জন্যে তামার জীবন চলে যেতে পারে। যে ধীরে এবং ঠিকঠাক যায় সে-ই লাভবান হয়।' াইভার বলল।

খুব রাগ হয়ে গেল সপ্তমের। শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল, 'তা আপনি যে আমার াছ থেকে টাকা নেবেন, এক আধটা নয়, পঞ্চাশ টাকা, এ ব্যাপারে মালিক কী বলেছেন?'

'দেখুন, আমি অমার মালিককে ঠকাচ্ছি না। তাঁর তেল পুড়িয়ে আপনাকে অন্য কাথাও পৌঁছে দিয়ে টাকা কামাচ্ছি না। ওঁকে আনতে আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে হচ্ছে। সই যাওয়ার পথে আপনার উপকার করে দিচ্ছি বলে আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন। মন কি যে সিটে উনি বসেন সেখানেও আপনাকে বসতে দিইনি আমি। ঠিক কিনা?' ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

'আপনার মালিক কী করেন?'

'ব্যবসা।'

'কীসের ব্যবসা?'

'এত আমি জানি না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আমি চাই না।'

গাড়ি ভি আই পি রোড ছেড়ে এয়ারপোর্টের রাস্তায় ঢুকল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর যখন কয়েক মিটার মধ্যে তখন হঠাৎ পুলিসের গাড়ি রাস্তা আটকালো। একজন অফিসার দ্রুত এগিয়ে এসে হুকুম করলেন, 'অ্যাই নেমে আয়।'

'কী হয়েছে স্যার?' ড্রাইভার অবাক।

'সেটা থানায় গিয়ে শুনবি। এ কে?' অফিসার সপ্তমের দিকে তাকাল।

'আমার এয়ারপোর্টে কাজ আছে। ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না, ইনি লিফট দিচ্ছেন।'

'ও সব থানায় গিয়ে বলবেন। নামুন।'

গাড়ি থেকে নেমে সপ্তম অফিসারের কাছে গেল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'এর মালিককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। লোকটা বিশাল বেআইনি জুয়ার বুক চালাত। ম্ব-দিল্লি হাতের মুঠোয়। বোম্বের ফ্লাইটে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তো এদের সঙ্গে জড়িত নই।'

'সেটা থানায় গিয়ে বলবেন।'

'অফিসার। আমি নির্দোষ। সুভাষদার কাজে আমি এসেছি।'

'সুভাষদা?'

সপ্তম পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক নড়ে উঠলেন, 'কী নাম আপনার?'

'সপ্তম চ্যাটার্জি।'

'ঠিক আছে। আপনি চলে যান।'

সপ্তম আর দাঁড়াল না। দ্রুত হাঁটতে লাগল সে এয়ারপোর্টে পৌঁছনোর জন্যে।

থাক টাকা থাক। এই টাকা আমার নয়। ভেতরে ঢোকার টিকিট কাটার সময় মনে মনে বলল সপ্তম। তারপরে চারপাশে তাকাল। না, কোনও চেনা মানুষ নেই।

আজ খুব কপাল ভাল তাই সুভাষদার নামেই কাজ হয়ে গেল। নইলে কোনও এক আন্তর্জাতিক জুয়ারির গাড়িতে বসে থাকার জন্যে তাকে থানায় এবং শেষে হাজতে যেতে হত। যে জুয়োখেলার ব্যবসা পরিচালনা করে তাকেও নিশ্চয়ই জুয়ারি বলা যায়, অথচ ড্রাইভারের কাছে লোকটা সম্পর্কে যে সব তথ্য সে শুনতে বাধ্য হয়েছিল তার সঙ্গে পুলিসের ধরা অপরাধীর কোনও মিল থাকতে পারে না। যে লোকটা বেঁচে থাকতে পছন্দ করে বলে গাড়ি ধীরে চালাতে বাধ্য করেছে ড্রাইভারকে, সে অন্যদিকে এতটা বেপরোয়া হয় কী করে। এই হিসাবটা বোধহয় কোনওদিন মিলবে না। কিন্তু পুলিস আজ হঠাৎই ওর ব্যবসার কথা জানতে পেরে গ্রেপ্তার করল? এতদিন জানতে পারেনি? তাকি হয়?

এয়ারপোর্টের ভেতর ঢুকল সপ্তম। বাঁদিকের ঘেরাটোপ ডিঙোতে প্লেনের টিকিট থাকা দরকার। সে সোজা সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মিষ্টি বাজনা কানে এল। পার্ক স্ট্রিটের যে কোনও দামি রেস্তরাঁর চেয়ে পরিবেশ খারাপ নয়। চারপাশে তাকিয়ে একটা কোনায় চলে এল সে। আরাম করে বসে লক্ষ্য করল কেউ তাকে দেখছে কিনা? এত বড় রেস্টুরেন্টে এই সময় মাত্র জনা ছয়েক লোক বসে। সম্ভবত এখন কোনও বিমান ছাড়ছে না। এই ছয়জন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, তাকে নিয়ে ওদের কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

এই সময় সে লোকটাকে দেখতে পেল। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে চারপাশে তাকাচ্ছে। তারপর তাকে দেখতে পেয়ে সোজা এগিয়ে এল, 'আমার যদি খুব ভুল না হয়, কী যেন নাম---?'

'সপ্তম।'

'ইয়েস। সপ্তম। আমাকে চিনতে পারা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। সুভাষদার ওখানে দেখেছি।'

'গুড। পৃথিবীতে এত চেনা মুখ যে সব মুখ মনে রাখা মুশকিল।'

'আপনাকে দেখলে মনে থাকবে।'

'কেন? হোয়াই?'

'আপনাকে অনেকটা কমল মিত্রের মত দেখতে।'

'কমল মিত্র? রিটায়ার্ড ডি সি?'

'না, অভিনেতা।'

'ও হো। থ্যাঙ্ক ইউ। চলুন।'

'কোথায়?'

'সামনেই। গাড়ির মধ্যে বসে কথা বলবেন।'

'না তো। সুভাষদা আমাকে বলেছিলেন রেস্টুরেন্টেই কথা বলতে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক মোবাইলের বোতাম টিপলেন। ফিস ফিস করে কিছু বলে যন্ত্রা এগিয়ে ধরলেন সপ্তমের দিকে। 'হ্যালো' বলা মাত্র সপ্তম শুনতে পেল সুভাষদার গল 'যা বলছে তাই কর।' তারপরেই মোবাইলের স্ক্রিনে কল এডেড লেখাটা ফুটে উঠল।

যন্ত্রটা ফেরত দিয়ে লোকটিকে অনুসরণ করল সপ্তম। এঁকে সুভাষদা অফিসার ব ডাকছিলেন। লোকটা কী ধরনের এবং কোথাকার অফিসার তা জানে না সপ্তম।

সটান এয়ারপোর্টের বাইরে চলে এলেন অফিসার। আশপাশে তাকিয়ে ইশারা করলেন সপ্তমকে। ওরা যখন গাড়ির রাস্তা পার হয়ে পার্কিং-এর দিকে যাচ্ছে তখন উল্টোদিক থেকে আসা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। 'গুড আফটারনুন স্যার।'

অফিসার মাথা নাড়লেন, 'পরে ফোন করবেন, এখন ব্যস্ত আছি।'

'কিন্তু স্যার, আমার কাজটা হয়নি।'

'বললাম তো পরে ফোন করবেন।' অফিসার আর দাঁড়ালেন না। পার্কিং-এর কাছে এসে সপ্তমকে বললেন, 'সোজা এগিয়ে যান ভাই। মিস্টার জনির ড্রাইভার আপনাকে খুঁজে নেবে।'

'তার মানে বুঝলাম না!'

'বাঙালিদের এই হল মহা দোষ। ইশারায় বুঝতে পারে না। মিস্টার জনি নিরাপত্তার কারণে গাড়িতে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। যান। এগোন।' অফিসার বেশ জোরে বললেন।

বলির পাঁঠা আজকাল বেশি দেখা যায় না। দেখতে চাইলে ধর্মস্থানে যেতে হয়। কিন্তু খাঁচা থেকে মুরগি বের করে জবাই করতে দু'চার পা হাঁটলেই দেখা যায়। নিজেকে মুরগি বলে মনে হচ্ছিল তার। নিজের ওপরই রাগ বাড়ছিল।

দু'পাশে গাড়ির সারি। ড্রাইভাররা এদিক-ওদিকে। উড়ে আসা যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'স্যার।'

সপ্তম লোকটাকে দেখল। পরনে ড্রাইভারের পোশাক। নেপালি। সপ্তম মাথা নাড়ল।

'আপ কিসিসে মিলনে মাংতা?'

'হ্যাঁ।'

'কৌন ভেজা?'

'সুভাষদা।'

'আইয়ে।'

লোকটি তাকে নিয়ে গেল একেবারে পেছনের গাড়ির সারির শেষ প্রান্তে। সেখানে একটা সুমো দাঁড়িয়ে আছে। কাছে পৌঁছানো মাত্র দুটো লোক সুমো থেকে বেরিয়ে এসে সপ্তমের কোমর, প্যান্টের পকেট ইত্যাদিতে হাত দিয়ে দেখে নিল কোনও অস্ত্র আছে কিনা। তারপর দরজার দিকে ইশারা করল। 'যাইয়ে।'

খুব অপ্রস্তুত বোধ করল সপ্তম। এই রকম অভ্যর্থনার কথা সে মোটেই ভাবেনি। তবু সুমোতে উঠতে হল। এবং ওঠার সময় শুনতে পেল, 'ওয়েলকাম।'

সুমো বড় গাড়ি। তার দ্বিতীয় আসনের কোণে বসে আছেন জনি। পরনে কাবুলি পাঞ্জাবি এবং চোস্ত। দাঁতের তলায় কিছু একটা আছে, চোয়াল নড়ছে।

'বসুন।'

সপ্তম বসল। টনি বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার ছিল না। আমি সুভাষবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তা তিনি বড় মাপের নেতা, অনেক ক্ষমতা, আমার মত সামান্য মানুষের সঙ্গে নিজে কথা বলতে চাননি, আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমিও বলতে পারতাম ভায়া মিডিয়া কথা বলব না। ব্যাস, খতম হয়ে যেত মিটিং।'

জনি পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে কিছু মুখে ঢাললো, 'তারপর ভাবলাম, খতম হয়ে যাওয়া মানে তো লড়াই শুরু হওয়া। আজকাল লড়াই মানে বেশ কিছু জান খতম হওয়া। আপনার কী মনে হয় আমি ভুল বলছি?'

'না-না।' মাথা নাড়ল সপ্তম।'

'গুড। আপনার নাম সপ্তম চ্যাটার্জি।

ব্রাহ্মণ?'

'হ্যাঁ।' সপ্তম বলল, 'আমি অবশ্য এ সব...! যাকগে, আপনি আমাকে যা বলার বলতে পারেন!

'আরে! বলার তো একটাই কথা। সুভাষবাবু অনেকদিন ধরে যা ভোগ করে এসেছেন, এখন থেকে আমি সেগুলো দেখাশোনা করব। উনি মাস্তান, গুণ্ডা, মাফিয়া নন। আবার রাজনৈতিক নেতাও নন। তবু কী আশ্চর্য কারণে ক্ষমতা দখল করে বসে আছেন। লোকে ভাল মানুষ বলে। আপনার কী মনে হয় আমি ভুল বলছি? জনি জিজ্ঞাসা করল।

'আমি ঠিক জানি না—।'

'মিথ্যে কথা। অবশ্য আপনি মিথ্যে কথা বলতে ভালবাসেন বলে জেনেছি।'

'আমি?'

'কাল যখন শুনলাম আপনি আসবেন সুভাষবাবুর হয়ে তখন আপনার পরিচয় জানতে চাইলাম। ছেড়ে দিন ওসব কথা। ভি আই পি রোডের দু'পাশে যে এগারজন প্রমোটর আছেন, তাঁদের নিয়ে আমি মিটিং করব। খবরটা সুভাষদকে জানিয়ে দেবেন।'

'বেশ।' মাথা নাড়ল সপ্তম।

'সুভাষবাবু যেন এঁদের কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা না করেন।'

'বলে দেব।'

'সল্টলেক থেকে লেকটাউন, বাঙ্গুর, আবার ওদিকে যতগুলো ভেড়ি আছে তার সবগুলো থেকে ওকে হাত তুলে নিতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ঠিক আছে।'

'ওকে বলবেন এই আমি একা নই। আমাকেও কারও নির্দেশে কাজ করতে হচ্ছে।'

'নাম জিজ্ঞাসা করলে কী বলব?'

'কার নাম?'

'ওই যে, যাঁর নির্দেশে আপনি কাজ করছেন?'

জনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ভগবান কোথায় থাকেন?'

'অ্যাঁ?'

'আপনার ভগবান তো মাথার ওপরে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'মুখ তুলে তাঁকে দেখতে পান?'

'না।'

'ব্যাস। এটাই উত্তর। ওই এগারজন প্রমোটারের মধ্যে কতজনের সঙ্গে আপনার আলাপ?'

'আমি, মানে, ও হো, হ্যাঁ, একজনকে চিনি। রাসেল।'

'রাসেল মিঃ সুভাষবাবুর সঙ্গে কাজ করে খুশি?'

'আমাব সঙ্গে ব্যবসার কথা বলেনি।'

'আপনি রাসেলকে বলবেন যে আমি দু'হাতে নেওয়ার লোক নই। এক হাতে যেমন নেব তেমনি অন্য হাতে দেব। বরং আমার সঙ্গে থাকলে ওঁরা নিরাপদে থাকবেন।'

'বলব। তা হলে—'

'হ্যাঁ। আপনি যেতে পারেন। সুভাষবাবুকে বললেন, রাস্তায় যে পাথরের টুকরো পড়ে থাকে তার দিকে তাকাবার প্রয়োজন হয় না। টুকরোটা যদি জুতোর মধ্যে ঢুকে যায় তা হলে সেটাকে বের করে ছুঁড়ে ফেলতে হয়। উনি ওঁর সব কাজকর্ম আজই বন্ধ করুন।' মাথা নেড়ে নামতে যাচ্ছিল সপ্তম। জনি ডাকল, 'সপ্তমবাবু।'

সপ্তম তাকাল। জনি বলল, 'ইমরান ভাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

'ইমরান ভাই?' সপ্তম অবাক।

'যাঁর পার্স আপনি ট্যাক্সিতে খুঁজে পেয়েছিলেন—।'

'ও! কিন্তু তিনি তো—।'

'এখন বাইরে আছেন। আপনি রশিদভাই-এর সঙ্গে দেখা করুন।'

'আপনি এ সব কথা জানলেন কী করে?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল জনি। যেন সে কিছুই জানে না। তারপর বলল, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমি দু'ভাগে ভাগ করি। এক বন্ধু, দুই শত্রু। আপনি সুভাষবাবুর চামচাগিরি ছেড়ে দিন। আপনাকে আমরা বন্ধু বলে ভাবার চেষ্টা করব। আসুন।'

হন হন করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল সপ্তম। এখানে আসার আগে সে স্থির করেছিল, এই শেষ, এদের সঙ্গে, সুভাষদার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না। না, তাকে পালাতে হবে।

প্রিপেইড কাউন্টার থেকে ট্যাক্সি না নিলে এয়ারপোর্টে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। দাঁড়ানো ট্যাক্সিওয়ালারা মোটা লাভ করার চেষ্টা করে। সপ্তম ভাবছিল, এখন কোথায় যাবে? সুভাষদা কালকের জায়গায় থাকবেন এমন কথা বলেছিলেন কিনা মনে পড়ছিল না। এই সময় সে মাধবিকাকে দেখতে পেল। পার্কিং এলাকা থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে আসছে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে মাধবিকা হাত ...। কাছে এসে খুশি খুশি মুখ নিয়ে বলল, 'তুমি'?

'দাঁড়িয়ে আছি।' সপ্তম হাসল।

'আমার জন্যে? আশ্চর্য! তুমি কি করে জানলে এই সময় আমি এয়ারপোর্টে আসব?' ... করার সময় ওর মুখে বেশ তৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট হল, দেখতে পেল সপ্তম।

'স্বপ্নে।'

'মানে?' মাথা কাত করে তাকাল মাধবিকা।

'কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ তোমায় দেখতে পেলাম।'

'উঃ। বেশ শুরু করেছিলে, এবার আকাশ থেকে ফেলে দিলে।' মুখ ভার মাধবিকার।

'মানে?'

'আর একটু মিথ্যে বললে কী এমন অসুবিধে হত? বলতে পারতে ঠিক ভোরের মু
তুমি স্বপ্ন দেখেছ আমি তোমার জন্যে ঠিক এইখানে অপেক্ষা করছি। আর দেখামাত্র সে
ভোরে ছুটে এসেছ তুমি, এসে এই দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করছ।' মাধবিকা মাথা নাড়
হতাশ ভঙ্গিতে।

'ইস। বুঝতে পারিনি। পারলেও বলতে পারতাম কিনা সন্দেহ।' সপ্তম বলল।

'কেন?' ভ্রু তুলল মাধবিকা।

'মিথ্যে কথা বেশিক্ষণ জিভ বরদাস্ত করতে পারে না।'

'রাবিশ।' মাধবিকা হেসে ফেলল, 'কাজ শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'চলে যাচ্ছ?'

'থেকে কী করব? এয়ারপোর্টে বেশিক্ষণ থাকলে মন খারাপ হয়ে যায়।'

'সেকি! কেন?'

'এই যে অনবরত বলছে অমুক ফ্লাইট অমুক জায়গায় যাচ্ছে, দেশের মধ্যে এব
বিদেশে, অথচ আমি কোথাও যেতে পারছি না, ভাল লাগে?'

'চল।'

'কোথায়?'

'আমার বস্ এসেছে এখানে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

'কী আশ্চর্য! তোমার বসকে আমি কী বলব?'

'কিস্যু বলবে না। শুধু মিষ্টি করে হাসবে।'

'বাজে বকো না।'

'উহুঁ! তুমি জান না। তোমার হাসি প্রায় উত্তমকুমারের মত।' মাধবিকা বলল। সপ্ত
চারপাশে তাকাল। সব কিছু স্বাভাবিক। কিন্তু সে নিশ্চত তাকে কেউ না কেউ লক্ষ
করছে। হয় সুভাষদার লোক নয় জনির। এখন সুভাষদার কাছে না গিয়ে মাধবিকার সঙ্গে
যাওয়া উচিত কাজ হবে না। সুভাষদার কানে খবর তুলে দেওয়াই ওর প্রথম কাজ হওয়া
উচিত। মনে মনে বিদ্রোহ জমছিল, এখন সেটাই মাথা তুলল। সপ্তম স্থির করল, সে যখ
কারও কেনা গোলাম নয় তাই আধঘন্টা বাদে যাওয়ার স্বাধীনতা তার নিশ্চয়ই আছে। সে
মাধবিকাকে অনুসরণ করল।

টিকিট কেটে যে দরজা দিয়ে ভেতরে যাত্রীদের সঙ্গীরা ভেতরে ঢোকে সেদিক দিয়ে
নয়, মাধবিকা সপ্তমকে নিয়ে এল এয়ারপোর্ট কাস্টমসের অফিসে। তাদের এক ক্লায়েন্ট
গতকাল আমেরিকা থেকে এসেছেন। ভদ্রমহিলা চারটে সোনার বালা নিয়ে এসেছিলেন—
এক একটার ওজন তিন ভরি। সাকুল্যে ষাট হাজার টাকার নিচে দাম। তিনি ওই বালাগুলো
পরে গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। কাস্টমস অফিসার তাঁকে আটকায়
ভদ্রমহিলার সঙ্গে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনা দু বোতল হুইস্কি ছিল। প্রথমে সে
চাওয়া হয়। তিনি দিতে অস্বীকার করলে ওঁর একটা বোতল এবং সোনার বালাগুলো সিজ
করে তাঁকে ছেড়ে দেয় ওরা। মাধবিকার বস্ তাঁর ক্লায়েন্টের পক্ষে কথা বলতে
এয়ারপোর্ট এসেছেন।

ওরা যে টেবিলে বসে কথা বলছিলেন তার কাছাকাছি পৌঁছে সপ্তম শুনতে পেল, মাধবিকার বস্ বলছেন, 'ঠিকই। উনি দুটো মদের বোতল আনতে পারেন না। অবশ্য আমি জানি না একটি বোতলের মুখ খোলা ছিল কিনা। যাকগে, চারটে সোনার বালা উনি পরে এসেছেন, আপনারা যে কোনও যাত্রীকে যে পরিমাণ টাকার জিনিস বিদেশ থেকে আনার শুল্কবহির্ভূত অনুমতি দিয়েছেন তাতে ওই বালাগুলো তো স্বচ্ছন্দে ছাড় পেয়ে যায়। তাই না?'

অফিসার বললেন, 'ঠিক। কিন্তু স্যার, ওঁর দুটো স্যুটকেসে এত গিফট আইটেম ছিল যে স্ট্যাটুটারি ছাড় তাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

'কি কি জিনিস ছিল?'

'পারফিউম, জামাকাপড়, কসমেটিক্স—।'

'ওহো। জিনিসগুলোর নাম এবং দাম নিশ্চয়ই আপনারা নোট করেছেন!' অফিসার মাথা নাড়লেন, 'ওগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে নোট করা হয়নি।' 'আই সি। কিন্তু অফিসার, ওর স্যুটকেসে পারফিউম বা কসমেটিক্স ছিল না। নিজের ব্যবহৃত জামাকাপড় স্যুটকেসে ভরে নিয়ে এসেছিলেন তিনি যার কোনও দাম ধরা হয় না। তাহলে দাঁড়াল, ওই সোনার চারটে বালা উনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে আসতে পারেন। আপনাদের বন্ধুরা অকারণে ওকে হেনস্তা করেছেন। আপনারা জানেন, আমি এয়ারপোর্টে আসতে চাই না। মাধবিকা আসে। এই ক্লায়েন্ট খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। তাই আমাকে আসতে হল।' ভদ্রলোক বললেন।

অফিসার উঠে যেতে মাধবিকা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কী দারুণ বললেন আপনি!'

'ও তুমি! এসে গেছ! মনে হয় এখন তুমি হ্যান্ডেল করতে পারবে, আমি যাচ্ছি। ক্লায়েন্ট কোথায়?'

'আমি দেখতে পাইনি।'

'ওয়েট টিল শি কামস। চলি!' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

'স্যার।'

'ইয়েস!'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে চাই।'

'হু ইজ হি?'

মাধবিকা পরিচয় করিয়ে দিল, 'সপ্তম। আমরা একসময় সহপাঠী ছিলাম।'

'আলাপ করে ভাল লাগল।' বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকালেন।

'সপ্তম ওর প্রফেসন চেঞ্জ করতে চায়। আপনি যদি ওর সঙ্গে কথা বলেন—!'

মাধবিকা বলল। ভদ্রলোক সপ্তমকে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে পরে ওঁর ব্যাপারে কথা বলব। আচ্ছা, চলি।'

ভদ্রলোক চলে গেলে সপ্তম বলল, 'মনে হচ্ছে আমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি।'

কিন্তু মাধবিকা উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেল না। এক ভদ্রমহিলা, প্যান্ট এবং টি শার্ট পরা, কাঁধে ব্যাগ দ্রুত এগিয়ে এলেন মাধবিকার সামনে, 'কি বলছে ওরা'

মাধবিকা বলল, 'আপনার ব্যাপরটা নিয়ে কথা বলতে স্যার নিজে এসেছিলেন, মনে হচ্ছে আর কোনও সমস্যা হবে না।'

'বাট হোয়াই? কেন আমাকে ওরা হ্যারাস করল? আই মাস্ট গেট দ্যাট এক্সপ্লানেশন।'

'আমি খুবই দুঃখিত মিসেস রায়। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' বলে ঘুরে দাঁড়াল মাধবিকা, 'সপ্তম, তুমি কি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে পারবে? আমি অবশ্য বেশি চাপ দিচ্ছি।'

না মাধবিকা, তার মধ্যেই আমাকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে।'

'দেন ডু ওয়ান থিংগ। তুমি আমাকে বিকেলে ফোন করো। মোবাইলে।' ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের কবে এগিয়ে দিল সে, 'আমার মোবাইল নাম্বার বদলে গেছে।'

'ঠিক আছে।'

সপ্তম বেরিয়ে এল। খানিকটা এগোতেই মারুতি ভ্যানটা এসে পাশে দাঁড়াল। রাসেলের গলা কানে এল, 'চটপট উঠে পড়ুন।'

'আরে! আপনি? এখানে?' খোলা দরজা দিয়ে শরীর গলিয়ে দিল সে।

'আপনার দেখছি ভাগ্য বেশ ভাল।'

'কী রকম?'

'এখানে এসেও খুব সুন্দরী একজন মহিলার সঙ্গ পেয়ে গেলেন।'

'ও। আমরা কলেজে সহপাঠী ছিলাম।'

'তারপর গেলেন তো গেলেন, আমি ভাবছিলাম আর অপেক্ষা করে কোনও লাভ নেই।'

'আপনি কখন এসেছেন?'

'আপনি এয়ারপোর্টে পা দেওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে।'

'সে কী!'

'জনি এয়ারপোর্টে ঢোকেনি। আপনি হন্তদন্ত হয়ে গেলেন। একটু বাদে অফিসারকে যেতে দেখলাম। তারপর লোকটার সঙ্গে আপনি বেরিয়ে এলেন। আপনাকে পার্কিংয়ে পাঠিয়ে লোকটা কী করল জানেন? রাসেল জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল সপ্তম, না।

'ট্যাক্সির লাইনে এসে মোবাইলে কাউকে ফোন করল। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আপনি বোধহয় পার্কিং-এর পার্ক করা কোনও গাড়িতে করে চলে গেছেন। কিন্তু ধন্দটা বেশিক্ষণ ছিল না। সুভাষদার দুজন লোককে দেখলাম পার্কিং-এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তখনই বুঝলাম আপনি ওখানে আছেন। তারপর তো একাই বেরিয়ে এলেন।'

'সুভাষদা এখানে লোক পাঠিয়েছে কেন?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা নিয়ম।'

'নিয়মটা কেন?'

'আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।' রাসেল হাসল, 'যাক গে, জনির সঙ্গে আপনার কথাবার্তা খোলা আকাশের নিচে হল?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি ততক্ষণে এয়ারপোর্ট চত্বর থেকে বেরিয়ে ভি আই পি রোডের কাছে এসে গেছে। সপ্তম বলল, 'রাসেল, আপনাদের বস বদল হচ্ছে।'

'তাই? কী আর হবে? হয় গরম তেল নয় উনুনের আগুন!' রাসেল বলল, 'কিছু করার নেই। যা ঘটবে তা মানতে হবে।'

সপ্তম রাসেলের দিকে তাকাল। সরকার বদল হলে বা না-হলে সাধারণ মানুষকে এইভাবেই মেনে নিতে হয়। কিছুক্ষণ চালাবার পর রাসেল জিজ্ঞাসা করত,' আপনি তো এখন সুভাষদার কাছেই যাবেন?'

'হ্যাঁ। রিপোর্ট দিলেই আমার কাজ শেষ।' সপ্তম বলল।

'ব্যাপারটা যদি অত সহজ হয় আমি খুব খুশি হব।'

'তার মানে?'

'এই মিটিং-এর পর আপনার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে সপ্তম। এখন জনি আপনাকে চেনে, সুভাষদা তো বটেই, হয় তো পুলিসের রেকর্ডেও আপনার নাম উঠে গেছে।'

'পুলিসের রেকর্ডে?'

পুলিসকে তো অত বোকা ভাবার কারণ নেই। হঠাৎ শহরে মাস্তানরাজের পালাবদল হচ্ছে আর তাঁরা খোঁজখবর রাখবেন না তা কি হয়? জনির ওপর নিশ্চয়ই তাঁরা একটা চোখ রাখছেন। আর আপনি জনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এমন হতে পারে ওই অফিসারই এই খবর দিয়েছেন।'

সপ্তমের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে একবার ভাবল রাসেলকে বিশ্বাস করা যায়। অন্তত এখন পর্যন্ত রাসেল তাকে সাহায্য করে গেছে। কিন্তু রশিদের ব্যাপারটা বলা কি ঠিক হবে। তা ছাড়া সে আর এ সবের মধ্যে আর থাকতেই চাইছে না। বিকেলবেলায় মাধবিকাকে ফোন করে বলবে তাকে যদি ওর বস্ কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেন তা হলে খুব ভাল হয়।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সুভাষদার প্রতি অনুগত থাকবেন?'

'বুঝলাম না।'

'জনি এবং সুভাষদার ধন্দে আপনি কোন পক্ষ নেবেন?'

রাসেল হাসল, জবাব দেব না।

'সুভাষদার বিরুদ্ধে আপনার তো অভিযোগ আছে?'

'প্রচুর।'

'যে এগারজন প্রমোটরের কথা বলা হচ্ছে—তাদের কজন আপনার মতে মত ন?'

'সবাই।'

'তাহলে?'

'ওই তো প্রথমেই বললাম, যার হাতে ক্ষমতা থাকবে আমরা তার দলে। যদি জনি ক্ষমতায় আসে তা হলে তার বিরুদ্ধেও মনে অভিযোগ জমবে। কিন্তু এখনকার মত তখনও গুলো হজম করে থাকতে হবে।'

রাসেল এবার গম্ভীর গলায় বলল। 'আপনি জনির সঙ্গে দেখা করবেন?

'এখনই নয়, আরও চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বলতে পারব।'

'কেন?'

'হাওয়া বদলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঙ্গিত মানেই শেষ পর্যন্ত সেটা সত্যি হবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন না। আজ ভোরে স্টেডিয়ামের কাছ থেকে পুলিস চারজনকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে মৃত অবস্থায় পেয়েছে। এই চারজনের নাম পুলিসের খাতায় ছিল, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভোরের একটু আগে উড়ো ফোনে পুলিস জানতে পারে ওরা কোথায় আছে। কিন্তু পৌঁছবার আগেই—।' মাথা নাড়ল রাসেল, 'এরা সুভাষদার হয়ে কাজ করত। বুঝতেই পারছেন। যাক গে। এসে গেছি।' গাড়ি ভি আই পি রোড থেকে নিচে নামল রাসেল।

গাড়ি থামিয়ে রাসেলকে নামতে দেখে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'হ্যাঁ। কেন? আপনার আপত্তি আছে?'

'না-না। কিন্তু সুভাষদা তো জানতে চাইবেন কোথায় দেখা হল—?'

'না চাইবেন না। কারণ সুভাষদাই আমাকে ফোন করে বলেছেন এয়ারপোর্টের বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে। তেমন কিছু হলে ওঁকে খবর দিতে।' রাসেল হাঁটা শুরু করল।

'কী আশ্চর্য! আপনি কথাটা বলেননি!'

অবাক হল সপ্তম।

'তার মানে?'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজে থেকে আমার জন্যে গিয়েছেন!'

রাসেল জবাব দিল না। কিন্তু মন খিঁচড়ে গেল সপ্তমের। তা হলে মুখে যাই বলুক রাসেল আদপে সুভাষদারই লোক। অথচ—! এলাকাটা একই কিন্তু যে বাড়িতে আগের দিন সুভাষদা ছিলেন আজ সেই বাড়িতে তাকে নিয়ে গেল না রাসেল। চারতলা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে সুভাষদা এমন ভঙ্গিতে বসেছিলেন যেন ওটা তাঁরই জায়গা। বললেন 'এসো। বসো।'

রাসেল অন্যদিকে চলে যেতে সুভাষদার সামনে বসল সপ্তম।

'কোনও গোলমাল করেনি তো?'

'না।'

'কী কী ঘটেছে এবং বলেছে তা ডিটেলসে বলো।' অতএব এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট থেকে অফিসারের সঙ্গে বের হওয়া থেকে জনির সঙ্গে কথা শেষ করা পর্যন্ত যা যা হয়েছিল এবং শুনেছিল তা খুলে বলল সপ্তম। শুধু জনি রশিদের এবং ইমরান রহমানের প্রসঙ্গে যা বলেছিল তা উচ্চারণ করল না।

সুভাষদা হাসলেন, 'বাঃ। খুব ভাল প্রস্তাব। তুমি ওকে বলে এলে না কেন সুভাষ গুণ্ডামস্তান নয়, আপনি স্বচ্ছন্দে যা খুশি করতে পারেন, তিনি বাধা দেবেন না।'

অবাক হয়ে তাকাল সপ্তম, 'আপনি ওকে জায়গা ছেড়ে দেবেন?'

'তোমার মত অকালকুষ্মাণ্ডদের সংখ্যা যে এত বেড়ে গেছে তা আগে জানতাম না। আজ যখন বুঝতে পারছি, তখন সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াই ভাল।'

'আমি!'

'আমি আমি করো না। একটা ফালতু লোক তোমার সামনে বসে আমাকে শাসালো আর তুমি তা মুখ বুঁজে শুনে এলে? ওয়ার্থলেস।' মুখ বিকৃত করলেন সুভাষদা।

'কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন লোকটা যা বলবে তা চুপচাপ শুনে আসতে।'

'আমি বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ। রাসেল ছিলেন, ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'আমি কি বলেছি তা রাসেলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে? আর হ্যাঁ যদি বলেও থাকি তা হলে নিশ্চয়ই বলিনি কেউ তোমাকে লাথিঘুষি মারলেও চুপচাপ ফিরে আসবে।'

'না। তা বলেননি।'

'তবে? কাল থেকে একটার পর একটা খুন করে চলেছে ওরা! ভেবেছে কী! আমার হাতে কোনও শক্তি নেই?' এই সময় টেলিফোন বাজল। উত্তরটা না দিয়ে রিসিভার তুলে হ্যালো বললেন সুভাষদা। তারপর কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনে চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল কী করে?' উত্তরটা শুনে রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'এবার তুমি যেতে পার। রাসেল, তুমি থাকো।'

বাড়িতে ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করল সপ্তম। ঘুম এল না। টিভি খুলে হিন্দি সিনেমা দেখল। বিকেল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। চ্যানেল ঘুরিয়ে বাংলা খবর পেল সে। সংবাদপাঠক বললেন, আজ সকালে মালয়েশিয়ার এক বাণিজ্যিক সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ রাজ্যে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী জনি মালেক এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন।'

সকাল হতেই বিছানা ছাড়ল সপ্তম। বাইরের ঘরে গিয়ে দেখল তখনও কাগজ আসেনি। গতকালটাকে সে অনেককাল মনে রাখবে। এরকম ভয়ঙ্কর দিন জীবনে যত কম আসে তত মঙ্গল। বিকেলের খবর শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। জনি ব্যবসায়ী হয়ে মালেয়েশিয়ার লোকজনদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত চলে গিয়েছে? এই খবরটা সুভাষদা কীভাবে নেবেন? তিনি কি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে বলবেন, জনি মালেক একটি মাফিয়া নেতার নাম, ওকে পাত্তা দেবেন না।

সুভাষদা কী করবেন সেটা তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করছে কিন্তু সপ্তম বুঝতে পারছিল জনি হু-হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। সুভাষদাকে অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছে সে। লোকটার কথাবার্তায়, তাকানোয় একটা ঠাণ্ডা ব্যক্তিত্ব আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। আর এইসব ভাবতে ভাবতে কখন সময় চলে গিয়েছে টের পায়নি। যখন খেয়াল হল তখনই টেলিফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর দারোয়ান গোছের কেউ বলেছিল অফিস ছুটি হয়ে গেছে, ম্যাডাম অনেকক্ষণ আগে চলে গিয়েছেন। মাধবিকা বলেছিল বিকেলে ফোন করতে। বিকেল মানে সওয়া ছটা নয়। অবশ্য একটা ট্রাভেল এজেন্সি এত তাড়াতাড়ি কি বন্ধ হয়? সপ্তম অপেক্ষা করেছিল। একটু রাত হতে মাধবিকার বাড়িতে ফোন করেছিল। মাধবিকার মা বলেছিলেন যে, মেয়ে ফোনে জানিয়েছে তার বাড়িতে ফিরতে দেরি হবে। কোথায় যায় মাধবিকা অফিস ছুটির পরে? ক্লায়েন্ট অ্যাটেন করতে? রাতের বেলায় সেটা করতে গেলে নিজের সম্মান বাঁচানো কি সম্ভব? বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল সপ্তমের। ভেবেছিল বাড়ি ফিরে মাধবিকা ফোন করবে।

করেনি। তাতে আরও উত্তপ্ত হয়েছিল। ঠিক করেছিল যে আর নিজে থেকে ওকে ফোন করবে না।

আজ সকালে কাগজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে হেসে ফেলল সপ্তম। মাধবিকা কখন বাড়িতে ফিরবে, কার সঙ্গে দেখা করতে রাত্রে বের হচ্ছে এ নিয়ে ভাবার বা প্রশ্ন করার সে কে? তার কেন রাগ হচ্ছে? এতদিন কোনও যোগাযোগ ছিল না, ভাল করে আলাপও ছিল না এককালে, আজ কয়েকদিন দেখাশোনা হওয়ামাত্র সে ওর গার্জেন হয়ে গেল নাকি? রাগ দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকা মানে তো নিজের ক্ষতি করা। মাধবিকা ওর বসকে তার জন্যে চাকরির কথা বলেছে। কজন বলে?

কাগজ এল। যা ভেবেছিল তাই। প্রথম পাতায় বেশ বড় ছবি ছাপা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মালেয়েশিয়ার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের পাশে বসে আছেন পুরোদস্তুর স্যুট পরে ভারতীয় শিল্পপতি। বিস্তারিত খবর পড়ল সপ্তম। প্রতিনিধি দলটি প্রস্তাব দিয়েছে ফারাক্কা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত ওরা রাস্তা বানিয়ে দেবে। হাইওয়েতে যাওয়া-আসার পথে চারটি করে লেন থাকবে। এই পথ তৈরি করতে গেলে ফারাক্কা থেকে শিলিগুড়ি মাত্র তিন ঘণ্টায় যাওয়া যাবে। এই হাইওয়ের পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার অন্তর অন্তর রেস্তরাঁ এবং রেস্টরুমের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব যদি সরকার নেয় তাহলে হাইওয়ের নির্মাণখরচ তারাই বহন করবে। এই খরচ আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে তারা টোলট্যাক্সের মাধ্যমে তুলবে। শুধু পুলিস, মিলিটারি এবং মন্ত্রীদের গাড়ি টোলট্যাক্সের আওতায় পড়বে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে তিনি জনি মালেককে ধন্যবাদ দিয়েছেন। প্রতিনিধি দলটি অনুরোধ করেছে, আগামী সাতদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রাথমিক মতামত জানিয়ে দেন তাহলে তাঁদের পক্ষে প্রস্তুতি নিতে সুবিধে হবে। সপ্তম অবাক। জনি মালেক বলে যে মানুষটার ছবি ছাপা হয়েছে তাকে কাল সে দেখেনি। তাহলে কি অন্য কাউকে জনি সাজিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পাঠানো হয়েছিল? একেবারে ভুল বোঝানো হয়েছিল সবাইকে?

কাল দুপুরে দেখা লোকটার সঙ্গে কাগজে বক্তব্য রাখা শিল্পপতির চেহারার কোনও মিল নেই। সপ্তম স্পষ্ট বুঝতে পারছিল সুভাষদাকে যাকে বলে হ্যাকে মারা তাই মারতে চলেছে জনি মালেক। সে কাগজের নিচের দিকে চোখ রাখতেই চমকে উঠল। একদিনে কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আটজন তোলাবাজ এবং মাস্তান নিহত হয়েছে। পুলিসের সন্দেহ ওরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মারা গিয়েছে। এই আটজনের মাত্র দুজন মুসলমান, বাকিরা হিন্দু। অবাঙালি হিন্দু। হঠাৎ এতগুলো সমাজবিরোধী একসঙ্গে মারা পড়ল কেন তা পুলিস ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু এলাকার লোকরা খুশি হয়েছে। তারা ভাবছে এর ফলে শান্তি ফিরে আসবে।

চা খেয়ে মাধবিকাকে ফোন করল সপ্তম। মাধবিকাই ফোন ধরল, 'কী ব্যাপার? কাল বিকেলে টেলিফোন করলে না কেন?'

'করেছিলাম, তখন তুমি বেরিয়ে গেছ!'

'দূর। আমি বেরিয়েছি ছটার একটু আগে। তখন নিশ্চয়ই বিকেল নয়।'

'বাড়িতেও করেছিলাম, তোমার ফেরার ঠিক ছিল না।'

'স্বাভাবিক।' মাধবিকা গম্ভীর হল, 'তাছাড়া অফিসের ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে কথা বলা পছন্দ করি না।'

'ওহো! সরি। তা হলে অফিসে ফোন করব?'

'ঠিক আছে, করেই ফেলেছ যখন—শোন, তুমি ঠিক বারোটায় তোমার একটা বায়োডাটা নিয়ে আমার অফিসে চলে এসো। রাখছি।'

মাধবিকার গলা কাঠ কাঠ। ফোন রেখে দিল সে। সপ্তমের একটুও ভাল লাগছিল না। ক'দিন মাধবিকার সঙ্গে কথা বলে ওকে বন্ধু বলে মনে হয়েছিল। আজ কাজের প্রসঙ্গ ওঠায় ওর গলায় কোনও বন্ধুত্ব নেই। সপ্তমের মনে হল ওই ট্র্যাভেল এজেন্সিতে চাকরির জন্যে গেলে হয়ত মাধবিকা তার বস্ হবে। মাধবিকার অধীনে চাকরি করতে কি তার ভাল লাগবে? অসন্তুষ্ট হলে মাধবিকা তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মধুর ব্যবহার করবে না। তাহলে?

জ্যোতি দত্তের ফোন এল। খুব ক্ষেপে গিয়েছেন ভদ্রলোক, 'কি ভেবেছ বল তো? এটা কি ছেলেখেলা? কথাবার্তা নেই দিনের পর দিন ডুব মেরে আছো। কাজটা করতে ইচ্ছে না হয় তো স্পষ্ট বলে দাও। আমাকে ঝুলিয়ে কি ভাল হচ্ছে?'

'জ্যোতিদা, আমি এত ঝামেলায় আছি—।'

'তাহলে তুমি তোমার ঝামেলা নিয়ে থাকো, আমি অন্য লোক দেখি।'

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল সপ্তমের, 'তাই দেখুন। আপনার কাছে কাজ করা মানে তো এর ওর কাছে গিয়ে হাত কচলে তেল মারা। ওটা আর পোষাচ্ছে না।'

তাই? বড় কিছু পেয়েছ মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, সুভাষ তোমাকে পাঠিয়েছিল বলে এক কথায় রাজি হয়েছিলাম। তাকে জানিয়ে দেব তোমার সিদ্ধান্তের কথা।' জ্যোতি দত্ত ফোন রেখে দিয়েছিল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ, ক্লায়েন্টদের কাছে গিয়ে চাটুকারিতা করতে হত ঠিক, অনেক জায়গায় ক্লায়েন্টদের ব্যবহারে বেশ অপমানিত হতে হয়েছে তাকে। নিজেকে খুব ছোট মনে হত সে সময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাস গেলে চার-পাঁচ হাজার টাকা তো আসে। এটা তাকে কে দেবে? স্রেফ মেজাজ খারাপ ছিল বলেই সে জ্যোতি দত্তকে ওইভাবে কথা বলেছে। তা ছাড়া জ্যোতি দত্তের কথা বলার ধরনটাও খুব ভাল ছিল না। সবসময় লাঠি ঘোরান ভদ্রলোক। বেশ করেছে সে মুখের ওপর না বলে দিয়ে। সপ্তম ঠিক করল মাধবিকার অফিসে যাবে।

ঠিক বারোটায় মাধবিকার অফিসে পৌঁছে গেল সপ্তম। তার সঞ্চয়ে যে সব পোশাক ছিল তার সেরা শার্ট-প্যান্ট পরে এসেছে আজ। তাকে দেখামাত্র মাধবিকার চোখে যে প্রশংসা ফুটল তা বুঝতে অসুবিধে হল না সপ্তমের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাধবিকা, 'চল, আগে বস্-এর সঙ্গে কথা বলিয়ে দিই। ইনি এই সংস্থার মালিক। ফাঁকিবাজি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না।'

এয়ারপোর্টে দেখা সেই প্রবীণ ভদ্রলোক কম্পিউটারের সামনে বসেছিলেন, ওদের ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, 'এসো।' তারপর নিজের টেবিলে গিয়ে বসলেন।

'স্যার, এর নাম সপ্তম।'

'বুঝতে পেরেছি।' ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন, 'বায়োডাটা?'

সপ্তম একটা খাম এগিয়ে দিল। সেটা খুলে কাগজ বের করে চোখ বোলালেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'আপনি তো কখনও ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করেননি। আমরা আপনার কাছ থেকে এক্ষেত্রে কীরকম কাজ আশা করতে পারি?'

'এর উত্তর আমি আপনাকে তিনমাস পরে দিতে পারব।' সপ্তম বলল।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন।

'এই তিনমাসে আমি কাজটা কতটা পিক আপ করতে পেরেছি তা বুঝতে পারব।'

'ভাল উত্তর। এই তিনমাস আপনি সম্মানদক্ষিণা হিসেবে কী আশা করছেন?'

সেটা আপনি যা বিবেচনা করবেন।'

'নো। মাধবিকা রেফার না করলে আমি আপনার সঙ্গে কথাই বলতাম না। আমাদের যেসব কাজ টেকনিক্যাল তার কোনওটাই আপনি জানেন না।'

'ঠিক আছে, আমি তিনমাস পরেই এ ব্যাপারে কথা বলব।'

'বাঃ ভাল উত্তর। এই তিনমাস আপনার ট্র্যাভেলিং অ্যালাউন্স হিসেবে মাসে তিন হাজার করে দিতে পারি। আপনার যা করণীয় তা মাধবিকা বুঝিয়ে দেবে। আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে ওর কাছে। আশাকরি তিনমাস পরে আপনার সঙ্গে আনন্দিত হয়ে কথা বলতে পারব।' কথাগুলো বলে ঈষৎ মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। বোঝাতে চাইলেন এবার সপ্তম যেতে পারে।

বাইরে বেরিয়ে এল সপ্তম। মাসে তিন হাজার। এছাড়া উপায় ছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখতে গেলে তিনমাসের ঝুঁকি নেওয়া দরকার। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ না করতে পারলে টাকা চাওয়া যায় না। যেমন করে হোক সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে।

মিনিট দশেক বাদে মাধবিকার সামনে বসার ডাক পেল সপ্তম। মাধবিকা বলল, 'ট্র্যাভেল এজেন্সির কাজগুলোকে চারটে ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হল বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এবং এজেন্সির সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ডেভেলপ করা। বিভিন্ন এয়ারলাইন্স কোন রুটে যায় তাদের মূল ফেয়ার যেটা আয়াটা ঠিক করে দিয়েছে আর যেটা ওরা কনসেশনে দিয়ে থাকে তা মনে রাখা। অনেক সময় ফ্লাইট ভর্তি থাকলেও কোনও ক্লায়েন্টের এমার্জেন্সিতে বাইরে যাওয়ার থাকলে ওই ভাল সম্পর্কটা কাজে লাগে।'

'ফ্লাইট ভর্তি থাকলে কী করে সিট পাওয়া যাবে?'

'শেষ মুহূর্তের ক্যানসেলেশন ছাড়া কেউ কেউ দু-চারটে সিট হাতে রেখে দেয়।'

মাধবিকা বলল, 'দ্বিতীয় হল ক্লায়েন্ট সার্ভিস। একজন লোক যার পাসপোর্ট নেই অথচ বিদেশে যেতে চায় তার পাসপোর্ট করিয়ে দেওয়া থেকে ভিসা বের করে টিকিট করে তাকে প্লেনে তুলে দেওয়া সবই আমাদের করতে হয়। আমাদের এখানে পাসপোর্ট এবং ভিসার দায়িত্বে লোকে আছেন। কাজটা তাঁদের বললেই তাঁরা করে দেবেন। কোনও ক্লায়েন্টের এয়ারপোর্টে অসুবিধে হলে তাঁর পাশে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তৃতীয়ত, ডেস্কজব। টিকিট থেকে শুরু করে বিল করা, টাকা আদায় করা, অ্যাকাউন্টস ইত্যাদি। চতুর্থত, ক্লায়েন্ট সংগ্রহ। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ইনফ্লুয়েন্স করে ক্লায়েন্ট হিসেবে পাওয়া। এটা খুব ইমপর্টেন্ট। মোটামুটি এই।' মাধবিকা কথাগুলো বলতে বলতে একটা প্যাডে এক, দুই, তিন, চার করে নোট লিখছিল। বলা শেষ হলে প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে সপ্তমের দিকে এগিয়ে দিল।

'আমাকে কোন কাজটা করতে হবে?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি নিশ্চয়ই আজকের কাগজ পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ম্যালেয়েশিয়া থেকে একটি টিম এসেছে এদেশে কিছু কাজকর্ম করবে বলে। ওরা আগামীকাল দার্জিলিং যাবে। যাওয়ার সময় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে বাগডোগরায় নেমে গাড়ি নিয়ে দার্জিলিং। ওখানে একরাত থেকে ওঁরা বাই রোড কলকাতায় আসবেন। শিলিগুড়ি থেকে ফারাক্কা অবধি রাস্তাটা ওঁরা দেখবেন। আমরা ওঁদের যাতায়াত থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। হোটেল গাড়ি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমাদের একজন সিনিয়র স্টাফ মিস্টার এস কে রায় ওঁদের অ্যাকমপেনি করবেন। তুমি ওঁর সঙ্গে যাও। ওঁকে সাহায্য করলেই তুমি শিখতে পারবে কী করে ক্লায়েন্টদের হ্যান্ডল করতে হয়।' মাধবিকা ইন্টারকমের বোতাম টিপল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার রায় আছেন?' একটু শুনল, 'ও, ঠিক আছে।'

'আমাকে কীভাবে যেতে হবে?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'কাল সকাল নটায় এয়ারপোর্ট চলে যেও। আমিও তখন ওদের সি অফ করতে যাব। আমার কাছ থেকে টিকিট পেয়ে যাবে। বাকিটা মিস্টার রায় তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'ঠিক আছে।'

'ওয়েল, তুমি এখন বিযুগুপ্রিয়ার কাছে যাও। ওর কাছে কলকাতা দিল্লি বোম্বে থেকে যত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ছাড়ে তার চার্ট আর ফেয়ারলিস্ট আছে। সেই সঙ্গে কলকাতার ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলো সম্পর্কেও তোমাকে জানতে হবে। শি উইড হেল্প ইউ।' মাধবিকা বলল, 'বিযুগুপ্রিয়া বাঁদিকের তৃতীয় ঘরটায় আছে।'

মাথা নেড়ে সপ্তম উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মাধবিকা ডাকল, 'সপ্তম।'

সপ্তম তাকাল। মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমার ব্যবহারে অখুশি?'

ঠোঁট কামড়ালো সপ্তম। তারপর মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল।

জুতো মেরে গরুদান বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু মাধবিকা নিজেও জানে যে সে সপ্তমের সঙ্গে কাঠ কাঠ ব্যবহার করছে, ওর শেষ কথায় তাই প্রমাণিত হল। ফলে মনটা হালকা হয়ে গেল সপ্তমের। সে নির্দিষ্ট করে ঢুকে দেখল চারজন মানুষ খুব মন দিয়ে কাজ করছেন। তাঁদের একজন মহিলা। জিনস আর শার্ট, মাথার চুল কাঁধ অবধি নামতে দেননি। বয়স চল্লিশের নিচে। ইনিই নিশ্চয়ই বিযুগুপ্রিয়া। সপ্তম ভদ্রমহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তখন কম্পিউটার দেখতে ব্যস্ত। ইশারায় বসতে বললেন। মিনিট দুয়েক পরে কম্পিউটার থেকে মুখ তুললেন ভদ্রমহিলা, 'ইয়েস, বলুন, কী করতে পারি?'

'মাধবিকা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।'

'ওহো। আপনি সপ্তম?' বিযুগুপ্রিয়া চোখ ছোট করলেন, 'বসুন। আপনি নিশ্চয়ই কম্পিউটারের এ বি সি জানেন? জানলে কোনও প্রবলেম হবে না। এই মুহূর্তে কলকাতা থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে দুশো ছিয়াত্তরটা ডোমেস্টিক ফ্লাইট আর আটচল্লিশটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ছাড়ে এবং কলকাতায় এসে নামে। আপনি এই ফাইলটা একটু দেখুন। প্রত্যেকটা ফ্লাইট কোথায় নামছে, কত সময় লাগছে এই ভাড়া কত তার ডিটেলস

এখানে পাওয়া যাবে। আজ প্রথমদিন, ডাটাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করুন। আপনাকে কি কোনও টেবিল দেওয়া হয়েছে?

'আমাকে এখনও কিছু বলা হয়নি।'

'আপনি এখানে বসেই শুরু করুন।' বিষ্ণুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে একটু ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে যেতে হবে। লাঞ্চের আগে ওদের ধরতে না পারলে—ঠিক আছে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সপ্তম।

মিস্টার রায় বিকেল পাঁচটার মধ্যেও এলেন না! পাঁচটা নাগাদ মাধবিকা তাকে ডাকল, 'প্রথমদিন কেমন লাগল?'

শুধু মুখস্থ করে গেলাম। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলোর কোনটা কখন ছাড়ে তা বলে যেতে পারব। কিন্তু কলকাতা থেকে কোনও ফ্লাইট সরাসরি নিউইয়র্ক যায় না?'

'না। অনেকটা পথ। হয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, নয় জর্ডন, নয় আর্মস্টারডাম অথবা লন্ডনে থামতে হয়। ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার। তোমার কালকের ফ্লাইট আই সি সেভেন টু ওয়ান। ছাড়বে ঠিক নটা পঞ্চাশে। তুমি নটার ধ্যে পৌঁছে যেও।'

'আমাকে তো মিস্টার রায় চিনতে পারবেন না।'

'ওঃ, আমি তো ওঁর সঙ্গে থাকব।'

অতএব সপ্তম বেরিয়ে এল। অবশেষে তার একটা চাকরি হল। মা শুনলে খুব খুশি হবে। তার মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে তিনমাসের অনেক আগেই সে অনেকটাই রপ্ত করতে পারবে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পার্ক স্ট্রিটের ছুটন্ত গাড়ি দেখতে লাগল সে। খুব ভাল হল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। দার্জিলিং সে কখনও যায়নি। কিন্তু সেখানে যাওয়ার রোমাঞ্চের চেয়ে সুভাষদা-জনি মালেক সংঘর্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এমন অভাবনীয় সুযোগ করেদেওয়ার জন্যে মাধবিকার কাছে সে কৃতজ্ঞ।

ব্যাপারটা মাথায় আসতেই আর একটা চিন্তা, চলে এল। তাকে যেতে হবে মালেয়েশিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে, যাঁদের এনেছে জনি মালেক। জনি কি দলের সঙ্গে যাবে? অর্থাৎ সে ছাড়তে চাইলেও কমলি তাকে ছাড়ছে না। এই দলটা অন্য কোনও দেশ থেকে আসতে পারত। তাছাড়া জনি মালেক যদি জানতে পারে সে দলের সঙ্গে যাচ্ছে তাহলে ওর কী প্রতিক্রিয়া হবে? অত বড় ক্লায়েন্ট যদি না চায় তা হলে ট্র্যাভেল এজেন্সি নিশ্চয় তাকে বাদ দিতে দ্বিধা করবে না।

অস্বস্তি বাড়ছিল সপ্তমের। কলকাতা থেকে চলে গিয়েও তা হলে তার নিস্তার নেই। গতকাল তার সঙ্গে দেখা করে যে লোকটি জনি মালেকের অভিনয় করেছিল সে নিশ্চয়ই আসল জনিকে সব রিপোর্ট করেছে। আসল জনি তাকে দেখে চিনতে পারবে না কিন্তু নামটা কি মনে রাখবে? আর সে যে নকল জনির সঙ্গে খুব সিরিয়াস হয়ে কথা বলার পরে সুভাষদাকে জানিয়ে এসেছে, এই ব্যাপারটাও তো সুভাষদার কাছে হাস্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু সে কী করতে পারে? জনিকে সে চেনে না। অফিসার ভদ্রলোক তাকে পার্কিংলটে নিয়ে গিয়েছিল জনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিতে। অতএব ওই লোকটাই জনি একথা ভাবার স্বাভাবিক কারণ ছিল। জনি ডামি পাঠিয়ে সুভাষদাকে অপমান করলে তার কিছু করার থাকছে না।

কিন্তু ওই ডামি জনি তাকে বলেছিল, রশিদের সঙ্গে দেখা করতে। সে যদি দেখা না করে তাহলে? প্রয়োজনটা ওদের হলে ওরাই চলে আসবে তার বাড়িতে। সপ্তমের মনে হল জটিলতা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। রশিদ কী বলতে চায় শুনে আজকেই সব সম্পর্ক শেষ করা উচিত।

রশিদের বাড়িতে হেঁটেই চলে এল সপ্তম। যণ্ডামার্কা একটা লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি চায়? রশিদের কথা বলতে নাম জেনে লোকটা কাউকে ডেকে বলল খবরটা দিতে। মিনিট তিনেক বাদে সেই লোকটা বেরিয়ে আসতে চিনতে পারল সপ্তম। একেই সে দেখেছিল এর আগের দিন। লোকটা তাকে ইশারা করল অনুসরণ করতে।

চৌরঙ্গি লেন থেকে বেরিয়ে সদর স্ট্রিট ধরে কিছুটা হেঁটে ডানদিকের গলির মুখে দাঁড়িয়ে লোকটা মাথা নেড়ে আসতে বলে গলিতে ঢুকল। ভিখিরি চেহারার সাদা বিদেশী ও বিদেশিনীরা জড়াজড়ি করে হেঁটে যাচ্ছে আশপাশে। একটা বাড়ির পাশের দরজা দিয়ে লোকটা ঢুকতেই আর একটি লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল কিছু। পথ চিনিয়ে আনা লোকটি সপ্তমকে দেখিয়ে দিল। লোকটি বলল, 'আইয়ে।' বাড়িটা যে এত লম্বা তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দোতলায় উঠল ওরা। দরজায় ভারি পর্দা ঝুলছে। লোকটা পর্দা সরালো। সঙ্গে সঙ্গে রশিদের গলা শুনতে পেল সপ্তম, 'আসুন আসুন সপ্তমবাবু।'

ঘরে ঢুকল সপ্তম। সুন্দর সাজানো ঘর। রশিদ ছাড়া আর একজন বসে আছে সোফায়। রশিদ বলল, 'আমি ভেবেছিলাম কাল বিকেলেই আপনার দেখা পাব। সব ভাল?' সপ্তম হাসল।

'বসুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি ইমরান ভাই, ইমরান রহমান। এঁরই মানিব্যাগ আপনি ট্যাক্সির ভেতর কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ইমরান রহমান উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সপ্তম করমর্দন করল।

সোফায় বসার পরে ইমরান রহমান বললেন, 'টাকা আজ যাবে কাল আসবে, যৌবন আসে আবার চলেও যায়, কিন্তু সম্পর্ক রাখতে পারলে চিরকাল এক জায়গায় রেখে দেওয়া যায়। আপনি শিক্ষিত এবং ভদ্রমানুষ, আমার কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।'

হেঁয়ালিব মত লাগছিল। সপ্তম বুঝতে পাবছিল না হঠাৎ তার সঙ্গে ইনি কী সম্পর্ক রাখতে চান।

রশিদ বলল, 'ইমরান ভাই আমাকে খুব বকেছেন। আপনার কাছ থেকে টাকাটা ফেরত চেয়ে নেওয়া উচিত হয়নি। উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে শুনে ওকে বলেছিলাম আপনাকে একবার আমার জন্যে বলতে। টাকাটা নিয়ে যান।'

সপ্তম কথা বলল, 'আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু টাকাটা আমি নেব না।'

'কেন?' রশিদের কপালে ভাঁজ পড়ল।

আমি ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়ে আপনাদের ফেরত দিইনি। আপনারাই খোঁজখবর করে আমার কাছে পৌঁছেছিলেন। ওই ক্ষেত্রে কেউ অত টাকা পুরস্কার দেয় না। আপনারা কেন দিয়েছিলেন তা আমি জানি না। তারপর আমি আপনাদের বিশ্বাস রাখতে পারিনি বলে

শাস্তি হিসেবে টাকাটা ফেরত নিয়ে গেছেন। ঠিকই করেছেন। এখন এমন কোনও নতুন পরিস্থিতি হয়নি যে কারণে টাকাটা নিতে পারি।'

ইমরান রহমান বললেন, 'বাঃ। এই তো চাই। সপ্তমবাবু, আপনার মত ছেলে আমাদের দরকার। এইরকম সোজাসুজি কথা বলতে হিম্মত চাই। গুড। কাল জনির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ওকে কেমন লাগল?'

'উনি জনি নন।' কথাটা না বলে পারল না সপ্তম।

ইমরান রহমান রশিদের দিকে তাকালেন। তারপর হাসলেন, 'এরকম বলছেন কেন?'

'আসল জনি মালেকের ছবি আজকের কাগজে ছাপা হয়েছে।'

'হুঁ। এই আবিষ্কারের কথা আপনি কাকে কাকে বলেছেন?'

'এই প্রথমবার বললাম।'

'হুম। সপ্তমবাবু, আপনার তো এখন স্টেডি অবস্থা নয়। একটা শেয়ার মার্কেটের এজেন্টের হয়ে দালালি করা ছাড়া অন্য কোনও রোজগার নেই। আপনি আমাদের সঙ্গে চলে আসুন। টাকা-পয়সা নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।' ইমরান রহমান বললেন।

'এত মানুষ থাকতে আমার কথা আপনারা ভাবলেন কেন'

'আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে যা আমাদের আকর্ষণ করছে। রশিদ বলল।

'আমাকে কী করতে হবে?'

'জনি যা চাইবে তা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তা আপনাকে দেখতে হবে। রশিদ বলল।

'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

রশিদ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ইমরান রহমান বাধা দিল, 'না-না। ওকে সময় দাও। বুদ্ধিমান লোকেরা পা বাড়াবার আগে পথটা দেখে নেয়। আমাদের এমন লোক দরকার। কিন্তু সপ্তমবাবু, একটা অনুরোধ, কাল যে জনি আপনার সঙ্গে কথা বলেনি এ খবরটা বাইরে না বলাই ভাল।'

'বেশ।' সপ্তম উঠে দাঁড়াল।

রশিদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছ থেকে কবে খবর পাব?'

'আমি কাল বাইরে যাচ্ছি. হয়ত দিন সাতেক পরে ফিরব। তারপর।'

সপ্তম বাইরে বেরিয়ে এল। এদের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পেরে তার ভাল লাগছিল। এক কথায় ওদের টাকার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে এখন একটুও খারাপ লাগছে না। ওরা নিশ্চয়ই বুঝবে সে ফেকলু নয়। কিন্তু ওরা কেন আবার তাকে জড়াতে চাইছে। সে তো অতি সাধারণ ছেলে। আজ অবধি কারও গালে একটাও চড় মারার সাহস অর্জন করেনি। তাহলে?

কিন্তু এই লোকগুলো করছেটা কী? দুবাইয়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এদের। জনি মালেক তো দুবাইয়ের নির্বাচন। প্রথম সে শুনেছিল জনি একজন উঠতি মাস্তান। তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। আজ কাগজে পড়ল সে শিল্পপতি। মাস্তান কখনও শিল্পপতি হতে পারে না। কিন্তু শিল্পপতির পক্ষে মাস্তানি করা অসম্ভব নয়। কিন্তু একজন বড়মাপের শিল্পপতি মাস্তানি করে কি লাভবান হয়? কত রোজগার হবে? জনি যদি বড়মাপের শিল্পপতি না হয় তাহলে সে কী করে বিদেশী এক বাণিজ্যিক দলকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর

সঙ্গে দেখা করতে পারে? অথচ জনিকে দুবাই থেকে কলকাতার একটি অংশের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে কয়েকদিন আগে। সপ্তমের মনে পড়ল আরও তিনজনের কথা। বপ্পাস, হায়দার এবং কানাই। ইমরান রহমানের মানিব্যাগের মধ্যে রাখা কাগজে এই তিনজনের নাম জনির সঙ্গে ছিল। কিন্তু ওই তিনজনের নাম এখনও শোনা যাচ্ছে না কেন? তাদের উত্থান তো জনির পাশাপাশি হওয়ার কথা। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে! সোজা বাড়ি ফিরে এল সপ্তম। এসে মায়ের কাছে শুনল রাসেল তাকে দুবার টেলিফোন করেছে। কিন্তু সে ঠিক করল রাসেলকে ফোন করে জানতে চাইবে না কেন সে ফোন করেছে। দরকার হলে রাসেলই আবার করবে। সুভাষদা-রাসেল-রশিদ— কারও সঙ্গে আগামীকাল পর্যন্ত যোগাযোগ করবে না সে। কোনওরকমে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই সে যেন বেঁচে যাবে, এমন বোধ হচ্ছিল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল সপ্তমের। সেকি স্বপ্ন দেখছিল? ধাতস্থ হতে সময় লাগল। একটা কালো হাত ক্রমশ বড় হতে হতে আকাশটাকে ঢেকে ফেলছে, এ কী ধরনের স্বপ্ন? এই স্বপ্নের মানে কী? অন্ধকারেই হাতড়ে-হাতড়ে জল খেল সে। এবং তখনই তার মনে হল ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। কোনও বিদেশী শক্তির নির্দেশে এক অশুভ চক্র কলকাতায় দখল নিয়ে নিচ্ছে জানার পরেও সে চুপচাপ রয়েছে? পুলিসকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলা তার প্রথম কর্তব্য ছিল। কিন্তু পুলিস মানে তো থানায় গিয়ে বলতে হবে। লালবাজারে যেসব বড় কর্তা বসেন, যাঁদের নাম কাগজে ছাপা হয়, তাঁদের কাছে সে পৌঁছতেই পারবে না। পারবে যদি সুভাষদার সাহায্য নেয়। সেক্ষেত্রে তো সুভাষদা সম্পর্কে কোনও কথাই বলা যাবে না। আর সরাসরি থানায় গিয়ে রিপোর্ট করার কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে।

মাস তিনেক আগের কথা। জ্যোতি দত্তের সঙ্গে ওর পুরনো গাড়িতে ভবানীপুরে যাচ্ছিল সে। রবীন্দ্রসদনের সামনে চৌমাথায় একটা ট্যাক্সি তাদের ওভারটেক করতে গিয়ে এত জোরে মারল যে জ্যোতি দত্তের গাড়ির বাম্পার খুলে পড়ে গেল, সামনের দিকটা গেল দুমড়ে। ব্রেক চেপে গাড়ি দাঁড় করাতে করাতে ট্যাক্সিটা উধাও হয়ে গেল। সপ্তম নাম্বারটা নিয়েছিল। মোড়ের মাথায় যেসব সেপাই দাঁড়িয়েছিল তারা উপদেশ দিল থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে। থানায় ডায়েরি করা জরুরি ছিল, নইলে এ বাবদ ক্ষতিপূরণ ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। সেপাইদের নির্দেশমত ওরা স্থানীয় থানায় গাড়ি নিয়ে পৌঁছল, গাড়ির অবস্থা তখন বেশ করুণ।

থানায় ঢুকতেই বাঁ দিকে এক অফিসারকে দেখা গেল খাতাপত্তর নিয়ে তিনজন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। জোতি দত্ত তাঁকে বললেন, 'একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ডায়েরি করব।'

অফিসার মুখে কিছু না বলে আঙুল তুলে ওপাশের ঘর দেখিয়ে দিয়ে তিনজনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওপাশের ঘরে গিয়ে ওরা তিনজন অফিসারকে একটি দালাল চেহারার লোকের সঙ্গে আড্ডা মারতে দেখল। অনেকটা সময় অপেক্ষা করার পর ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল একজন অফিসার বললেন, 'বাইরে যান। ওখানে ডায়েরি নেওয়া হচ্ছে।'

জ্যোতি দত্ত বললেন, 'উনি তো এখানেই পাঠিয়ে দিলেন।'

‘অ। কী হয়েছে?

‘আমার গাড়িকে আর একটা গাড়ি ড্যামেজ করেছে।’

‘কোন রাস্তায়?’

‘রবীন্দ্রসদনের মোড়ে।’

‘তাহলে এখানে হবে না। অমুক থানায় যান। ওটা ওদের জুরিসডিকশন।’ বলে আবার গল্প শুরু করলেন। জ্যোতি দত্ত বললেন, ‘কিন্তু ওই স্পটের পুলিস এখানেই আসতে বলল।’

‘ও। তাহলে সামনে গিয়ে লাইন দিন। ওখানে যিনি বসে আছেন তিনিই ডায়েরি নেবেন।’

একথা শোনার পর জ্যোতি দত্ত ওকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পাড়ার গ্যারাজে গিয়ে গাড়ি দিতে ছোকরা মেকানিক মাত্র দেড়শো টাকায় গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল।

অতএব থানায় গেলে আবার একইরকম ঘটবে না—এমন গ্যারান্টি কোথায়? তার চেয়ে খবরে কাগজে বেনামে চিঠি লেখাই ভাল। থানায় জানালে পরের দিন সে হয়ত পৃথিবীতে থাকবে না, বেনামে চিঠি লিখলে অন্তত সে সম্ভাবনা থাকবে না।

ঠিকঠাক সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল সপ্তম। চাকরিতে যাচ্ছে বলে মা-কে জানিয়ে এসেছে সে। ভদ্রমহিলা খুশি হয়েছিলেন। ট্যাক্সিতে এয়ারপোর্ট আসতে বেশ টাকা বেরিয়ে গেল, এটা নিশ্চয়ই অফিস দেবে না। এয়ারপোর্টের ভেতর আজ টিকিট কেটেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না নতুন অর্ডারে। বিদায় দিতে আসা লোকজনের ভিড় বাইরে। সপ্তম চারপাশে তাকাচ্ছিল। সেই ভদ্রলোক, মিস্টার রায়ের সঙ্গে পরিচয় করবার দায়িত্ব নিয়েছে মাধবিকা। মাধবিকা ঠিক সময়ে না এলে তার যাওয়া হবে না। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে মাধবিকা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, ‘সপ্তম!’

সপ্তম এগিয়ে গেল। মাধবিকা খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে ওর হাতে টিকিট দিল, ‘চলে এস।’

টিকিট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে এগোতেই মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, ‘এই তোমার লাগেজ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভাল। এক্সরে করাতে হবে না। হ্যান্ডব্যাগ হিসেবে চলে যাবে। তুমি বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ওই লাউঞ্জে চলে এস।’ মাধবিকা একটা দিক দেখিয়ে চলে গেল।

বোর্ডিং কার্ডের জন্যে লাইনে দাঁড়াল। এ অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়নি। উত্তেজনা টোকা মারছিল। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সপ্তম এগিয়ে গেল মাধবিকারদিকে। মাধবিকা সেখানে চারজন বিদেশীর সঙ্গে হেসে কথা বলছে। তাকে দেখে ইশারা করল কাছে যেতে। তারপর পরিচয় করিয়ে দিল তাদের সংস্থার একজন কর্মী হিসেবে। মাধবিকা বলল, ‘আপনাদের যা-যা প্রয়োজন স্বচ্ছন্দে একে বলতে পারেন। কোনও রকম সঙ্কোচ করবেন না।’

চারজন বিদেশী সপ্তমের সঙ্গে হাসিমুখে করমর্দন করল। মাধবিকা বলল, ‘ওদের লাগেজ সব বুক করে দেওয়া হয়েছে. প্লেনে ওঠার আগে একবার আইডেন্টিফাই করতে নিয়ে যেতে হবে।’

‘মিস্টার রায় কোথায়?’

'আর বলো না। আজ সকালে ভদ্রলোকের স্ত্রী-র হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। খুব বিপদে পড়ে গেছেন ভদ্রলোক। ওই অবস্থায় আসতে চাইছিলেন। আমি নিষেধ করলাম।'

'সর্বনাশ। তাহলে আমাকে গাইড করবে কে? আমি তো কিছুই জানি না।'

'ঢেকি তো স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। অতএব আমাকেই যেতে হচ্ছে।'

'তুমি যাচ্ছ?'

'কেন? তোমার ভাল লাগছে না?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সপ্তম, 'সবসময় যদি বস পাশে থাকে তাহলে কি ভাল লাগে? সহজ হওয়া যায় না।'

মাধবিকা কথার উত্তর দিল না। বিদেশিদের সঙ্গে আলাপ শুরু করল।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যখন ওরা নামল তখন দুপুর। প্লেনে মাধবিকার সিট ছিল ওই চারজনের সঙ্গে, সপ্তমের অনেক পেছনে। প্লেন থেকে নেমে মাধবিকা তাকে বলল 'তুমি ওদের লাগেজগুলো অর্গানাইজ করো। আমি এদের দেখছি। এই নাও লাগেজ ট্যাগ।'

মাধবিকা চলে গেলে কয়েক মুহূর্ত বিষণ্ণ হল সপ্তম। তাকে ঠিক কী কাজ করতে হবে মাধবিকা বলেনি। ক্লায়েন্টদের মালপত্রের তদারকি তো একজন অশিক্ষিত কর্মচারীও করতে পারে। পরমুহূর্তেই মনে হল বাইরে এসে এসব নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই। হৈ হৈ করেই কাজটা করা যাক। কোথায় যেন পড়েছিল, কোনও কাজই ছোট নয়।

গাড়ি এসে গিয়েছিল। একটা সুমো গাড়ি। তাতে মালপত্র তুলে দেওয়া হল।

চার প্রতিনিধি বসলেন পেছনে। তাদের পেছনে সপ্তম। ড্রাইভারের পাশে মাধবিকা। গাড়ি ছাড়ার আগে মাধবিকা পেছন ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এখন বাগডোগরা এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাচ্ছি। এটি উত্তরবাংলার একমাত্র এয়ারপোর্ট। এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে ন্যাশনাল হাইওয়ে। সেখানে পৌঁছে আমরা শিলিগুড়ি শহরের দিকে এগিয়ে যাব। কিন্তু শিলিগুড়ি পর্যন্ত না গিয়ে আমরা একটি শর্টকাট পথ ধরে দার্জিলিংয়ের দিকে এগিয়ে যাব। আপনাদের কোনও প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানাতে পারেন।'

'শিলিগুড়ি শহরটা আমরা কখন দেখতে পাব? একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

'আগামীকাল যখন আমরা দার্জিলিং থেকে ফিরে আসব তখন সরাসরি শিলিগুড়ি পৌঁছব। ওখানে কাল থেকে পরশু ভোরে বাই রোড আমরা কলকাতায় ফিরব।'

সপ্তম পেছনে বসে চারজনকে দেখল। এই লোকগুলো নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক। অথবা এ-ও হতে পারে, এরা স্রেফ কর্মচারী, ওদের কোম্পানির হয়ে এসেছে। কিন্তু এদের সঙ্গে জনি মালেক আসেনি। চারজনের মুখ দেখে বোঝা যায় ওরা বিদেশী। বাইরে তাকাল সে। এখন গাড়ি ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরেছে। পাহাড়ের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দুপাশটা সাধারণ, মফস্বল শহর যেমন হয়।

মকাইবাড়ি চা বাগানে পৌঁছনমাত্র ঠাণ্ডা বেড়ে গেল। সপ্তম তার একমাত্র জ্যাকেট চাপিয়ে নিল শরীরে। বেশ ভাল লাগছে দুপাশের দৃশ্য। মাঝে মাঝে মাধবিকা ঘোষণা করে চলেছে ঠিক কোন জায়গা দিয়ে গাড়ি চলেছে। পাঙ্খাবাড়ি নামে যে জায়গা আছে তাই জানত না সপ্তম। কার্শিয়াঙে গাড়ি থামল না। থামল একেবারে দার্জিলিঙের আইসল্যান্ড

হোটেলের সামনে পৌঁছে।

চেহারা দেখেই বোঝা গেল হোটেলটি বেশ দামি। সপ্তমকে সঙ্গে নিয়ে মাধবিকা রিসেপশনে গেল। ঘর আগে থেকেই বুক্‌ড ছিল। এবং সেখানেই সমস্যা হল। মোট তিনখানা ঘর বুক করেছিল এজেন্সি। দুটো চারজন বিদেশীর জন্যে, একটি মিস্টার রায় আর সপ্তমের। মাধবিকা মাথা নেড়ে বলল, 'সরি, আরও একটা ঘর দরকার আমাদের।'

'সরি ম্যাডাম, আজ আমাদের সব ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে।'

'স্ট্রেঞ্জ! মিস্টার রায় আসতে পারেননি। তাঁর বদলে আমরা এসেছি। কিন্তু আমি মহিলা হয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কী করে রুম শেয়ার করব?'

'বুঝতে পারছি আপনার সমস্যা। কিন্তু আমি হেল্পলেস।'

সপ্তম মুখ খুলল, 'আচ্ছা, অন্য কোনও হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে না?

'চেষ্টা করতে পারি। বেলভিউ, মাউন্ট এভারেস্টে চেষ্টা করতে পারি।'

'তার মানে?' ঘুরে দাঁড়াল মাধবিকা, 'তুমি অন্য হোটেলে গিয়ে থাকতে চাইছ নাকি?'

'এছাড়া তো সমাধানের কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'অদ্ভুত! ওই চারটে লোকের যদি রাতদুপুরে কোনও সমস্যা হয় তাহলে বাইরের হোটেল থেকে তুমি আসবে কী করে? নাকি আমাকে যেতে বলছ?' মাধবিকা ক্ষেপে গেল।

'ও। এটা মাথায় আসেনি।'

'দয়া করে মাথা পরিষ্কার রাখো।' ঘুরে দাঁড়াল মাধবিকা, 'শুনুন মিস্টার। আপনারা যদি তৃতীয় ঘর না দিতে পারেন তাহলে আমি অন্য হোটেলে শিফ্‌ট করব।'

'ম্যাডাম। আপনি চেক করে দেখুন, আমি হেল্পলেস।'

মাধবিকা বলল, 'ইন দ্যাট কেস, আপনি এভারেস্টে ফোন করুন।'

তারপরের মিনিট পাঁচেক চলে গেল বিভিন্ন হোটেলে ফোন করতে। এভারেস্ট জানালো তারা দুটো ডবল বেড রুম দিতে পারবে। উইন্ড মেয়ার পারবে একটা। সপ্তম চারপাশে তাকাল। তারপর বলল, 'সমস্যার সমাধান একটাই।'

মাধবিকা অবাক হয়ে তাকাল, 'কি?'

'তুমি যদি তোমার ঘরের টয়লেট ব্যবহার করতে দাও তাহলে একটা লেপ আর বালিশ পেলে আমি স্বচ্ছন্দে ওই ডিভানে রাত কাটাতে পারি।' সপ্তম বলল।

মাধবিকা ঘুরে ডিভানটা দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আর ইউ সিরিয়াস?'

মাথা নেড়ে হাসল সপ্তম।

কাঁধ ঝাঁকালো মাধবিকা, 'এটা তুমি ইচ্ছে করে পছন্দ করছ। আমার কোম্পানি কিন্তু এটা মেনে নেয় না। তবু।'

'তুমি এ ব্যাপারে কথা বলো না।'

'ওকে!'

এখন প্রায় বিকেল। মালোয়েশিয়ার লোকগুলো তৈরি হয়ে এল বাইরে যাওয়ার জন্যে। মাধবিকাও। সপ্তমের পোশাক বদলের সুযোগ ছিল না। ওরা ছয়জন হাঁটতে লাগল। মাধবিকার অভিজ্ঞতা আছে এখানে আসার। দার্জিলিঙের পথঘাট সে চেনে। ম্যালে পৌঁছে মালোয়েশিয়ানরা উচ্ছ্বসিত। তাঁদের সাধ হল ঘোড়ায় চড়ার। সপ্তমও মুগ্ধ

হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে যে এত সুন্দর জায়গা আছে তা তার কল্পনায় ছিল না। ঘোরাঘুরি করে সন্ধের মুখে ওরা ফিরে এল হোটেলে। মালোয়েশিয়ানদের পছন্দমত খাবারের অর্ডার দিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময় মাধবিকা সপ্তমকে বলে গেল, তার যদি টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আধঘণ্টা পরে আসতে পারে।

বিকেল থেকেই ঠাণ্ডাটা বাড়ছিল। এই একটা জ্যাকেটে বাইরে থাকা রীতিমত কষ্টকর। ঘরের মধ্যে তবু একটু আরাম লাগছে। সে যখন লবিতে একা দাঁড়িয়ে তখন রিসেপশনিস্ট ছেলেটি তাকে ডাকল, 'স্যার, একটা ভাল খবর আছে। একটু আগে একজন রুম ছেড়ে দিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেছেন। এখন ইচ্ছে করলে আপনি রুমটা নিতে পারেন।'

হাসি ফুটল সপ্তমের মুখে, 'নিশ্চয়ই।' তারপরেই খেয়াল হল মাধবিকাকে জানিয়ে ঘরটা নেওয়া দরকার। সে ইন্টারকমে মাধবিকার সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

'ইয়েস!' মাধবিকার গলা।

'সপ্তম বলছি।'

'এখনও তো আধঘণ্টা হয়নি।'

'না-না, এরা বলছে, একটা রুম হঠাৎ খালি হয়েছে, নিতে পারি?'

'কত নম্বর?' মাধবিকা জানতে চাইল।

রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে নম্বর জেনে জানাতে মাধবিকা বলল, 'ঠিক আছে।'

আরামদায়ক ঘরের বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়ে সপ্তমের মনে হল এই চাকরিটা খুবই সহজ। যেখানে ক্লায়েন্ট নিয়ে যেতে হবে সেই জায়গাটা আগে দেখা থাকলে আর তার ইতিহাসটা পড়া থাকলে স্বচ্ছন্দে কাজটা করা যায়। আজকের দিনটা সে বেশ চিন্তামুক্ত হয়ে কাটাত। সে বিছানা ছেড়ে টয়লেটে গিয়ে পরিষ্কার হল। নাঃ। এখন জামাপ্যান্ট চেঞ্জ না করে একেবারে শোওয়ার সময় করবে। এইসময় দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলল সপ্তম। মাধবিকা। ইতিমধ্যে পোশাক বদলেছে সে। মাধবিকা ঘরে ঢুকে বলল, 'সমস্যায় পড়েছি। ওরা বোধহয় ডিনারের আগে ড্রিংক করবে। আমি যেতে চাই না। তুমি যাও।'

'ওরা কি আমাদের ডাকছে?'

'তোমাকে নয়, আমাকে। কিন্তু আমার খুব মাথা ধরেছে। ধরতেই পারে। কি পারে না?'

'নিশ্চয়ই পারে।'

'অতএব যাও, ঠেকা দাও। আর শোন ওখানে গিয়ে বেশি মদ গিলবে না। ওদের ওখান থেকে ঘরে ফেরার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে আসবে।' মাধবিকা চলে গেল।

দরজায় শব্দ করতেই ভেতর থেকে গলা ভেসে এল। কী বলল তা বুঝতে পারল না সপ্তম। একটু ইতস্তত করে দরজা খুলল সে। চার মালয়েশীয় এখন তার দিকে তাকিয়ে। একজন হাসিমুখে বলল, 'কাম, কাম, হোয়ার ইজ মিস এম?' 'শি ইজ সিক। হেডেক!' ওদের মত ইংরেজি বলল সপ্তম।

সঙ্গে সঙ্গে চারজনের গলা থেকে একসঙ্গে অদ্ভুত যে শব্দটা বের হল, সেটা হতাশার। 'সিট, সিট।' একজন চেয়ার দেখিয়ে দিল।

এই ঘরটি বেশ বড়। অতিরিক্ত চেয়ারগুলো বোধহয় হুকুম করে আনানো হয়েছে। ওদের সামনে টেবিলের ওপর একটা বিদেশী হুইস্কির বোতল, গ্লাস আর জল রাখা আছে। গ্লাস দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা পান করছিল।

'ইউ আর মিটার এস?'

'ইয়েস।'

'হুইস্কি?'

'নো থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ওহো। হোয়াট নট? ইটস কোল্ড। হুইস্কি উইল বি গুড। ইউ গিভ আস কোম্পানি।' বলতে বলতে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সামান্য জল মিশিয়ে এগিয়ে দিল লোকটা। কী করবে বুঝতে পারছিল না সপ্তম। সে মদ খায় না। খাওয়ার ইচ্ছেও হয়নি কখনও। কিন্তু এখন মনে হল, সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে এরা চটে যেতে পারে। এদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি বলে রিপোর্ট করলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে গ্লাসটা ধরতেই সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল 'চিয়ার্স।'

চেয়ারে বসল সপ্তম। তার হাতে মদের গ্লাস কিন্তু তাতে চুমুক দিতে সাহস পাচ্ছিল না সে। টাকমাথা একজন একটা ম্যাপ বের করল, টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সপ্তমকে জিজ্ঞাসা করল, 'উই আর হিয়ার?'

লোকটার আঙুল দার্জিলিং-এর ওপর দেখে সপ্তম মাথা নাড়ল, 'ইয়েস।'

'দিস ইজ শিলিগুড়ি?'

'ইয়েস।'

'অনলি থ্রি আওয়ার্স জার্নি?'

আন্দাজে হ্যাঁ বলল সপ্তম।

'দিস ইজ কার্সিয়াং?'

'ইয়েস। অন দি ওয়ে টু শিলিগুড়ি। ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট টাউন।'

'ইয়েস। নট মোর দ্যান ফর্টি ফাইভ মিনিটস ফ্রম হিয়ার। লেটস গো দেয়ার।'

'ইউ ওয়ান্ট টু গো কার্সিয়াং? নাউ?'

'ইয়েস। জাস্ট টু সি দ্যাট টাউন অ্যাট নাইট।'

এ কেমন কথা। পাহাড়ে কেউ রাত্রে ঘোরাফেরা করে না। তাছাড়া এই ঠাণ্ডার রাত্রে কার্সিয়াং-এ গিয়ে ওরা তো কিছুই দেখতে পাবে না। যদি আকাশ দেখতে চায় তাহলে ওরা কার্সিয়াং-এর থেকে দার্জিলিং-এ বেশি ভাল দেখা যাবে।

'ফিনিশ ইওর ড্রিঙ্ক। ফিনিশ, ফিনিশ।' লোকটা তাড়া দিল।

কী করবে বুঝতে পারছিল না সপ্তম। মদটা খেলে যদি এরা খুশি হয়, তাহলে সে নাক টিপে গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু এই সময়ে এদের শখ মেটাতে কার্সিয়াং যাওয়ার গাড়ি কীভাবে জোগাড় করবে? সমস্যার কথা জানাতে টাকমাথা একগাল হাসল, 'নো প্রবলেম। উই উইল টেক হোটেল কার।'

অতএব মদ খেতে হল। এরকম দুর্গন্ধযুক্ত তেতো স্বাদের পানীয় কী করে লোকে খায়?'

ওরা চারজন মাছের মত মদ খেল। সপ্তমের মনে হল, এই যাওয়ার ব্যাপারটাই মাধবিকাকে জানানো উচিত। সে ওদের রিসেপশনের কাছে জমায়েত হতে বলে দ্রুত নিজের ঘরে চলে এল। ঘর থেকে সে মাধবিকাকে ফোনে পেতেই ব্যাপারটা জানাল।

'তুমি রাজি হয়েছ?' মাধবিকা বিরক্ত।

'না। কিন্তু ওরা জোর করছে।'

'কী জন্যে কার্সিয়াং-এ যেতে চাইছে?

'পাগলামি। রাতের কার্সিয়াং দেখতে চাইছে।'

'কেউ হয়ত বলেছে কার্সিয়াং-এর নাইট লাইফ আকর্ষণীয়। কিন্তু ঘটনা যে আদৌ তা নয়, বরং রাত্রে ওখানে ঘোরাফেরা করলে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি, একথা ওদের বোঝাও।'

'এরা বুঝতে চাইছে না।' সপ্তম বলল, 'তুমি এসে বোঝাবে?

'আমার ব্যাপারে কী বলেছ ওদের?'

'তুমি অসুস্থ। খুব মাথা ধরেছে।'

'গুড। ওদের বল, বিদেশীদের এই অঞ্চলে যাতায়াত করা একসময় নিষিদ্ধ ছিল। এলেও পারমিট নিয়ে আসতে হত। পুলিসের যদি কোনও কারণে রাত্রে ঘুরতে দেখে সন্দেহ হয়, তাহলে ওদের বিপদ হতে পারে।'

'বেশ বলছি।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে সপ্তমের মনে হল তার কান বেশ গরম হয়ে উঠেছে। মাতাল হয়ে যাচ্ছে না তো। এক গ্লাস মদ খেলে কেউ কি মাতাল হয়?

রিসেপশনের সামনে ওরা চারজন তখন হাসাহাসি করছে কোনও মজার কথা রিসেপশনিস্টের মুখে শুনে। সপ্তম লোকটাকে সরাসরি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল। 'এত রাত্রে বিদেশীদের ঘোরাফেরার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে?'

'আগে ছিল, এখন নেই। আর আপনারা তো গাড়িতে পাক দিয়ে চলে আসবেন। ঠিক আছে। কিন্তু এগারটার মধ্যে চলে আসবেন। তারপর ডিনার দেওয়া সম্ভব হবে না।' রিসেপশনিস্ট শেষ কথাগুলো বলল ওই চারজনের দিকে তাকিয়ে।

হোটেলের বাইরে সুমো দাঁড়িয়েছিল। ওরা চারজন পেছনে বসল, ড্রাইভারের পাশে সপ্তম। নেপালি ড্রাইভার গাড়ি চালু করতেই মালয়েশীয়দের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। ওরা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে। বিষয় কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। সপ্তম দুবার তাকাল। ওদের ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই উচিত। সে মাধবিকার মত ঘোষণা করল, 'আমরা এখন ...ং শহর ছেড়ে যাচ্ছি।'

ওরা একটু চুপ করল, তারপর নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা শুরু করল।

গাড়ির মধ্যে বসেও ঠাণ্ডা লাগছিল সপ্তমের। শহর ছাড়িয়ে কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ি এখন ওপরে উঠছে। অর্থাৎ ঘুম আসছে। কিন্তু অন্ধকারে পাহাড়ের সব জায়গাই একইরকম দেখতে। এইরকম অবস্থায় ওরা কী দেখতে পাবে? হঠাৎ মাথায় ভাবনাটা এল। ...রা অন্য কোনও কারণে কার্সিয়াং যাচ্ছে না তো? সপ্তম ভেবে নিল, যে কোনওভাবেই ...দের সঙ্গে জড়াবে না।

একটা সময় ড্রাইভারই জানাল, কার্সিয়াং আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে টাকমাথা বলল, 'হাই মিস্টার এস, লেটস গো টু এ বার। উই নিড হুইস্কি।'

সপ্তম ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কোনও ভাল বার আছে?'

'খুব ভাল নেই। যেগুলো আছে, সেখানে এত রাত্রে যাওয়া ঠিক হবে না।'

হঠাৎ টাকমাথা জিজ্ঞাসা করল, ট্যুরিস্ট লজে নিশ্চয়ই মদ বিক্রি হয়।'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না স্যার। কখনও শুনিনি।'

টাক মাথা বলল, 'লেটস গো টু ট্যুরিস্ট লজ।'

কার্সিয়াং শহরের মুখেই ট্যুরিস্ট লজ। এত রাতেও বেশ আলো জ্বলছে। এখন চারপাশে ঘন কুয়াশা কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। ওরা গাড়ি থেকে নামলে সপ্তম বলল 'আপনারা কী কী দেখতে চান বললে আমি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নিতে পারি।'

টাকমাথা বলল, 'বাইরে খুব ঠাণ্ডা, চল ভেতরে গিয়ে বসে কথা বলব।'

সপ্তম লক্ষ্য করল ওরা রাতের শহর দেখবে বলে এসেছিল, কিন্তু একবারও আকাশের দিকে তাকাল না। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা। বেয়ারা এগিয়ে এল 'সাব।'

'হুইস্কি পাওয়া যাবে?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'না স্যার। রেস্টুরেন্টে হুইস্কি সার্ভ করা হয় না।'

'কোথায় হয়?'

'কেউ নিজের ঘরে বসে খেলে খেতে পারে।'

এইসময় কোটপরা একজন এগিয়ে এসে বেয়ারাকে বলল, 'তুমি যাও।' বেয়ারা চলে গেলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ আর ফ্রম?'

টাকমাথা বলল, 'মালয়েশিয়া।'

'ওঃ। আই সি। আপনারা কি সি এমের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'ওই খবরটা পড়ে আমরা খুব উত্তেজিত। রাস্তাটা হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে কলকাতায় যাওয়া খুব সহজ হয়ে যায়। ইনফ্যাক্ট আপনাদের সঙ্গে যিনি সি এমের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি একটু আগে আমাদের লজে এসে পৌঁছেছেন।'

টাকমাথা উত্তেজিত হল, 'হু ইজ হি?

মিস্টার মালেক?'

'ইয়েস।'

'কী আশ্চর্য! উনি যে এদিকে আসবেন তা আমাদের বলেননি তো।' টাকমাথা সং দিকে তাকাল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর সঙ্গে কথা বলবেন?'

'সিওর!'

ভদ্রলোক ইন্টারকমে যোগাযোগ করলেন। মালয়েশিয়ানদের কথা বলতেই ওপা থেকে যা শুনলেন, তাতে ঘনঘন মাথা নেড়ে ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার বললেন। তারপ রিসিভার নামিয়ে রেখে টাকমাথাকে বললেন, 'আপনাদের চারজনকে ওর ঘরে যেতে বলেছেন। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন।'

চারজন শব্দটা শোনামাত্র সপ্তম বুঝতে পারল, তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। টাকমাথা তাকে বলল, 'আমরা বেশিক্ষণ এখানে থাকব না। কারণ এগারটার মধ্যে আমাদের ফিরে যেতে বলা হয়েছে। তাই না?'

সপ্তম মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

ওরা চলে গেল। এটা খুবই স্বাভাবিক। ওরা পূর্বপরিচিত। নিজেদের মধ্যে কথা বলবে। সেখানে তার উপস্থিতি নিশ্চয়ই কাম্য নয়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বেশ কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছে। ওরা কার্সিয়াং-এ এত রাতে এল মদ খেতে? মদ তো দার্জিলিং-এর হোটেলে কম ছিল না। প্রথমে বারের কথা বললেও পরে ট্যুরিস্ট লজের নাম টাকমাথা বলল কী করে? ও কি আগেই জানত, জনি মালেক এই ট্যুরিস্ট লজে এসে উঠেছে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই ওরা কার্সিয়াং-এ এল? জনি তো দার্জিলিং-এ যেতে পারত। যায়নি কেন?

যতই ঠাণ্ডা হোক সপ্তম, বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগল যতক্ষণ না একটা এস টি ডি বুথ দেখতে পাওয়া যায়। বুথ খালি এবং তখনই খেয়াল হল দার্জিলিং-এ যে হোটেলে ওরা উঠেছে, তার নাম্বার সে জানে না। কিন্তু বুথের ছেলেটিকে বলতেই টেলিফোন গাইড থেকে নাম্বারটা সহজেই পাওয়া গেল। ফোন করল সপ্তম। মাধবিকাকে পাওয়া যেতে সমস্ত ঘটনাটা সে জানিয়ে দিল। মাধবিকা হেসে বলল, 'তুমি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? আমাদের ক্লায়েন্ট কোথায় যাবে, কার সঙ্গে দেখা করবে, এ ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।'

খুব হতাশ হল সপ্তম, 'ঠিক আছে। রাখছি।'

ঠাণ্ডায় কার্সিয়াং-এর রাস্তাঘাট যেন কুঁকড়ে আছে। একটা জ্যাকেট তেমনভাবে কাজে লাগছে না। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে গাড়িতে ফিরে এল সে। মালয়েশীয়রা তখনও হোটেলে রয়েছে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই ধক করে নাকে গন্ধটা ঢুকল। ড্রাইভার মদ খাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মদ খাচ্ছ?'

'জি।'

'মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে পারবে?'

হাসল লোকটা, যেন ছেলেমানুষের কথা শুনছে। তারপর বলল, 'এই ঠাণ্ডায় দারু না খেলে মরে যাব সাব।'

গাড়ির ভেতর ঠাণ্ডাটা একটু কম, কিন্তু কনকনে ভাবটা শরীর থেকে যাচ্ছিল না। হঠাৎ প্তম জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি খাচ্ছ? হুইস্কি?'

'না সাব। কিন্তু তার চেয়েও ভাল।'

'আমি একটু খেলে তোমার কি কম হয়ে যাবে?'

'নেহি সাব একদম নেহি' এক বট্‌ল এক্সট্রা হ্যায়। আপ লিজিয়ে। লোকটা ওর দেরাজ থেকে একটা বোতল বের করে অন্ধকারেই এগিয়ে দিল। বোতলটা বড় এবং গোলাকার। সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'গ্লাসে জল আছে'

ড্রাইভার হাসল, 'ওসব লাগে না সাব। ছিপি খুলে মুখে ঢেলে দিন একটু।'

সপ্তমের মনে হল এটি বিয়ার জাতীয় কোনও পানীয়। বিয়ার তো লোকে খায় জল ছিপি খুলতেই তীব্র কটু গন্ধ নাকে লাগল। ওই গন্ধে মনে হল অন্নপ্রাশনের ভাত আসবে। শরীর গোলাতে লাগল। এ জিনিস খেতে পারবে না সে। ড্রাইভার

বোধহয় তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। বলল, 'একবার খেয়ে দেখুন, ঠাণ্ডা একদম চলে যাবে। খান সাব।'

অতএব মুখে ঢালল সপ্তম। এক ঢোক গিলতেই মনে হল একটা আগুনের গোলা কণ্ঠনালী জ্বালাতে জ্বালাতে নিচে নেমে গেল। চটপট ঠাণ্ডা তো উধাও, উল্টে শরীর গরম। দ্বিতীয়বার ঢালল সে। এখন আর গন্ধটা তেমনভাবে নাকে লাগছে না। পেছনের সিটে বসে ধীরে ধীরে বোতলটা শেষ করে ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এর দাম কত?' কিন্তু কথা বলার সময় সে নিজের কণ্ঠস্বরই চিনতে পারল না। কী রকম ভারি এবং জড়ানো।

ড্রাইভার বোতলটা নিয়ে বলল, 'ছোড় দিজিয়ে সাব।'

সপ্তমের বেশ ভাল লাগছিল এখন। মনে হচ্ছিল সে যেন কোনও দোলনায় বসে দুলছে। চোখ বন্ধ করতে খুব ভাল লাগছে। সে গাড়ির দেওয়ালে মাতা ঠেকাল।

'সাব সাব।' ড্রাইভারের গলাটা যেন বহুদূরে বাজছে। অনেক কষ্টে চোখ খুলে তাকাতে সে গান শুনতে পেল। মালয়েশীয়রা গান গাইতে গাইতে গাড়িতে উঠছে, বেশ মাতাল হয়ে গিয়েছে ব্যাটারা। অকারণে বিকট শব্দ করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল। ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করতেই ওরা যে যার সিটে বসে গেল চুপ করে।

দার্জিলিং ফিরে আসা পর্যন্ত ওরা কেউ কথা বলল না। কিন্তু হোটেলের সামনে পৌঁছনোর পর দেখা গেল, ওরা কেউ গাড়ি থেকে নামছে না। পুরোটা রাস্তা সপ্তম সোজা হয়ে বসেছিল। অনেক চেষ্টার পর ঘুমটাকে সরাতে পেরেছিল সে। নিচে নেমে এসে দারোয়ানের সাহায্য নিয়ে লোকগুলোকে নামিয়ে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিল। এদের কারও ডিনার খাওয়ার ক্ষমতা নেই। তার নিজেরও খেতে ইচ্ছে করছে না। এখন বিছানায় গিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকলেই শান্তি। এই মধ্যরাতে হোটেলটা ঝিম মেরে আছে। ঘরে ঢুকে জামাপ্যান্ট ছাড়তেই ফোন বাজল। সে ভেবেই পাচ্ছিল না, এত রাতে তাকে কে ফোন করছে? তারপর মাধবিকার কথা মনে পড়ল। রিসিভার তুলতেই মাধবিকার গলা, 'কোনও প্রবলেম হয়নি তো'

'গাড়ি থেকে নামাতে পারছিলাম না। সবাই আউট হয়ে গিয়েছে।'

'তা হোক। নিজের দায়িত্বে মদ খেয়েছে। কিন্তু পাবলিকের সঙ্গে ঝামেলা করেনি তো?'

'না। পাবলিক কোথায় যে ঝামেলা করবে?'

'তুমি ওদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছ?'

'সুযোগ পাইনি। আমাকে ফেলে দিয়ে ওরা জনি মালেকের ঘরে গিয়েছিল।'

'সেটাই স্বাভাবিক। গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে মাথা নাড়ল সপ্তম। মাধবিকা আর সে একই হোটেলে আছে প্রথমদিন দেখা হওয়ার পর যে রোমান্টিক আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, এখন সেটা একদম নেই। আচ্ছা, সে যদি এখন মাধবিকার ঘরে যায়, তাহলে ওর কি প্রতিক্রিয়া হবে?

হেসে ফেলল সপ্তম। কোথাও যাওয়ার চেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকে যাওয়া অনক বেশি আরামদায়ক। ঢুকে পড়ল সে। আঃ। পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে এমন আরাম পাবে না চোখ বন্ধ করল সে। ড্রাইভারের দেওয়া বোতলের মদটা যেন এখনও শরীরের ভেতরে

কাজ করে যাচ্ছে। অথচ মালয়েশীয়দের দেওয়া এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে তার তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, ড্রাইভারের বোতলটার দাম খুব কম। তাহলে লোকে বেশি টাকা দিয়ে দামি মদ কিনে খায় কেন?

ওরা নেমে আসছিল দার্জিলিং থেকে। আসার সময়েও ড্রাইভারের পাশে বসেছে মাধবিকা, পেছনে বাকি সবাই। মাধবিকা আজ জিনস আর জ্যাকেট পরেছে। বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে ওকে। পথে যেসব জায়গা পড়ছে তার নাম বলতে বলতে চলেছে সে। এখন ওই চারজন মালয়েশীয় বেশ শান্ত। মাথা নাড়তে নাড়তে চারপাশের প্রকৃতি দেখছে।

শিলিগুড়ির মৈনাক হোটেলে ঘর বুক করা ছিল। সেখানে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাধবিকা। লাঞ্চের পর মালয়েশীয়রা মিটিং-এ বসবে স্থানীয় সরকারি কর্তাদের সঙ্গে। নতুন রাস্তা তৈরির ব্যাপারে যেসব সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হবে। এব্যাপারে সপ্তমের কোনও 'ভূমিকা নেই।' ঠিক হয়েছে আজকের রাতটা শিলিগুড়িতে থেকে আগামীকাল ভোরে বাই রোড রওনা হবে ওরা।

লাঞ্চের পরে মালয়েশীয়রা কনফারেন্স রুমে চলে গেলে মাধবিকা সপ্তমের ঘরে এল। সপ্তম টিভি দেখছিল। ওটা বন্ধ করল। মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

'ঠিক হ্যায়। জায়গা আগে জানা থাকলে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

'কাল রাত্রে অত উত্তেজিত হয়ে ফোন করেছিলে কেন?'

'কারণ ছিল। জনি মালেক একজন শিল্পপতি এবং মাফিয়া নেতা। তার সঙ্গে কার্সিয়াং ট্যুরিস্ট লজে দেখা করার পরিকল্পনা মালয়েশীয়দের আগেই ছিল। অথচ জনি আমাদের সঙ্গে এক ফ্লাইটে আসেনি। ব্যাপারটা রহস্যজনক।'

'মনে হচ্ছে তুমি জনিকে চেন?'

'আসল জনিকে চিনি না। নকল জনির সঙ্গে কথা বলেছি।'

'কী ব্যাপার বল তো'

সমস্ত ঘটনা খুলে বলল সপ্তম। সেই মানিব্যাগ পাওয়া থেকে ইমরান রহমানের দেখা পাওয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলো শুনে মাধবিকার চোখ কপালে উঠল। সপ্তম বলল, 'আমি এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না। তোমার দেওয়া চাকরি পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছি। বাইরে চলে আসতে পেরে ভেবেছিলাম নিষ্কৃতি পেয়েছি। কিন্তু এখানেও—'

মাধবিকা ওর কাঁধে হাত রাখল, 'পুলিসকে ব্যাপারটা জানাচ্ছ না কেন?'

মুখ তুলল সপ্তম, 'পুলিসকে'?'

তুমি নিজের অজান্তে একটা ভয়ঙ্কর চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ সপ্তম। পুলিস ছাড়া কেউ তোমাকে এর ভেতর থেকে বের করে আনতে পারবে না।' মাধবিকা বলল।

'কিন্তু পুলিস আমাকে প্রশ্ন করবে এতদিন তাদের জানাইনি কেন?'

'হ্যাঁ করবে। তুমি বলবে প্রথমে বুঝতে পারিনি। বুঝতে পেরেই জানাচ্ছ।'

'কিন্তু—! তুমি বুঝতে পারছ না মাধবিকা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি কয়েকটা অপরাধ করেছি। যেমন অতগুলো ডলার কুড়িয়ে পেয়েও থানায় জমা দিইনি। রশিদের ওখানে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার ওপর অত্যাচার দেখেও রিপোর্ট করিনি। তার ওপর সুভাষদার দূত

হিসেবে জনি মালেকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। এ সব শোনার পর পুলিস আমাকে ছেড়ে দেবে বলে ভেবেছে?

'তবু, বেশি দেরি হওয়ার থেকে এখনও বললে তোমার সুবিধে হবে।'

বিছানায় বসে পড়ল সপ্তম। তাকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। মাধবিকা ওর পাশে এসে বলল, 'মন শক্ত কর, তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।'

হঠাৎ ঘুরে বসল সপ্তম, 'মাধবিকা, আমার কেমন মনে হচ্ছে এই মালয়েশীয়দের নিয়ে এসে শিলিগুড়ি-কলকাতা রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে।'

'তার মানে?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা লোক ছোটখাটো ব্যবসার আড়ালে নিজের এলাকায় মাস্তানি করত। তোলা তোলাতো লোকজন দিয়ে। হঠাৎ তাকে নির্বাচিত করা হল কলকাতার একটি এলাকার ডন হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্ট্যাটাস বদলে গেল। বিরোধী চুনোপুঁটি মাস্তানরা খুন হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। রাতারাতি তার চেহারা পাল্টে গেলে এমনভাবে যে নিজেকে শিল্পপতি হিসেবে পরিচয় দিতে তার একটুও মুশকিল হল না। আর এ ব্যাপারে লোকটা নিশ্চয়ই তার গডফাদারের সাহায্য পাচ্ছে। তা না হলে এতটা ওপরে উঠতে পারত না। আমি জানি না আমাদের সরকারি গোয়েন্দারা ওর সম্পর্কে কতটা জানে। জানলে নিশ্চযই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেত না।' একনাগাড়ে বলে গেল সপ্তম।

'মালয়েশিয়ানরা কুয়ালালামপুর থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল। ওরাই মিস্টার জনি মালেকের সঙ্গে কাজ করতে চায় বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।' মাধবিকা বলল।

'আশ্চর্য! এই মালয়েশিয়ানদের পক্ষে জনির নাম জানা সম্ভব নয়। এ সব কাজ সে কখনও করেনি। তার মানে একটাই, মালয়েশিয়ানরা দুবাইয়ের লোক।'

'ওদের স্বার্থ কী?'

'আমি জানি না। হয়ত এ সব এলাকায় ওরা কোনও কাজ করতে চায় যার জন্যে একটা আড়াল দবকার। ওই রাস্তা তৈবির প্রস্তাবটাই হল সেই আড়ালে।' সপ্তম বলল।

'সর্বনাশ।' মাধবিকা সপ্তমের হাত ধরল, 'কী করা যায় বলত?'

ঘড়ি দেখল, সপ্তম, 'নাঃ। এখন কিছু করার নেই। তা ছাড়া লোকাল পুলিসকে আমি চিনি না। কার কাছে গিয়ে সে সব বলব? সেই লোকটা কতটা গুরুত্ব দেবে?'

'ঠিক আছে। তুমি আরও দুটো দিন সবুর করো। পরশু আমরা কলকাতায় পৌঁছাচ্ছি। আমার মাসতুতো দাদা ডি আই জি পুলিস। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'আমরা মানে?'

'তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'এভাবে তো তুমি কয়েকদিন কথা বলনি মাধবিকা।'

'এই মুহূর্তে আমাদের সম্পর্ক অফিসিয়াল নয়। তাই না?' হাসল মাধবিকা।

সপ্তম আবিষ্কার করল মাধবিকার চোখে ওই মুহূর্তে কী আশ্চর্য আলো জ্বলে উঠল।

শিলিগুড়ি শহর থেকে সুমো গাড়িতে ওরা যখন বের হল তখন সকাল আটটা। এর মধ্যেই রাস্তায় রিকশ এবং অটোর ভিড়। সিনক্লেয়ার হোটেলের কাছে এসে মালয়েশিয়ানরা গাড়ি থামিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে মাধবিকাকে জানাল, যে তারা এই রাস্তাটা আর একবার দেখতে চায়। মাধবিকা বলল, 'আগে রাস্তাটা আরও সরু ছিল। এখন চওড়া হয়েছে। তবু ভিড় কমছে না।'

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে মহানন্দা ব্রিজ ছাড়িয়ে এয়ারভিউ পর্যন্ত চলে এল। সপ্তম লক্ষ্য করল ওরা ডায়েরি বের করে ক্রমাগত কিছু লিখে যাচ্ছিল। কাজের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস হলে লোকে এভাবে লেখালেখি করে। তা হলে কি সে ভুল ভেবেছে? এই লোকগুলো সত্যিই রাস্তা তৈরি করতে এসেছে?

গাড়ি আবার কলকাতামুখী হল। শহর ছাড়াবার পরেই হাইওয়ে। কিন্তু এই হাইওয়ের বদলে আট লেনের রাস্তা হবে। অর্থাৎ এর তিনগুণ চওড়া। তার মানে অনেক গাছ কাটা যাবে, ঘরবাড়ি ভাঙা পড়বে। হয়ত চায়ের জমি দখল করা হবে। সে সব মাপজোক করতে পারে টেকনিক্যাল লোকজন আসবে, কত সার্ভে হবে, কত আলোচনা, তারপর মাটি কাটা হবে, রাস্তা শেষ হতে কত বছর লাগবে তা ঈশ্বরই জানেন। বাগডোগরার মোড়ে এসে ঘড়ি দেখল সপ্তম। এভাবে চললে কলকাতায় পৌঁছতে মধ্যরাত হয়ে যাবে। অবশ্য মাধবিকা বলেছে আজকের রাত বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজে থাকবার ব্যবস্থা করছে। কাল সকালে কলকাতায় যাওয়া হবে সেখান থেকে।

এই সময় রাস্তার ধারে দাঁড়ানো তিনটে গাড়ির ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে হাত দেখালে সুমো থেমে গেল। সপ্তম দেখল, সামনের গাড়ি দুটো টাটা সাফারি, পেছনেরটা পুলিসের জিপ। গাড়ি থামামাত্র একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে ছবিতে দেখা মিস্টার মালেক এগিয়ে এলেন গাড়ির পাশে। মিস্টার মালেক বললেন, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

মাধবিকা বলল 'মর্নিং।'

পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এঁকে চিনতে পারছেন, মিস্টার জনি মালেক।'

'অফকোর্স।' গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল মাধবিকা, 'আপনার গেস্টদের নিয়ে আমরা রওনা হয়েছি।'

'গুড। আমি ভেবেছিলাম বাগডোগরা থেকে প্লেনেই ফিরে যাব, কিন্তু পরে মনে হল আমাদের অনারেবল গেস্টদের সঙ্গে আমার থাকা দরকার। এই জার্নি অবশ্যই ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স। তবু এ সময় আমি সঙ্গে থাকলে আমারও অভিজ্ঞতা বাড়বে। আফটার অল এই প্রজেক্টের সঙ্গে আমি শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে থাকব।' জনি মালেক বললেন।

ততক্ষণে মালয়েশিয়ানরা নেবে পড়েছেন। একজন উত্তেজিত হয়ে নোটবুক দেখালেন। তাঁদের নিয়ে একটু আলাদা সরে গেলেন মিস্টার মালেক। মিনিট দুয়েক বাদে ফিরে এসে বললেন, 'অফিসার, আমার গাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে, অতিথিদের নিয়ে আমি ওই গাড়িতেই উঠছি। ম্যাডাম, আপনারা আমাদের ফলো করতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই' মাধবিকা মাথা নাড়ল।

অফিসার বললেন, 'আমার ওপর হুকুম আছে আপনাদের এই জেলার বর্ডার পর্যন্ত

এসকর্ট করার। তা হলে আমি আগে যাচ্ছি।' 'কোনও দরকার নেই। কেন মিছিমিছি কষ্ট করবেন। এখন দিনের বেলা, এতগুলো পুরুষ একসঙ্গে আছি, কোনও ভয় নেই। তা ছাড়া দ্বিতীয় গাড়িতে আমার সিকিউরিটির লোকজন আছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ অফিসার।' মিস্টার মালেক মাথা নেড়ে পেছন ফিরলেন।

'স্যার, এস পি সাহেব বলেছিলেন—!' অফিসার যেন মুক্তির আনন্দ পাচ্ছেন।

'উনি কিছু বললে আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব। বাই।'

মালয়েশিয়ানদের নিয়ে মিস্টার মালেক টাটা সাফারিতে উঠে গেলে মাধবিকা আবার গাড়িতে উঠল। দুটো গাড়ি এগিয়ে গেলে মাধবিকা সুমোর ড্রাইভারকে বলল ওদের অনুসরণ করতে।

সপ্তম অবাক হয়ে বসেছিল। এবার বলল, 'অবিশ্বাস্য।'

'কেন?' মাধবিকা পেছন ফিরে তাকাল।

'যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে কিছুকাল আগে যে লোকটার পরিচয় ছিল স্থানীয় মাস্তান-ব্যবসায়ী সে কী করে এত আদবকায়দা বজায় রেখে কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে পারছে?' সপ্তম উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বলল।

মাধবিকা চট করে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। স্থানীয় নেপালি ড্রাইভার। বাংলা চমৎকার বোঝে। তবে যে কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের সঙ্গে ওর এজেন্সির বহুদিনের যোগাযোগ। মাধবিকা হাসল, 'অসম্ভব বলে কোনও কিছুকে বাতিল করা বোকামি। কিন্তু আমি এখানে বসে আছি কেন? আমাকে তো আর গাইডের কাজ করতে হচ্ছে না। এখন আমি বেকার। ড্রাইভার গাড়ি থামাও।'

গাড়ি থেমে যেতে মাধবিকা দরজা খুলে পেছনে চলে এল, 'চল ভাই। এখন ইচ্ছে করলে এখানে শোওয়ার জায়গা করে নিতে পারি।'

পাশে বসা সপ্তম বলল, 'তুমি আমার কথায় গুরুত্ব দিলে না?'

মাধবিকা নিচু গলায় বলল, 'তৃতীয় ব্যক্তির কানে কথাগুলো যাওয়া কি ঠিক?'

'ও।' সতর্ক হল সপ্তম। তার কণ্ঠস্বর নিচে নামল, 'লোকটা পুলিস এসকর্ট পেল কী করে?'

'বিদেশীরা এদেশের উপকার করতে আসছে, চাইলেই সরকার তাঁদের রক্ষা করবে।'

'কিন্তু—!'

'কি কিন্তু?'

'এই যে জনি মালেক ওদের আলাদা গাড়িতে তুলে নিল এসব কথা তো ছিল না।'

'ছিল না। কিন্তু ওরা আমাদের ক্লায়েন্ট। গাড়িতে না ফিরে ওরা প্লেনে ফিরতে পারত। আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তার টাকা আমরা পেতাম'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই প্ল্যানটা ওর আগেই করা ছিল। নইলে কার্সিয়াং পর্যন্ত লুকিয়ে ধাওয়া করতেন না। আর ওর সঙ্গে দ্বিতীয় যে গাড়িটা ছিল তার দিকে তাকিয়েছ?'

'না।'

'আমি দেখেছি। ওরা মাস্তান ছাড়া কিছু নয়।'

'উনি বললেন ওঁর সিকিউরিটি।'

'আচ্ছা. ওঁরা তো ওদের মত যাচ্ছেন। আমরা যদি প্লেন ধরে চলে যাই?'

'না। সেটা পারি না। চুক্তি অনুযায়ী আমার সুমো গাড়িতে যাওয়ার কথা। ধরো ইসলামপুরে পৌঁছে মালোয়েশিয়ানরা ওই গাড়ি থেকে নেমে এ গাড়িতে চলে এল। তখন?'

সপ্তম কথা বলল না, কিন্তু সে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

মাধবিকা হাসল, 'তোমাব নাম শুনলে মিস্টার মালেক চিনতে পারতেন?'

তাকাল সপ্তম, 'কি জানি।' তারপরেই খেয়াল হল, হ্যাঁ পারত। ও যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে এয়ারপোর্টে ডামি পাঠিয়েছিল তখন আমার নাম ওর অজানা নয়।

'সেক্ষেত্রে কি রিঅ্যাকশন হত তাই ভাবছি।'

'সামনাসামনি কিছু বলত বলে আমার মনে হয় না।' সপ্তম বলল।

দুটো গাড়ি যতই স্পিডে ছুটুক সুমোর পক্ষে ওদের সঙ্গে তাল রাখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। ওপাশ থেকে লরির পর লরি আসছে। পুলিসের গাড়িগুলোও ওভারটেক করছিল সাফারি। মাধবিকা বলল, 'ড্রাইভার, তোমাকে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার নেই।'

'জি মেমসাহাব।' গাড়ির গতি কমল।

গাড়ি যখন বিহারে ঢুকল তখন ওদের দেখতে পেল সপ্তমবা। রাস্তার পাশে একটি সমৃদ্ধ ধাবার সামনে গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার সেখানে গিয়ে গাড়ি থামাতেই একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, 'সাহেবরা এখানে একটু রেস্ট নিচ্ছেন। আপনারা ইচ্ছে হলে এগিয়ে যেতে পারেন, আমরা ঠিক আপনাদের ধরে নেব।'

মাধবিকা বলল, 'ঠিক আছে। তার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।'

লোকটির মুখ দেখে মনে হল অপছন্দ হলেও সে প্রস্তাবটা মেনে নিচ্ছে। মালোয়েশিযানরা বা জনি মালেককে দেখা যাচ্ছে না। ধাবাটা বড়। পেছনে সুন্দর ঘর আছে। তার কোনও একটাতে ওরা থাকতে পারে। চা বলল সপ্তম। রাস্তার দিকে একটা বেঞ্চিতে বসে মাধবিকা নিচু গলায় বলল 'তোমার কথাই ঠিক'।

'কী রকম?'

'পেছনের গাড়িতে সিকিউরিটি বলতে যে চারজন ছিল তারা এখন ধাবার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে দেখলে মনে হবে ওদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। মাধবিকা বলল।

'কী করবে? চা খেয়েই রওনা হবে?'

'মিস্টার মালেক যদি ওঁদের দায়িত্ব নেন তাহলে আমাদের কিছু করার নেই।' এই সময় একটা আম্বাসাডার গাড়ি মালদার দিক থেকে এসে ধাবার সামনে দাঁড়াতেই সেই সিকিউরিটির লোকটি এগিয়ে গেল। একটু ঝুঁকে আরোহীর সঙ্গে কথা বলার পর সে দরজা খুলে ধরল। যে দু'জন নেমে এল তাদের পরনে ধূসর রঙের সাফারি, খুব দ্রুত হেঁটে ধাবার ওপাশে চলে গেল ওরা।

চা শেষ হয়ে গেলে সুমোর কাছে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে সিকিউরিটির লোকটিকে ইশারায় ডাকল মাধবিকা। সে কাছে এলে বলল, 'আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আপনি মিস্টার মালেককে জিজ্ঞাসা করুন কোথায় ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব? বহরমপুরের ট্যুরিস্ট লজে?'

লোকটি একটু হতভম্ব করল। তারপর জবাবের জন্যে ভেতরে দিকে পা বাড়াল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল লোকটা। বলল, 'বহরপুর।'

একটিও কথা না বাড়িয়ে মাধবিকারা রওনা হল। হঠাৎ সপ্তমের মাথায় কিছু প্রশ্ন এল। সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ভাই, তুমি তো শিলিগুড়িতে থাক, তাই না?'

'জি সাব।' গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল নেপালি ড্রাইভার।

'ওই যে গাড়ি দুটো ধাবায় দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের আগে আগে এসেছে, ওদের ড্রাইভারদের তুমি চেন?' জিজ্ঞাসা করল সপ্তম।

'না স্যার, ওই গাড়ি শিলিগুড়ির না।'

'কোথাকার?'

'বিহারের নাম্বার।'

'ও। ঠিক আছে।'

মাধবিকা হাসল, 'তোমার গোয়েন্দাগিরির ফল কি?'

'ওই সিকিউরিটির লোকগুলো দুটো গাড়ি নিয়ে বিহার থেকে শিলিগুড়িতে গিয়েছিল ওদের আনতে। দেখবে, বিভিন্ন পয়েন্টে কিছু কিছু লোক এসে ওদের সঙ্গে দেখা করবে। সব আগে থেকে ব্যবস্থা করা আছে।' সপ্তম বলল।

'একটা ভয়ঙ্কর কিছু উত্তর বাংলায় করতে চায় এরা।'

'ভয়ঙ্কর কিছু মানে?'

'সেটা এখনও বুঝতে পারছি না।'

'সপ্তম, তুমি বলেছিলে ওদের সঙ্গে জড়াতে চাও না। কিন্তু নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছ।' মাধবিকার কথা শুনে সপ্তম ওর দিকে তাকাল, 'চক্রান্তের গন্ধ পেলে চোখ বুজে থাকা যায়? তুমি কী বল?'

'এই মুহূর্তে তোমার বা আমার কিছু করার নেই। কলকাতায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেই। তারপর ভেবো।' মাধবিকা বলল।

'তোমার মাসতুতো দাদা কি অনেস্ট মানুষ?'

'তার মানে?' হাঁ হয়ে গেল মাধবিকা।

'কিছু মনে করো না, পুলিস সম্পর্কে নানান কথা শোনা যায়—।'

'উনি অধ্যাপনা করতেন। হঠাৎ আই পি এস দিয়ে পুলিসে এসেছেন। এর বেশি আমি জানি না।'

একসময় মালদা এসে গেল। শহরে ঢোকার আগে একটা ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওরা লাঞ্চ সারল। ড্রাইভারের রুটি মাংসে আপত্তি থাকায় তাকে টাকা দিয়ে দিল মাধবিকা।

'এখানে তো ভাতও আছে। খেল না কেন?' 'ও আমাদের সামনে খাবে না।' মাধবিকা বলল, 'এক পাঁইট হুইস্কি কিনে অর্ধেক গিলে তবে খাবে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'সেকি?' ঘাবড়ে গেল সপ্তম, 'অতটা মদ খেয়ে গাড়ি চালালে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য।'

'বোধহয় না।'

'তার মানে?'

'না খেলেই ওর ঝিমুনি আসবে, হাত কাঁপবে।'

'সর্বনাশ।'

'তুমি হুইস্কি খাও না?'

'না।' মাথা নাড়ল সপ্তম।

'অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত মানে?'

'এই বয়স পর্যন্ত বিয়ে করিনি। মদ খাও না—। গার্ল ফ্রেন্ড আছে?'

'দুর! ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি।'

'তাহলে মা-মাসিদের কাছে তুমি সোনার ছেলে।'

'পকেটের জোর থাকলে হয়ত হতাম।'

'তোমার তুলনায় আমি তো ওদের চোখে খুব খারাপ।'

'কেন?'

'বাঃ, আমি ডিভোর্সি, স্বামীকে ত্যাগ করেছি। মাঝেমধ্যে এক-দুই পেগ হুইস্কি খাই। একা একা চলাফেরা করি। তোমার কী মনে হয়?'

'এসব করেও যে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পারে তাকে শ্রদ্ধা করি।'

'শ্রদ্ধা? তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর?' সশব্দে হেসে উঠল মাধবিকা।

'আশ্চর্য। কাজের ক্ষেত্রে তুমি আমার বস নও?'

'এই মুহূর্তে আমরা অফিসে নেই, সামনে কোন ক্লায়েন্টও দেখতে পাচ্ছি না। এখন তো আমরা স্রেফ আড্ডা দিচ্ছি। তাই না? এখনও শ্রদ্ধা?'

'শ্রদ্ধা না থাকলে ভালবাসা যায় না।' সপ্তম নিচু গলায় বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মাধবিকার মুখের চেহারা বদলে গেল। রসিকতা বা তরল ভাবটা উধাও হয়ে গেল। মাথা নাড়ল সে, 'ঠিক বলেছ। ঠিক ওই কারণে আমাকে ডিভোর্স নিতে হয়েছে।'

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ রইল। সামনের হাইওয়ে দিয়ে একের পর এক গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। হঠাৎ মাধবিকা বলল, 'তুমি খুব ভাল।'

'কেন মনে হচ্ছে?'

'কাল রাত্রে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। বেশ দুর্বল হয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি একবারও সুযোগ নিলে না। আমার সম্পর্কে তোমার মনে দুর্বলতা আছে কি না তা বোঝার সুযোগই দিলে না। ঘরে ফিরে মনে হয়েছিল, আমাকে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ নয়। অন্তত যে রকমের মেয়ে তোমার কল্পনায় আছে তার সঙ্গে আমার কোনও মিল নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি সুযোগসন্ধানী নও।' মাধবিকা বলল।

সপ্তম তীব্র আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু মাধবিকা তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে তাকাতেই সপ্তম দেখতে পেল জনি মালেকের টাটা সাফারি হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে ধাবার সামনে তাদের গাড়ি দেখে বেশ জোরে ব্রেক কষল।

টাটা সাফারিতে বসে থাকা মালয়েশিয়ানরা হাত নাড়লেন। মাধবিকাও হাসিমুখে সেটা ফিরিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমরা এখানে লাঞ্চ করেছি। আপনারা যদি ইচ্ছে করেন সেরে নিতে পারেন।' মালয়েশিয়ানরা কিছু বলার আগেই ড্রাইভারের পাশে বসা সেই সিকিউরিটির লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, 'ইন্ডিয়ানদের মত এদের যখন-তখন খিদে পায় না। আমরা এগোচ্ছি, আপনারা আসুন।'

'আপনারা তা হলে বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজে থাকবেন।' মাধবিকা চেঁচিয়ে বলতে না বলতেই ওরা বেরিয়ে গেল।

বিড়বিড় করতে করতে ফিরে এল মাধবিকা, 'আচ্ছা অভদ্র লোকজন!'

সপ্তম উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'মিস্টার জনি মালেককে দেখতে পেলাম না কিন্তু।' 'না। উনি বোধহয় আর গাড়িতে না গিয়ে আকাশ ভ্রমণ করবেন।'

'আকাশ ভ্রমণ'

'যেখানে ওদের ছেড়ে এসেছিলাম সেখান থেকে বাগডোগরায় ফিরে গিয়ে প্লেন ধরতে পারবেন অনায়াসে। কোনও কোনও ক্লায়েন্ট এরকম মুডি হয়।'

এই সময় ড্রাইভারকে দেখা গেল হাসি হাসিমুখে এগিয়ে আসতে। সপ্তম সন্দেহের চোখে দেখেও ঠিক বুঝতে পারল না লোকটার পা টলছে কিনা।

মালদা শহরকে পাশে রেখে ফরাক্কায় চলে এল ওরা। সপ্তম ড্রাইভারকে বারংবার সতর্ক করেছে যাতে সে আস্তে গাড়ি চালায়। মাধবিকা হেসে বলেছে, 'এভাবে চললে তো বহরমপুরে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

'হোক না, আমাদের তো কোনও তাড়া নেই। ওর পেটে মদ আছে, জোরে চালাতে দিলে কখন কী করে ফেলবে কে জানে?' সপ্তম বলেছিল।

মাধবিকা জানে জনি মালেকের ব্যাপারে সপ্তম খুব টেনশনে আছে। কিন্তু এখন তার কাছেও বোধগম্য হচ্ছিল না শিলিগুড়ি থেকে সুমো গাড়ি ভাড়া করার পরেও ওরা আলাদা গাড়িতে যাচ্ছে কেন? হঠাৎ কি আবিষ্কার করেছে যে বাইরের লোকের সামনে অনেক কথা বলা যাবে না। এখন মনে হচ্ছে কোনও রকমে কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারলে রক্ষে।

সে সপ্তমের দিকে তাকাল। অদ্ভুত উদাস ভঙ্গিতে বসে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ফারাক্কা আসতেই সেই ঔদাসীন্য ভাঙল। 'বাঃ, দারুণ। একটু নামা যাবে'

আগে ব্রিজের ওপর গাড়ি থামানো নিষেধ ছিল। এখন মিনিট দুয়েকের জন্য থামালে তেমন প্রতিবাদ শোনা যায় না। ঠিক মাঝখানে গিয়ে ড্রাইভার গাড়ি এক পাশে থামাতে ওরা নেমে পড়ল। এখন গঙ্গা বেশি চওড়া নয়। কিন্তু প্রচণ্ড জোরে জলের স্রোত বেরিয়ে যাচ্ছে এক-একটি লকগেট দিয়ে বাংলাদেশের দিকে।

হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল, 'আচ্ছা মাধবিকা, এই ব্যারেজ ভারতবর্ষের জন্যে খুব জরুরি, না?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেউ যদি ব্যারেজটাকে উড়িয়ে দিতে চায়?'

'কি পাগলের মত কথা বলছ। গাড়িতে ওঠো।' হাওয়া বইছিল খুব। চুল সামলাতে সামলাতে গাড়িতে উঠে পড়ল মাধবিকা। ওকে অনুসরণ করে গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার

বাড়াল। সপ্তম বলল, 'মোটেই পাগলের মত কথা নয়। যারা এই দেশের সর্বনাশ করতে চায় তাদের নিশ্চয়ই কয়েকটা টার্গেট আছে। ফারাক্কা ব্যারেজ উড়িয়ে তারা দিতে চাইবে।'

'চাইলেও পারবে না। জায়গাটা ওয়েল প্রোটেকটেড। প্রতি মুহূর্তে সশস্ত্র রক্ষীরা চোখ রাখছে। এই যে আমরা দাঁড়ালাম এটাও ওদের নজর এড়ায়নি।'

'ওয়েল প্রোটেকটেড হওয়া সত্ত্বেও বিমান ছিনতাই হয়। হয় না'

জবাব দিতে না পেরে সপ্তমের দিকে তাকাল মাধবিকা, 'তুমি এত নেগেটিভ কথাবার্তা বল কেন? পজিটিভ ভাবনা ভাবতে অসুবিধে হয় কেন?'

সপ্তম মাধবিকার হাত ধরল, 'আমার আজকাল খুব ভয় করে।'

'কেন?'

'পৃথিবীতে কিছু মানুষের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে যাদের মনে প্রেম ভালবাসা া নেই। তারা রোবটের মত কারও নির্দেশ পালন করছে। সেটা করার সময় ওদের মন কটুও নরম হচ্ছে না। পাকিস্তান ভারতবর্ষের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ না করে হাজার হাজার ন্ত্রাসবাদী এদেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে যারা শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলবে। এই লোকগুলো কত টাকা পায় জানি না কিন্তু এদের মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ঘেন্না তৈরি করে দেওয়া য়েছে। তুমি জানো না মাধবিকা, কলকাতা শহরের আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ল্ডের কাজকর্ম এখন নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে চারজন নির্বাচিত মাফিয়ার মাধ্যমে। আবার সেই সব াফিয়াদের বাইরেব আস্তরণ হিসেবে ব্যবসাপত্র, শিল্প-টিল্প থাকছে। চট করে তাদের ায়ে হাত কেউ দিতে পারবে না। আর খুব সম্প্রতি এদের নির্বাচন করে অধিকার দেওয়া ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। তোমার ভাবতে কেমন লাগছে?' সপ্তম জিজ্ঞাসা বল।

'খুব খারাপ। পুলিস জানে না?'

'জানি না।'

'তুমি কলকাতায় ফিরেই দাদাকে সব জানিয়ে দাও।' বলেই মাধবিকার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কিন্তু।'

'কিন্তু মানে?'

'তোমার কোনও ক্ষতি হবে না তো?'

'যেটুকু বুঝেছি ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে না।'

'তা হলে?' মাধবিকা চোখ বন্ধ করল, 'একটা কাজ করতে পারি।'

'কি?'

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি দাদাকে সব কথা বলতে পারি। দাদা যে আমার থেকে খবর পেয়েছে তা কেউ জানতে পারবে না। যদি কোনও প্রমাণ দেওয়া যেত।'

'প্রমাণ?' মাথা নাড়ল সপ্তম, 'না, কোনও প্রমাণ নেই।'

'সেটাই সমস্যা হবে। দেখি, বলে তো দেখি।'

'হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সপ্তম, 'আছে। প্রমাণ আছে।'

'কি রকম?'

'একটা লোক, তাকে ওরা অফিসার বলে, লোকটাকে ধরলে পুলিস ওর কাছ থে সব খবর পেয়ে যাবে।' উত্তেজিত গলায় বলল সপ্তম।

'অফিসার?'

'হ্যাঁ। কীসের অফিসার তা আমি জানি না। এয়ারপোর্ট দু'নম্বর ডামি মালেকের স আমার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়েছিল লোকটা। আবার সুভাষদার কাছেও যাতায় আছে। বরের ঘরের পিসি এবং কনের ঘরের মাসি।' সপ্তম বলল।

'লোকটার নাম কি?'

'জানি না। মানে জানার সুযোগ হয়নি।'

'আশ্চর্য! একটা লোকের সঙ্গে কথা বলেছ, অথচ তার নাম জিজ্ঞাসা করোনি .

'তুমি বুঝবে না। তখন এমন ঘোরের মধ্যে সব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল—।'

'তা হলে লোকটাকে পাওয়া যাবে কী করে?'

'আমাকে একটা দিন সময় দাও। কলকাতায় গিয়েই আমি ওর নাম-ধাম জেনে নি তোমায় জানাবো।' সপ্তম বলল।

'দেখো, তুমি যে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর করেছ তা যেন বেশি লোক জানতে পারে।'

মাধবিকা খুব গাঢ় গলায় কথাগুলো বলল। বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজে ওরা বিকেলে মধ্যে পৌঁছে গেল। লজের সামনে একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। টাটা সাফারির দে পাওয়া গেল না।

রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মালয়েশিয়ানরা এখনও ট্যুরিস্ট লজে আসেনি বেশ অবাক হল মাধবিকা। সপ্তমের দিকে তাকাল সে, 'আমরা তো রাস্তায় ওদের দেখা পাইনি।'

'না। গাড়ি খারাপ হলে নিশ্চয়ই দেখা যেত।'

'তাহলে?'

'ওরা যদি মালদা শহরে না ঢুকে থাকে তাহলে আমাদের অনেক আগে এখানে পৌ যাওয়ার কথা। আর একটু অপেক্ষা করে দ্যাখো।' সপ্তম বলল।

'ওদের মালদায় যাওয়ার কথা ছিল না। শুধু হাইওয়ে দেখবে বলে জানতাম।' মাধবি ঘড়ি দেখল।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। মালয়েশিয়ানদের জন্যে ঘরের ক বলে ওরা যে যার ঘরে চলে এল। এতটা পথ গাড়িতে এলেও শরীরে ক্লান্তি জমে। জু খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল সপ্তম। আঃ, কী আরাম।

শুয়ে শুয়ে সে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। এই মালয়েশিয়ানরা যে সত্যি মালয়েশি থেকে এসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হয়ত পেশায় এরা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। কি কেবলই মনে হচ্ছে, শুধু রাস্তা তৈরি করতে এরা আসেনি। কোনও প্রমাণ নেই তবু ম হচ্ছে। ওরা এই ট্যুরিস্ট লজে থাকবে, ঘর ঠিক রাখা আছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে জ মালেকের লোক আছে। সে থাকবে কোথায়? তার জন্যে তো ঘর ঠিক করে রাখে ট্র্যাভেল এজেন্সি।

এইসময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই মাধবিকার গলা পেল সে, 'সপ্তম, আমি এইমাত্র কলকাতায় বস্-এর সঙ্গে কথা বললাম।'

'উনি কি বললেন?'

'অপেক্ষা করতে। ওরা বোধহয় গৌড় দেখতে গিয়েছে।'

'গৌড়? মালদহের পাশে ঐতিহাসিক জায়গা?'

'হ্যাঁ।'

'উনি সেকথা জানলেন কী করে?'

'আমাব কথা শুনে বস্ জনি মালেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। জনি তাঁকে বলেছে যে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, ওরা গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যেতে পারে।'

'জনি মালেক? সে তো এখন বাগডোগরায়।'

'বাগডোগরা থেকে সাড়ে তিনটের ফ্লাইট ধরলে কলকাতায় পৌঁছে অফিস করা যায়।'

'ও তাই।'

'আমি সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুলিসকে ইনফর্ম করব।'

'আমাকে কী করতে হবে বলো?'

'বলব।' লাইন কেটে দিল মাধবিকা।

গৌড়। লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন। এসব জায়গার কথা অল্প বয়সে ইতিহাস বই-এর পাতায় পড়েছে কিন্তু দেখা হয়নি। মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে ঘর থেকে বের হল সপ্তম। এখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। ট্যুরিস্ট লজের রেস্টুরেন্টে গোটা চারেক মানুষ খাওয়া-দাওয়া করছেন। একটা খালি টেবিল দেখে এগিয়ে গিয়েও মন পাল্টালো সে। এক ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে সে ওই টেবিলে চলে এল, 'বসতে পারি?'

'অবশ্যই। ট্যুরিস্ট?'

'না, তবে ওইরকম।'

'এখানকার চা খুব ভাল।' ভদ্রলোক কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালেন।

বেয়ারাকে শুধু চা আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ট্যুরিস্ট?'

'না মশাই। ওষুধ বিক্রি করি। মুর্শিদাবাদ আর মালদার প্রতিটি ইঞ্চি জমি আমি চিনি।' বলতে বলতে মাথা নাড়ল লোকটা। বেশি কথা বলার অভ্যাস স্পষ্ট।

'আচ্ছা, মালদার হাইওয়ে থেকে গৌড় কতদূর?'

'যাবেন? গিয়ে কোনও লাভ হবে না। অনেককাল অবহেলায় পড়েছিল, এখন একটু দেখাশোনা হচ্ছে। কিছু পুরনো ইঁটের বাড়ি, জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।'

'তবু তো লোক যায়।'

'যাদের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বেশি তারা যায়। শেষ হিন্দু রাজা এবং প্রথম নবাবের স্মৃতি জড়িয়ে থাকার কথা, চিহ্নগুলো অবশ্য নেই।'

চা এল। চুমুক দিয়ে সপ্তম বুঝল ভদ্রলোক মিথ্যে বলেননি।

'মালদায় হিন্দু-মুসলমান সেই গৌড়ের আমল থেকে একসঙ্গে বাস করে আসছেন এঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ হয়নি। এটা খুব ভাল ব্যাপার।' সপ্তম বলল।

'যা বলেছেন। আমাদের গনিখান সাহেব, ওঁর পরিচয় উনি বাঙালি। হিন্দুরা ওঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। নইলে বছরের পর বছর উনি এম পি থাকতে পারতেন না। তবে—।'

ভদ্রলোক কথা শেষ না করতে তাকাল সপ্তম। ভদ্রলোক বললেন, 'সেই পাকিস্তান আমল থেকেই এটা চলছে। আজেবাজে লোক বর্ডার পেরিয়ে এদেশে ঢুকছে। মালদায় বর্ডার পার হওয়া তো ওদের কাছে জলভাত। একা গনিখান সাহেব আর কত আটকাবেন। ওই লোকগুলো সম্পর্কে বিষিয়ে দেবে। এই যে গৌড়ের কথা বললেন, ওখানেও বর্ডার পেরিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।'

'পুলিস ওদের ধরছে না?'

'জনতার একটি অংশকে কিনে নিতে পারলে অনায়াসেই জনস্রোতে মিশে যেতে পারা যায়'। ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্য করতেই মাধবিকাকে দেখতে পেল সপ্তম। মাধবিকাও তাকে দেখেছে। সে মাথা নেড়ে আসতে বলল তাকে।

মাধবিকা কাছে এলে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সপ্তম, 'বসো। এখানকার চা ভাল।'

'কি? ঠিক বলেছিলাম তো?' ভদ্রলোক হাসলেন।

'খবরটা উনি দিয়েছিলেন।'

'আপনার নামটা জানা হল না। আমি প্রভাত সেন।'

'আমি সপ্তম চ্যাটার্জি।'

'খুব ভাল লাগল আলাপ করে। মুর্শিদাবাদ ঘুরে দেখেছেন'

'না।'

'সে কী! কাল ভোরেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। মিসেস চ্যাটার্জির ভাল লাগবে।'

'মিসেস চ্যাটার্জি?' চমকে উঠল সপ্তম।

'মানে ইনি—।'

'আমরা সহকর্মী।' গম্ভীর গলায় বলল মাধবিকা।

'ও। আচ্ছা, উঠি। আমাকে আবার বাস ধরতে হবে।' প্রায় আচমকাই উঠে গেলেন প্রভাত সেন। তাঁর যাওয়া দেখতে-দেখতে মাধবিকা বলল, 'বাচাল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা খবর জানা গেল।'

'কী? মালদায় বিদেশীরা সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসছে। আর গৌড় এলাকায় তাদের সংখ্যা বাড়ছে।' সপ্তম বলল।

'এই খবর জেনে তোমার কী লাভ হবে?'

'মালয়েশিয়ানদের নিয়ে জনি মালেকের লোক ওদিকে গেল কেন? ঐতিহাসিক স্থান দেখতে গিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করছি না। যাক গে, কী খাবে বল?'

সাড়ে সাতটা বেজে গেলেও যখন ওদের দেখা পাওয়া গেল না তখন মাধবিকা সিদ্ধান্ত নিল থানায় ফোন করবে। রিসেপশনিস্টকে বলতে ভদ্রলোক বললেন, 'ফোনে কাজ হবে না ম্যাডাম। আপনি সরাসরি থানায় গিয়ে ডায়েরি করুন।'

এখন পৌনে আটটা। সপ্তমকে নিয়ে মাধবিকা যখন বেরতে যাচ্ছে তখন রিসেপশনিস্টের গলা শুনতে পেল, 'ম্যাডাম, আপনার ফোন আছে। তাড়াতাড়ি আসুন।'

দ্রুত কাউন্টারে ফিরে এসে রিসিভার তুলল মাধবিকা, 'হ্যালো, মাধবিকা বলছি।'

'গুড ইভনিং ম্যাডাম। কলকাতা থেকে বলছি। শুনলাম আপনি খুব চিন্তিত কারণ মালয়েশিয়ানরা এখনও ট্যুরিস্ট লজে রিপোর্ট করেননি। আপনাদের বস্-এর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। এ নিয়ে কোনও চিন্তা করার দরকার নেই। চারজন পুরুষ আত্মীয়স্বজনদের বাইরে থাকলে একটু ফুর্তি করতে চায়। ওরা তাই করছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আমি মিস্টার মালেকের সেক্রেটারি।' লাইনটা কেটে গেল।

রিসিভার রাখতেই সপ্তম পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী হল?'

'ক্লায়েন্টের সেক্রেটারি ফোন করে জানাচ্ছে আমি যেন চিন্তা না করি।'

'তাহলে?'

'তাহলে আমার আর কিছু করার নেই।'

'কিন্তু ধরো, ওদের কিছু হল, আর আমাদের ক্লায়েন্ট স্বীকারই করল না ফোনে তোমাকে কিছু বলেছে বলে—।'

'দূর। আমি এত ভাবতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি বলছি মাধবিকা এর মধ্যে রহস্য আছে। এরা অত সোজা মানুষ নয়।'

দশটার সময়ে মালয়েশিয়ানরা এসে গেল। মাধবিকার বলা ছিল ওরা আসামাত্র যেন রিসেপশনিস্ট তার ঘরে খবরটা দেয়।

রিসেপশনিস্ট বললেন, 'ওরা ঘরে চলে গেছেন।'

'ডিনার?' মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল।

'করবেন না।' রিসেপশনিস্ট বললেন, 'আপনি কাল সকালে ওদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

টেলিফোন নামিয়ে রিসেপশনিস্ট বলল, 'খুব টেনশনে ছিলেন মহিলা।'

'হুঁ।' মালয়েশিয়ানদের এসকর্ট কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। রিসেপশনিস্ট বলল, 'ওঁর সঙ্গের লোকটা এত দেরিতে আসার মধ্যে রহস্য দেখতে পাচ্ছেন। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কী নাম লোকটার?' ধোঁয়া ছাড়ল এসকর্ট। খাতা দেখল রিসেপশনিস্ট, 'সপ্তম চ্যাটার্জি।'

'ডেজিগনেশন কী?'

'ট্র্যাভেল এজেন্সির লোক।'

এসকর্ট ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নম্বর টিপল, 'স্যার, আনোয়ার বলছি। ট্র্যাভেল এজেন্সির ম্যাডামের সঙ্গে ওদের অফিসের একটা লোক আছে যে আমাদের সন্দেহ করছে। হ্যাঁ স্যার। বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজের রিপেসশনিস্টের কাছে জানতে পারলাম। হ্যাঁ, স্যার। লোকটার নাম সপ্তম চ্যাটার্জি। হ্যাঁ স্যার, সপ্তম। সেভেন্থ।'

ওপাশ থেকে যা নির্দেশ এল মন দিয়ে শুনল আনোয়ার। তারপর বলল, 'লোকট এখন ওর ঘরে ঘুমচ্ছে। ঘুম ভাঙাবো না? ঠিক আছে, ওকে।'

•

আজন্ম কলকাতায় থাকা সপ্তম বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের বিছানায় শুয়ে আবিষ্কার করল বাইরে এসে সে গাছপালা পাহাড় আকাশ—কিছুই দ্যাখেনি। কলকাতায় যা দেখতে পাওয়া যায় না, তা দেখার অঢেল সুযোগ ছিল উত্তর বাংলায়, কিন্তু জনি মালেকের কার্যকলাপে তটস্থ হয়ে থাকায় সেই মন ছিল না। বহরমপুর উত্তর বাংলা নয়, কিন্তু মফস্বল শহর। এর আকাশ নিশ্চয়ই কলকাতায় থেকে আলাদা বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না, পাঞ্জাবিটা পায়জামার ওপর চাপিয়ে দরজা খুলে বেরুতে গিয়েও কি মনে করে মানিব্যাগ আর ঘড়িটা সঙ্গে নিয় নিল। এই দুটো জিনিস ছাড়া করে ঘরে তার যা রয়েছে তা আদৌ মূল্যবান নয়। কে বলতে পারে, রাতদুপুরেও এগুলো যদি হাওয়া হয়ে যায়! এলা ট্যুরিস্ট লজ নিস্তব্ধ। একবার মনে হল মাধবিকাকে ডাকলে কেমন হয়। রাতের বহরমপুরের আকাশ দেখার ইচ্ছে তো ওরও হতে পারে। কিন্তু মত পাল্টালো সে। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি বলে ভাবতে পারে মাধবিকা। হাজার হোক ও তার বস।

দরজাগুলো খুলে বাইবে পা বাড়াতে গিয়ে সপ্তম আবিষ্কার করল, আধা অন্ধকারে সে ভুল করে মূল দরজার দিকে না গিয়ে পেছনের দরজায় চলে এসেছে। অবশ্য তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। বাইরে বেরুলেই তো আকাশ।

ট্যুরিস্ট লজের ভেতরে জ্বলা বিবর্ণ আলোর থেকে বাইরের পৃথিবীটা যেন বেশি আলোকিত। অবাক হয়ে গেল সে। এত তারা একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি এ জীবনে। ওটা কী? কালপুরুষ? চমৎকার, যেন ধনুক হাতে যোদ্ধা দাঁড়িয়ে। বেশ কিছু তারা এত উজ্জ্বল যেন মনে হচ্ছে এখনই ওরা পৃথিবীতে নেমে আসতে চায়। দূরে, বহুদূরে মিটিমিটি করছে যারা, তারা যেন বড় করুণ।

হাওয়া বইছে। কাছেপিঠে কোথাও কোনও শব্দ নেই। সপ্তম ধীরে ধীরে বাংলোর পাশ দিয়ে সামনে চলে এল। এখানে কিছু গাছ থাকায় জায়গাটা ছায়া ছায়া। বাংলোর সামনে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা তাদের অন্যটায় মালয়েশিয়ানরা এসেছে। এইসময় একটা গাড়ির হেডলাইট রাস্তা ঘুরে বাংলোর ওপর পড়েই নিভে গেল। এত রাত্রে নিশ্চয়ই কোনও ভিজিটার এসেছে। এখন চিৎকার করে ঘুম ভাঙাতে অনেক কসরত করতে হবে আগন্তুকদের। কিন্তু গাড়িটা ভেতরে ঢুকল না। তিনজন শক্ত চেহারার লোক গেট পেরিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াতেই বাংলোর দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল, তাকে এই আবছা আলোতেও চিনতে অসুবিধে হল না সপ্তমের। মালয়েশিয়ানদের গাড়ির ড্রাইভারের পাশের সিটে ওকেই বসে থাকতে দেখেছে সে। আর একটু সামনে গেলে পরিষ্কার হয়ে যেত কিন্তু সপ্তমের মনে ভয় ঢুকল। এই লোকগুলোর উদ্দেশ্য কী? এত রাতে কী নিয়ে কথা বলছে? ওদের কথা শোনা যাচ্ছে না। এত চাপা গলায় কথা বলার কারণ কী? লোকটা দু-পা সরে এসে মোবাইলের নম্বর ঘুরিয়ে যন্ত্রটাকে কানে চাপল। কারও কাছে নির্দশ চাইছে না কাউকে নির্দেশ দিচ্ছে? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করল সপ্তমকে এখন তার আড়ালে থাকা উচিত।

মোবাইলে কথা শেষ করে লোকটি সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলল। তারপর ওরা একে ়কে ভেতরে ঢুকে গেল। কী করতে গেল? কাকে খুঁজতে? নিশ্চয়ই মালয়েশিয়ানদের য়। তাহলে হয় মাধবিকা, নয় তাকে। মাধবিকার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কাজের, তাব কাছে ়শ্চয়ই মাঝরাতে ওরা হাজির হবে না। তা হলে? ওরা কি কোনও রকমে তার পরিচয় ়ানতে পেরেছে? অথবা মাধবিকার সঙ্গে তার কথাবার্তা? হঠাৎ খেয়াল হল। মাধবিকাব ়ঙ্গে কথা বলার সময় একজন সাক্ষী দূরে কাজ করছিল। তার কাছ থেকে এরা শুনতে ়ারে। সপ্তমের মনে হল ট্যুরিস্ট লজ এখন আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়। সে দ্রুত পা ়লালো। গেটের বাইরে চলে এলে মারুতি ভ্যানটাকে দেখতে পেল। দ্রুত ভ্যানের ওপাশে ়লে গিয়ে চাকার মুখ থেকে আড়াল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সে। কায়দা জানা না ়াকায় হতাশ হয়ে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে নজর দিতেই অপ্রত্যাশিতভাবে চাবির রিঙ ঝুলতে দখল।

সাধারণত ড্রাইভাররা এইভাবে চাবি রেখে যায় না। সপ্তম বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ়বিটা খুলে নিয়ে সামনের রাস্তায় যতটা দূরে পারে ছুঁড়ে দিল। তারপর যতটা সম্ভব দ্রুত ়াঁটতে লাগল সে। তার মনে সন্দেহ ছিল না ওরা তাকেই খুঁজবে এখন। এছাড়া ওই তিনটে ়লাকের ওই ভঙ্গিতে ট্যুরিস্ট লজের ভেতরে ঢোকার কোনও কারণ নেই।

যতটা দূরে এলে গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে না যায়, ততটা এসে একটা দোকানের ়াশে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা, সরাসরি আলো না ফেললে তাকে ়কউ দেখতে পাবে না। যদি লোকগুলো তাকে খুঁজতে ভেতবে ঢুকে থাকে তা হলে না ়পেয়ে নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে এসে খুঁজতে পারে। কিন্তু কাউকেই গাড়ির কাছে আসতে দেখল না সপ্তম। শেষ পর্যন্ত তার মনে হল এতক্ষণ সম্পূর্ণ ভুল ভেবেছে। কেউ তাব ়খোঁজ করছে না। তার নিজের মনে যে সন্দেহ জেগেছে তাই তাকে আতঙ্কিত কবেছে। ়মিনিট পাঁচেক চলে গেল। এখানে এভাবে চোরের মত দাঁড়িয়ে না থেকে বিছানায় ফিবে ়গেলেই হয়। পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল সে। চাবজন লোক এখন গাড়ির সামনে। ়দূর থেকে ওদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওরা গাড়িতে উঠে বসল। তারপরেই ড্রাইভাব ছিটকে নামল বাইবে। টর্চ জ্বলল। টর্চের আলো গাড়ির ভেতরে, বাস্তায় ইতস্তত পড়ছিল। ওরা চাবি খুঁজছে। তারপরেই একজন ভেতরে ছুটে গেল। টর্চের আলো দেখে বোঝা ়াচ্ছিল খোঁজাখুঁজি চলছে। এই সময় গাড়ির হেডলাইট এসে পড়ল গেটের ওপর, ়ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই মালয়েশিয়ানদের নিয়ে আসা সাফাবি গাড়ি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। ড্রাইভার চিৎকার করতেই বাকি তিনজন দৌড়ে উঠে পড়ল ়সাফারিতে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল রাস্তা আলোকিত করে। সপ্তম ়যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে থাকায় ওরা ওকে পেরিয়ে গেল। সে দেখল গাড়ির ়গতি একটুও বাড়াচ্ছে না ওরা। এভাবে যাওয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা ওকে খুঁজছে। ওরা ়নিশ্চয়ই ভাবছে কাছে পিঠের বাস্তায় ওকে পেয়ে যাবে।

সাফারি এখন চোখের আড়ালে। অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাব ঝুঁকি আর নিতে ়চাইল না সে। সোজা বাংলোর ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাংলোটা এখনও অন্ধকারে মোড়া। ়যার মানে এই চারজন অন্যদের ঘুম ভাঙায়নি। মূল দরজা ভেজানো। সেটা ঠেলে আবার

ভেজিয়ে ভেতরে ঢুকল সপ্তম। এখন সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লে ওরা কি আবার ফিরে এসে খোঁজ করবে? মনে হয় না।

ঘরের দরজায় এসে সপ্তম দেখল ভেতরে আলো জ্বলছে। অথচ সে আলো জ্বালিয়ে যায়নি। মুখ বাড়িয়ে দেখল কেউ নেই, শুধু তার ব্যাগটা পড়ে আছে বিছানার মাঝখানে আলো নিভিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে সে পাশের দরজায় মৃদু শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে মাধবিকার চাপা গলা কানে এল, 'কে?'

'আম, সপ্তম।'

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। অন্ধকার ঘরে চটপট ঢুকে পড়ে সপ্তম বলল, 'সরি এভাবে ঢুকে পড়ার জন্যে দুঃখিত। অমার খুব বিপদ।'

'জানি। ওরা এ ঘরেও এসেছিল।' নিচু গলায় বলল মাধবিকা।

'কী বলল?'

'তোমার একটা লং ডিসটেন্স ফোন এসেছে অথচ এতরাতে তোমাকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি কোথায় যেতে পার তা আমি জানি কি না তা জানতে চাইল।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'ওরা গাড়ি নিয়ে বেড়িয়েছে আমাকে খুঁজতে।'

'কিন্তু কেন?'

'নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে আমাকে। আমি যে সব জানি তা বুঝতে পেরে গেছে।'

সপ্তম অন্ধকারে মাধবিকার হাত ধরল, 'আমি কী করি বল তো?'

'কিছু করার দরকার নেই। রাতের অন্ধকারে ওরা যা করতে পারে দিনের আলোয় তা করবে না। দিনের আলোফোটা পর্যন্ত তোমাকে আড়ালে থাকতে হবে।' মাধবিকা বলল।

'কিন্তু আড়াল কোথায় পাব? আমার ঘরে তো ওরা আবার ঢুকবে।'

'আমার ঘরে ঢুকবে না। তোমার খোঁজে এসে ঘরে ঢোকেনি ওরা, বাইরে থেকে প্রশ্ন করেছে। আমার সঙ্গে ওরা একটা আড়াল রেখে চলবে। অতএব সকাল না হওয়া পর্যন্ত তুমি এই ঘরে থাকো।' মাধবিকার হাতে সপ্তমের আঙুল।

'কিন্তু—।'

'কিন্তু আবার কীসের। তুমি বিপদে পড়েছ। আমি তোমার বন্ধু। তাই না? দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সপ্তমকে বিছানায় নিয়ে যেতে যেতে মাধবিকা বলল, 'ভাগ্যিস ঘর অন্ধকার

'কেন?'

'এখন যে পোশাকে আছি আলো জ্বালালে থাকতে পারতাম না।'

'আলো ফোটার আগে পোশাক বদলে নিও।'

'তা আর বলতে। শুয়ে পড়।'

'তুমি?'

'এই তো এখানে। অনেক জায়গা আছে।'

'তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'এ্যাঁ? হ্যাঁ। হতে পারে, তোমার নাক ডাকে না তো?'

'নাক? কি জানি। কখনও টের পাইনি।'

'সর্বনাশ। তাহলে তুমি জেগে থাকো।'

'ঘুম আমার এই অবস্থাতে এমনিতেই আসবে না। কিন্তু তার সঙ্গে নাকের কী সম্পর্ক?'

'এই ঘর থেকে কোনও পুরুষের নাক ডাকছে শুনতে পেলে ওরা যে ভদ্রতার ধার ধারবে সেই গ্যারান্টি কোথায়? ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা দিতে হবে তোমাকে।'

কিন্তু আমি তো সিওর নই যে আমার নাক ডাকে কিনা।'

'চান্স নিও না। এখন মধ্যরাত। আর কয়েকটা ঘণ্টা জেগে কাটিয়ে দাও।

সপ্তমের পাশে শুয়ে পড়ল মাধবিকা।

বালিশে মাথা দিয়ে ওর নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল সপ্তম। সত্যি তো, ঘুমালে মানুষ কী অসহায় হয়ে যায়। এখন শরীর আরাম চাইছে। তারপরেই মনে হল, মাধবিকা যে তার পাশে নির্দ্বিধায় শুয়ে পড়ল এই অন্ধকার ঘরে বাস্তবে এমনটা হয়? তার সঙ্গে যাকে বলে প্রেম তা তো এখনও ওর হয়নি।

এই সময় সাফারি গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে আসতেই উঠে বসল সপ্তম। আওয়াজটা বন্ধ হল। অর্থাৎ ওরা ফিরে এল। ভয়ে কাঁটা হয়ে বসেছিল সপ্তম। হঠাৎ মাধবিকা পাশ ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল, ফিসফিস করে বলল 'টেনশন কর না। কিছু হবে না।' আর এই সময় জীবনে প্রথমবার নারী শরীরের চাপ অনুভব করতে পারল। অদ্ভুত তিবতিরে আনন্দের সঙ্গে বাইরের আতঙ্ক মিশে যাওয়ায় যে কেমন জড়ভরত হয়ে যাচ্ছিল। মাধবিকার একটা হাত তার গলায়। নিচের দিকে নামাতে নামাতে বলল, 'আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি না?'

'না-না।' নিজের গলায় স্বর অচেনা লাগল সপ্তমের।

'তাহলে চুমু খাচ্ছ না কেন?'

এও প্রথম। কোনও নারীকে চুম্বন করা এবং সেই সময় যখন জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা পাশের ঘরের দরজায় এসে থেমে গেল। সিক্ত অথচ উত্তপ্ত ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে আছে সপ্তম। সপ্তম, কান মন উন্মুখ পাশের ঘরের ক্রিয়াকলাপের জন্যে। মাধবিকার ঠোঁট কিন্তু উন্মত্ত। তারপর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে মাধবিকা আচমকাই সরে গেল ওপাশে। বলল, 'এবার আমি ঘুমাই। হ্যাঁ?' হঠাৎ সপ্তমের মনে হল মাধবিকার এতক্ষণের আচরণ নেহাতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। যেন সপ্তমকে আতঙ্ক থেকে আড়াল করতেই সে শরীরের ব্যবহার করেছিল। এর সঙ্গে ওর মনের কোনও সম্পর্ক নেই। সপ্তম নিচু গলায় বলল, 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কেন? আমি কী করেছি?'

'তুমি এইমাত্র যা করলে তা তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে।'

'তাই?'

সপ্তম আর পারল না। দুহাতে মাধবিকাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। তার বুকে মাথা রেখে মাধবিকা ফিসফিস করে বলল, 'তুমি একটা পাগল।'

ঘুম ভাঙতেই মাধবিকার দিকে নজর গেল। এর মধ্যে স্নান সেরে বাইরে বেরোবার পোশাকে মাধবিকা তৈরি। হেসে বলল, 'চটপট তৈরি হও। সাতটা বাজে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সপ্তম, 'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

'একেবারে বাচ্চা ছেলের মত ঘুমোচ্ছিলে।'

'কিন্তু আমার নাক ডাকেনি তো?'

'ডাকলে চিমটি কেটে তুলে দিতাম।' হাসল মাধবিকা

'সর্বনাশ।' বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে।

'দাড়াও। শোন, কাল রাত্রে কী ঘটেছিল তা নিয়ে এখন মোটেই মাথা ঘামাবে না। ওদের সঙ্গে দেখা হলে এমন ভাব করবে যেন কিছুই তুমি জানো না।'

'যদি জিজ্ঞাসা করে কাল রাত্রে ঘরে ছিলাম না কেন?'

'বলবে ঘুম আসছিল না বলে হাঁটতে বেরিয়েছিলে।' মাধবিকা বলল।

নিজের ঘরে চলে এল সপ্তম। যেমনটি গতরাতে দেখে গিয়েছিল তেমনটি রয়েছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সে।

তৈরি হয়ে একেবারে বাইরে বেরতেই বেয়ারা গোছের একজন বলল ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে, সবাই এখন ওখানে। খাওয়ার ঘরে ঢুকে সপ্তম দেখল ইতিমধ্যে টেবিলে খাবার এসে গিয়েছে। মালয়েশিয়ানরা হেসে তাকে গুডমর্নিং বলতে সে মাথা নেড়ে গুড মর্নিং বলল। ওরা চারজন একসঙ্গে বসেছে। অন্য একটি টেবিলে মাধবিকার সঙ্গে একই টেবিলে বসে পোচ খাচ্ছে সাফারি গাড়িব ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটি। ওকে দেখে লোকটা হাসল, 'গুড মর্নিং।'

সপ্তম বলল, 'গুড মর্নিং।'

মাধবিকা বলল, ইউ আর গ্রেট।'

সপ্তম বসতেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল। সে খাওয়া শুরু করতেই মাধবিকা বলল 'ওহো' কাল রাত্রে তোমার একটা ফোন এসেছিল মাঝরাত্রে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তুমি তখন ঘরে ছিলে না। অতরাত্রে কোথায় বেরিয়েছিলে?'

'ঘুম আসছিল না। তাই। কে ফোন করেছিল?'

মাধবিকা পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'বোধহয় আপনি ধরেছিলেন না?'

'হ্যাঁ। অতরাত্রে রিসেপশনিস্ট ছিল না। ফোনটা বেজে যাচ্ছে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রিসিভার তুলেছিলাম।' চায়ে চুমুক দিল লোকটা।

'কে ফোন করেছিলেন?' সপ্তম তাকাল।

'রশিদভাই। কলকাতা থেকে।' গম্ভীর মুখে বলল লোকটি।

'রশিদ ভাই?' হকচকিয়ে গেল সপ্তম। কাল রাত্রে কোনও ফোন আসেনি। তাকে খোঁজার বাহানা হিসেবে ফোনের গল্পটা করা হয়েছে মাধবিকার কাছে। কিন্তু এই লোকটা যে সরাসরি রশিদভাইয়ের নাম তার কাছে করবে এটা কল্পনা করেনি সে।

লোকটি তাকিয়েছিল, 'রশিদভাইকে আপনি চেনেন না?'

মাথা নাড়ল সপ্তম, 'হ্যাঁ। চিনি । উনি কি কিছু বলেছেন?

'এ কী রকম কথা! আপনার সঙ্গে যে কথা বলতে রাত্রে ফোন করেছেন তা আমাকে বলবেন কেন?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওঁকে ভালভাবেই চেনন।'

'তা চিনি। আমাদের দেশ ছিল এক জায়গায়।' কাপ সরিয়ে উঠে পড়ল লোকটা, 'ম্যাডাম তৈরি হয়ে নিন। আপনি তো সোজা কলকাতায় ঢুকতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মালয়েশিয়ানরা কৃষ্ণনগরের কাছে কীসব ঐতিহাসিক জায়গা আছে তা একটু দেখে যেতে চায়। হে হে। আমাদের দেশের জায়গাগুলো আমরা যতটা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানে বিদেশীরা। তা এক কাজ করুন। আপনি কৃষ্ণনগরে হাইওয়ের ওপর রকেট বাস যেখানে দাঁড়ায় সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি ওরা যা চাইছে তা ঘুরে দেখিয়ে ঠিক পৌঁছে যাব। তারপর আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের নিয়ে চলে যাবেন।'

'আপনি?'

'আমার ডিউটি কৃষ্ণনগর পর্যন্ত।'

'মিস্টার মালেক ফিরে গেছেন কলকাতায়?'

'দেখুন ম্যাডাম আমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর রাখি না। আচ্ছা, চ্যাটার্জিসাব নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' কথা শেষ করে লোকটা এগিয়ে গেল মালয়েশিয়ানদের টেবিলে। মাধবিকা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, রশিদভাই কে?'

'মাফিয়া। যে আমার বাড়িতে এসেছিল ডলার নিতে।' সপ্তম চাপা গলায় বলল।

চা শেষ করল মাধবিকা, 'যাক অন্তত কৃষ্ণনগর পর্যন্ত স্বস্তিতে যাওয়া যাবে।'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'এই যে ও ওদের নিয়ে ঘুরে যাওয়ার কথা বলল তার পেছনে অন্য মতলব আছে।'

'থাকতেই পারে। আমবা গোয়েন্দা সংস্থা নই।' ট্র্যাভেল এজেন্সির কোনও দায়িত্ব নেই ক্লায়েন্টদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর। তবে-।'

সপ্তম তাকাল। মাধবিকা বলল, 'চলো, বাইরে বেরিয়ে বলছি।'

সুমো গাড়ি বহরমপুর ছাড়ার আগেই মাধবিকা ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বলল। গাড়ি দাঁড়ালে সে বলল, 'সপ্তম আমার মনে হচ্ছে তুমি যদি আমাদের আগে কলকাতায় পৌঁছও তাহলে ভাল হয়। তোমার কাছে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে ওরা তোমাকে বিপদে ফেলবেই। স্টেশনে গিয়ে দেখতে পার ট্রেন আছে কি না! না থাকলে কলকাতার বাস পেয়ে যাবে! তুমি কলকাতায় পা দিয়ে সোজা আমার দাদার কাছে চলে যেও।'

সপ্তম বলল, 'তোমার সামনে ওরা আমার ক্ষতি করবে না।'

'আমি জানি না।'

গাড়ি আবার চালু হলে ড্রাইভার জানালো গাড়িটা কোনও মেকানিককে দেখানো দরকার। ব্রেক গোলমাল কবছে। গাড়ি থামাতে বলে মোবাইল বের করে বোতাম টিপল মাধবিকা। সমস্ত ব্যাপারটা তার বসকে জানালো। উত্তরটা শোনার পর ব্যাগ থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারকে দিয়ে বলল, 'গাড়ি চেক করিয়ে তুমি সোজা কলকাতায় চলে যাও। কোথাও থামতে হবে না।'

সপ্তম অবাক হল, 'সেকি! কৃষ্ণনগরে—?'

মাধবিকা বলল, 'অফিস থেকে আর একটা গাড়ি পাঠানো হচ্ছে ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

স্টেশনে ট্রেন ছিল না। কিন্তু বহরপুর বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে জানা গেল এখনই কলকাতার বাস ছাড়বে। সপ্তমের খারাপ লাগছিল। মাধবিকাকে দেখেই বোঝা যায় যে সে বেশ আরামের জীবন-যাপন করে। সুমো গাড়িতে যাওয়াও বেশ ক্লান্তিকর কিন্তু বাসের চেয়ে আরামদায়ক।

পাশাপাশি আসন জোগাড় করতে সপ্তমকে তদ্বির করতে হল। বাস ছাড়লে একটু নিশ্চিত হয়ে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওদের ছেড়ে চলে এলে, ক্লায়েন্ট বিগড়ে যাবে না তো?'

'আমি থাকা সত্ত্বেও ক্লায়েন্ট যদি নিজেদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে নেয় তাহলে এক্ষেত্রে বলাব তো কারণ নেই। তাছাড়া কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা আর কতদূর? আমাদের গাড়ি ওদের ঠিক নিয়ে যাবে।'

মাধবিকা বলল, 'এই যে ওরা রুট থেকে বেরিয়ে মাঝখানেই এপাশ ওপাশে চলে যাচ্ছে। কী দেখতে যাচ্ছে? প্রথমদিকে তোমার কথাকে খুব গুরুত্ব দিইনি, এখন মনে হচ্ছে শুধু শিলিগুড়ি-কলকাতার হাইওয়ে দেখতে ওরা এদিকে আসেনি।'

'এটা একটা বাহানা। হাইওয়ে তৈরির বাহানায় নর্থ বেঙ্গলে আসা-যাওয়া কবতে সুবিধে হবে তাই। দেখো রাস্তাটা কোনও দিন তৈরি হবে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ওই সুবাদে আসা-যাওয়া করতে পারবে। নিশ্চয়ই জনি মালেককে সেই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য কর, লোকটা কলকাতা থেকে উড়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আবার আকাশপথেই ফিরে গেছে।' সপ্তম বলল।

'বাট হোয়াই? কিছু করতে চান মিস্টার মালেক?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, জনি মালেক একজন কর্মচারী মাত্র। তার ওপর নির্দেশ আসছে বাইরে থেকে। ঠিক যেভাবে আমেরিকান দূতাবাসের ওপর হামলা হয়েছে বিদেশী পরিকল্পনা অনুযায়ী। নেপাল ভুটান বাংলাদেশের সীমান্তগুলো উত্তর বাংলার তিন ধারে। জায়গাটা ব্যবহার করতে চায় ওরা।' সপ্তম নিচু গলায় কথাগুলো বলল।

'তার মানে এরা পাকিস্তানি গুপ্তচর?' চোখ বড় হয়ে গেল মাধবিকার।

'নিশ্চয়ই। আবার না-ও হতে পারে।'

'দুর। একবার বলছ নিশ্চয়ই, আবার সঙ্গে সঙ্গে উল্টোটা বলছ কেন?'

'আসলে আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই, তাই। তবে মাধবিকা, এই লোকগুলো যে খুব খারাপ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

বাস ছুটছিল বেশ জোরেই। শহর পার হয়ে হাইওয়েতে পড়েছিল ঠিক সময়ে। এখন দু'পাশে চাষের ক্ষেত। বেশ রোদ। হঠাৎ দূরে অনেক লোকের ভিড় দেখতে পেয়ে বাসের ড্রাইভার গতি কমালো। ভিড়টা ঠিক রাস্তার ওপরে বলে দু'পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। লোকজন ছুটছে ভিড় বাড়াতে। জানলা দিয়ে একজন প্রশ্ন করল, কি হয়েছে ভাই' উত্তর ছিটকে এল, 'অ্যাকসিডেন্ট'।

মাধবিকা বলল, 'হয়ে গেল। এখন কখন রাস্তা ক্লিয়ার হবে তার জন্যে হাঁ করে বসে থাকতে হবে। এর চেয়ে অপেক্ষা করে দুপুরের ট্রেন ধরাই ভাল ছিল।'

'সেটাও তো রাতের আগে কলকাতায় পৌঁছাবে না। বরং গাড়িটা ছেড়ে দেওয়াই ভুল হয়েছে। কিন্তু পুলিস কী আসেনি?' উঠে দাঁড়াল সপ্তম। বাস দাঁড়িয়ে গেছে লাইনে।

'একটু দ্যাখো না।' মাধবিকা বলল।

অগত্যা নিচে নামল সপ্তম। সামনে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তার ওপর অসহিষ্ণু ড্রাইভাররা ওভারটেক করে জ্যাম বাড়িয়ে দিয়েছে। সে ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনে চলে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ভাই?'

'আপনার আগে দশজন এই প্রশ্ন করেছে, জবাব দিয়েছি, আর পারব না।' লোকটি মুখ ঘুরিয়ে নিল। পাশের লোকটি বলল, 'স্টিয়ারিং ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে। পুলিস বডি নিয়ে গেছে হাসপাতালে।'

'একজনই?' সমবেদনার সুরে জিজ্ঞাসা করল সপ্তম।

'হ্যাঁ। অন্য প্যাসেঞ্জার ছিল না। থাকলে সবাই ছাতু হয়ে যেত। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখুন না'? লোকটা মাথা বাঁচাল।

অতএব ভিড় ঠেলতে ঠেলতে অকুস্থলে পৌঁছল সপ্তম। একটা সুমো গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। ওর সামনেটা নেই বললেই চলে। তকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন বলল, 'আমি ভাবতাম সুমো গাড়ি খুব শক্ত, কিন্তু এমন জোরে মেরেছে যে এই দশা হল।'

'কে মেরেছে?'

'শুনলাম বিশাল একটা ট্রাক উল্টোদিক থেকে এসে ড্রাইভারের দিকটাকে উড়িয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। নেপালি ড্রাইভারটার কোনও দোষ ছিল না।' নেপালি ড্রাইভার? চমকে উঠল। দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল সুমোর ধ্বংসাবশেষের পাশে। হ্যাঁ, এই তো, এই গাড়িটায় তারা রওনা হয়েছিল। সর্বনাশ, ড্রাইভারের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোকটা মরে গেছে? সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল সপ্তমের। এই গাড়িতে তাদের থাকার কথা ছিল। থাকলে তাদেরও একই অবস্থা হত।

সে দৌড়াল। বাসের পাশে এসে উত্তেজিত গলায় ডাকল, 'নেমে এসো, তাড়াতাড়ি।'

'কী হয়েছে?'

উত্তর না দিয়ে হাত নেড়ে উঠে গেল বাসের ভেতরে, চাপা গলায় বলল, 'আমাদের সুমো গাড়িটাকে স্ম্যাশ করে দেওয়া হয়েছে, ড্রাইভার মারা গেছে।'

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠল মাধবিকা। 'তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এস।'

মাধবিকা উঠে দাঁড়াল। জিনিসপত্র তার কম নয়। অন্তত নিজে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অনেক বেশি। সপ্তম ওকে সাহায্য করল। নিচে নেমে মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সিওর?'

'একশো ভাগ।'

'ওকে কে মারল?'

'একটা ট্রাক ডেলিবারেটলি অ্যাকসিডেন্ট করে পালিয়ে গেছে।'

'পুলিস ট্রাকটাকে ধরতে পারেনি?'

'বোধহয় না।'

'কোথায় যাবে এখন?'

'লোকটাকে একবার দেখবে না? দেখতে হলে হাসপাতালে যেতে হবে।'

'কোন হাসপাতাল?'

এবার হকচকিয়ে গেল সপ্তম। এখান থেকে বহরমপুর অনেক দূর। 'কোন হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে পারে পুলিস?'

মাধবিকা বলল, 'আমার মনে হয় প্রথমে থানায় যাওয়া উচিত।'

সপ্তম নাটক দেখেতে আসা গ্রামের লোকদেব কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ভাই, এখান থেকে থানায় কীভাবে যাওয়া যাবে?'

'বাস না ছাড়লে যেতে পারবেন না।'

হতাশ হয়ে পেছনে তাকাল সপ্তম। তাদের পরে এসে দাঁড়িয়ে যাওয়া গাড়ির সংখ্যা এতক্ষণে একশো ছাড়িয়ে গেছে। হেঁটে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবা পাগলামি। রিকশা বা ভ্যান পেলে তবু যাওয়া যেতে পারে। সে দেখল মাধবিকা মোবাইলে কথা বলছে। কথা শেষ করে দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল মাধবিকা। তারপর তাকে উত্তেজিত গলায় কথা বলতে দেখা গেল। ইতিমধ্যে মাধবিকাকে ঘিবে গ্রামের মানুষদের ভিড় জমেছে। তারবিহীন টেলিফোনে কোনও মহিলাকে কথা বলতে বোধহয় ওরা প্রথমবার দেখল। সপ্তম ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই কথা শেষ করল মাধবিকা। সপ্তমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ভাবতে পাবছি না।'

'কাকে ফোন করলে?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'প্রথমে বস্‌কে। উনি বললেন, এখনই থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে এই বলে যে আমাদের ড্রাইভারকে খুন করা হয়েছে। তারপর দাদাকে ফোন করলাম। উনি এস পি-কে বলছেন যাতে আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।' মাধবিকা বলল।

'এই ভিড় থেকে বেরিয়ে এস।'

ওরা গাড়ির সারি পাশে রেখে অনেকটা পিছিয়ে এল। মাধবিকা বলল, 'তুমি ভাবতে পারছ সপ্তম? আমি পারছি না। যদি সিদ্ধান্ত না বদলে সুমোতে বসে থাকতাম তাহলে এতক্ষণে। বাট এটা পরিকল্পিত খুন।'

'কিন্তু যারা খুন করল তারা পরিকল্পনাটা করল কখন?'

'বাহানা করে মালয়েশিয়ানদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল পরিকল্পনার অঙ্গ। কাল রাত্রে তোমাকে না পেয়ে ওরা ঠিক করেছিল নির্জন হাইওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটাবে।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে তো তোমাকেও খুন করা হত।'

'তাতে ওদের কী এসে যেত।'

এই সময় দূরেব অ্যাকসিডেন্টের জায়াগায় চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। গাড়িগুলোতে হর্ন বাজছে।

তারপর ওদের অবাক করে দিয়ে সেগুলো নড়তে লাগল। সপ্তম চেঁচালো, 'মনে হয় রাস্তা ক্লিয়ার করে দিয়েছে কেউ। তাড়াতাড়ি ফিরে চল, বাস ছেড়ে দেবে।'

'আশ্চর্য! এত জিনিস নিয়ে আমি ছুটব কী করে। অনেকটা দূরে চলে এসেছি যে।' ওরা দেখল গাড়িগুলো ক্রমশ গতি বাড়াচ্ছে। ওপাশ থেকেও গাড়ি আসছে এদিকে।

সপ্তম বলল, 'বাসটা নিশ্চয়ই দাঁড়াবে। কন্ডাক্টার আমাদের দেখেছে।'

'দাঁড়ালেও অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পেছনের গাড়িগুলো ধারে-কাছে দাঁড়াতে দেবে না। আচ্ছা, আমাদের তো থানায় যাওয়ার কথা। বাসের কথা ভাবছি কেন?' মাধবিকা জিজ্ঞাসা করতেই সপ্তমের খেয়াল হল।

এখন এই রাস্তায় গাড়িগুলো দ্রুত ছোটাছুটি করছে। একটু বাদেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে। নাটক শেষ হয়ে গেছে বলে গ্রামের লোকজন গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। এইসময় একটা পুলিসের জিপকে দেখতে পেয়ে মাধবিকা হাত নাড়ল। এটা আসছে উল্টোদিক থেকে। ড্রাইভারের পাশে বসা সাব-ইনস্পেক্টর ওদের দেখতে পেয়ে গাড়ি থামালেন।

মাধবিকা এগিয়ে যেতে সপ্তম পিছু নিল, মাধবিকা বলল, 'আমরা থানায় যেতে চাই।'

এস আই বললেন, 'আপনার নাম?'

'মাধবিকা, ইনি সপ্তম।'

'উঠে আসুন। আপনাদের নিয়ে এস পি সাহেবের হুকুমে আমি এসেছি।'

অতএব ওরা পেছনে উঠে বসল। জিপ দিক পরিবর্তন করে গতি বাড়াতে মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ট্রাক ড্রাইভার ধরা পড়েছে'

'কোন ট্রাক ড্রাইভার'

'যে সুমো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরেছে।'

'সরি ম্যাডাম। আমার কাছে এমন কোনও ইনফর্মেশন নেই।'

'বুঝলাম না।'

'অ্যাকসিডেন্টটা যে ট্রাকের সঙ্গে হয়েছে সে খবর আমি পাইনি।'

সপ্তম বলল, 'সে কী! ওখানে যেসব গ্রামের মানুষ ছিল, যারা প্রত্যক্ষদর্শী, তারা বলেছে, একটা ভারী ট্রাক অ্যাকসিডেন্টটা ইচ্ছে করে ঘটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

'তাই? লোকটার নাম বলতে পারেন? হেল্প আস।'

'যাঃ নাম তো জিজ্ঞাসা করিনি।'

'এখন তাকে খুঁজেও পাবেন না। এরা আড়ালে যা বলে তা পুলিসের কাছে অস্বীকার করে।'

আবার পুলিসের কাছে কিছু বললে কোর্টে গিয়ে মুখ বন্ধ করে থাকে।

'কিন্তু জ্বলজ্যান্ত সত্যি ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যাবে?' সপ্তম বিস্মিত।

'বেশ তো, ট্রাকের নাম্বার কেউ বলতে পারবে?'

'আমি জিজ্ঞাসা করিনি।'

'করলেও লাভ হত না। অনেক মনে করে যে নাম্বার বলবে সেই নাম্বারপ্লেট ট্রাক হয়ত এমন আসামে ভাড়া খাটছে। এদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

থানায় গিয়ে ডায়েরি কবতে চাইল মাধবিকা। ওসি ছিলেন না। সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি ডায়েরি কেন করতে চাইছেন?'

'কারণ আমি জানি এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, পরিকল্পিত খুন।'

'সেকি? আপনি কি দায়িত্ব নিয়ে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য!' সুমো গাড়িটা আসছিল বহরমপুর থেকে। ঠিক উল্টোদিক থেকে আস একটা ট্র্যাক তার জন্যে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল? আসছে দেখেই ঝুঁকি নিয়ে ধাক্ক দিয়েছে?'

'কী করেছে আমি জানি না। সেটা তদন্ত করে আপনাদের জানার কথা।'

'বেশ। এবার বলুন, ওই সুমো গাড়িটি কি আপনার?'

'না। আমরা ভাড়ায় নিয়েছিলাম। কোনও কাজে শিলিগুড়িতে গেলে একটি বিশে সংস্থা থেকে আমাদের কোম্পানি গাড়ি ভাড়া নেয়, এটিও তারা দিয়েছিল।' মাধবিক বলল।

'সুমো ভাড়া করা সত্ত্বেও আপনি কেন বাসে করে ফিরছিলেন?'

মাধবিকা সপ্তমের দিকে তাকাল। সপ্তম বলল, 'অফিসার, কয়েকদিন আগে মালয়েশিয়ান এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতা-শিলিগুড়ি নতু হাইওয়ে বানাবার প্রস্তাব দিয়েছে, এ কথা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ। কাগজ দেখেছি।'

'আমাদের ট্রাভেল এজেন্সি দায়িত্ব নিয়েছিল ওদের উত্তর বাংলায় নিয়ে যাওযার ফেরার সময় সুমোতে ফিরবেন সবাই এমন কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত ওঁরা অন্য গাড়িতে ফিরছেন বলে আমরা সুমো ছেড়ে দিয়েছিলাম। যদি ওই গাড়িতে মালয়েশিয়ানর থাকতেন তাহলে আজকের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেয়ে যেত।'

'বুঝলাম। ওরা না হয় সুমোতে আসতে চাননি, আপনারা চাইলেন না কেন?'

'যখন ওরা আলাদা ব্যবস্থা করলেন তখন মনে হল বাসে ফেরা অনেক আরামদায় হবে। সুমোতে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকার চেয়ে আরামদায়ক।' সপ্তম বলল।

এবার অভিযোগ গ্রহণ করলেন ওঁরা। যদিও শেষ কয়েকটা লাইনে লিখলেন, যদি খুনের সন্দেহ করা হচ্ছে কিন্তু কেন খুন করা হবে তার কোনও সঠিক কারণ এঁরা উল্লে করতে পারছেন না।'

সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'যে সংস্থার গাড়ি তাদের টেলিফোন বা ঠিকানা দিতে পারবেন?'

মাধবিকা ব্যাগ খুলে কার্ড বের করে দিল। সেটায় চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক এস আইকে দিয়ে বললেন, 'শিলিগুড়িকে কন্ট্রাক্ট করে অ্যাকসিডেন্টের খবর এদের জানিয়ে দিতে।'

'সরাসরি জানাবো?'

'নো-নো। প্রপার চ্যানেলে খবরটা যাওয়া দরকার। ড্রাইভার অ্যাকসিডেন্টে মার গিয়েছে। গাড়িটাও শেষ। ওরা নিশ্চয়ই ইনসিওরেন্সে ক্লেইম করবে। এতে ওদের সাহায হবে। কিন্তু ম্যাডাম, আপনার যে কর্তব্য বেড়ে গেল।' ভদ্রলোক তাকালেন।

'কর্তব্য?'

'হ্যাঁ। আপনি যখন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করলেন তখন একবার কষ্ট করে যে হবে বডি আইডেন্টিফাই করতে। পোস্টমর্টেম না হওয়া পর্যন্ত ওকে পাবেন না।'

'ওকে আইডেন্টিফাই করতে কোথায় যেতে হবে?'

'বডি এখনও থানায় আছে। একটু পরে মর্গে পাঠাব। আসুন।'

একটু শান্তশিষ্ট মানুষ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে মেঝের ওপর। মাথা চুরমার। কিন্তু মুখের যেটুকু অবশিষ্ট তাতে তার পরিচয় বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল মাধবিকা। সপ্তম তাকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিয়ে এল।

সেকেন্ড অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিনতে পারলেন?'

কিছুটা সময় লাগল ধাতস্থ হতে। শেষ পর্যন্ত মাধবিকা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'লোকটার নাম কি?'

'আমি পুরো নাম জানি না।'

'ওহ্।' সেকেন্ড অফিসার বিরক্ত হলেন।

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাননি?'

'পেয়েছি।'

'তাহলে আইডেন্টিফিকেশনের দরকার ছিল?'

'এরা ঝাপসা ছবিওয়ালা লাইসেন্স সঙ্গে রাখে অনেক সময়। অন্যের নামে গাড়ি চালায়। ম্যাডাম, একটা কথা বলি। যার পুরো নাম আপনি জানেন না, মাত্র কয়েকঘণ্টার পরিচয়ে তার সঙ্গে নিজেকে এতটা জড়াচ্ছেন কেন?'

'তার মানে?' মাধবিকা তাকাল।

'ব্যাপারটা সামান্য একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। ন্যাশনাল হাইওয়েতে তো এমন দুর্ঘটনা রোজ দশ-বিশটা ঘটে থাকে। খুনের অভিযোগ এনে আপনি আমাদের সমস্যা বাড়িয়ে দিলেন। অন্য কেউ হলে আমরা, যাকগে, এস পি সাহেব হুকুম দিয়েছেন আপনার সঙ্গে যেন কো-অপরেট করি তাই।' সেকেন্ড অফিসার হাসলেন।

মাধবিকা বলল, 'আমরা এখনই কলকাতায় ফিরে যেতে চাই।'

'অবশ্যই যাবেন। তার আগে একটু চা জলখাবার।'

'দরকার নেই।'

এই সময় একটা জিপ থানার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি এসে গিয়েছে।'

জিপটি পুলিসের। ড্রাইভার নেমে এসে সেলাম করে জানাল, এস পি সাহবে গাড়ি পাঠিয়েছেন। এই সময় এস আই এগিয়ে এল, 'ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে কি নেমকার্ড আছে?'

'কেন? ঠিকানা আমি ডায়েরিতে লিখে দিয়েছি।'

'ও, ঠিক আছে।'

মালপত্র জিপে তুলে ওরা উঠে বসল। জিপ রাস্তায় নামতেই সপ্তম বলল, 'এদের কথাবার্তা যেন কী রকম। কিছুতেই মানছে না এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়।'

মাধবিকা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। একটা সাফারি গাড়ি তীব্র গতিতে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল থানার দিকে।

সে হাত আঁকড়ে ধরল সপ্তমকে, 'দেখতে পেলে?'

'না।'

'ওরা। মালয়েশিয়ানরাও গাড়িতে আছে।' কথা শেষ করা মাত্র মোবাইল বেজে উঠল মাধবিকার। সেট অন করে কানের ওপর চেপে ধরল সে। তারপর বলল, 'কি বলছেন

স্যার? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে। আমরা এস পি-র জিপে আছি।' যন্ত্রটাকে বন্ধ করে মাধবিকা বলল, 'জনি মালেক আমাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল করেছে।'

'কেন?'

'আমরা নাকি তার মালয়েশিয়ান বন্ধুদের ট্যুরিস্ট লজে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে হাওয়া হয়ে গেছি।' মাধবিকা চোখ বন্ধ করল।

এস পি সাহেবের অফিসে গিয়ে জানা গেল তিনি বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার আগে তাঁর অফিসকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন যাতে মাধবিকাকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক সরকারি অফিসে একজন না একজন কর্মচারী থাকেন যাঁরা সামান্য পদে থেকেও মনে করেন অনেক ভার বহন করছেন। কথা বলার সময় নিজের এক্তিয়ার কতটুকু তা মনে রাখার চেষ্টাও করেন না। এইরকম একটি পুলিস কর্মচারী জানাল, 'এস পি সাহেব জানতেন আপনি একা সমস্যায় পড়েছেন। সম্ভবত তিনি জানতেন না যে আপনার একজন সঙ্গী আছে। এখন প্রশ্ন হল, আপনি কীভাবে কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন! ট্রেনে, বাস অথবা প্রাইভেট গাড়ি। আমার সাজেশন হল, ট্রেনে যাওয়াই ভাল। মেয়েছেলেদের পক্ষে ট্রেনযাত্রা বেশ আরামের। কিন্তু ট্রেনের দেরি আছে। আপনারা ততক্ষণ এখানেই বিশ্রাম নিন।'

লোকটার কথা বলার ধরন এবং 'মেয়েছেলে' শব্দটি শোনায় মাধবিকার মাথা থেকে পা গরম হয়ে গেল। সে নিজেকে অনেকটা শান্ত রেখে প্রশ্ন করল, 'মেয়েছেলে মানে?'

'এ্যা?' লোকটা হকচকিয়ে গেল, 'মেয়েছেলে ইজ মেয়েছেলে।'

মাধবিকা বলল, 'আমি যদি মেয়েছেলে হই তাহলে আপনি কি?'

'আমি পুরুষমানুষ ম্যাডাম।'

'আর আমি মেয়ে এবং ছেলে, দুই-ই?'

'না মানে, আমরা তাই বলে থাকি।'

'এখন থেকে আর বলবেন না। মেয়েছেলে শব্দটায় আপনারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। হয়ত না জেনেই করেন। কিন্তু দয়া করে আর বলবেন না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার ওয়াইফ তো কখনও আপত্তি করেনি তাই বলেছি।'

'এবার একটা কাজ করুন। এখান থেকে কলকাতায় যাওয়ার জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করে দিন।'

'গাড়ি ভাড়া? আপনারা বাই রোড যেতে চান?'

'হ্যাঁ। ট্রেনের জন্যে বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

পুলিস চাইলে এই দেশে সব কিছু সম্ভব হয়। একটি মারুতি ভ্যান পাওয়া গেল। পুলিস বলেই তার ড্রাইভার বেশ কম টাকাই চাইল। মাধবিকা বলল, 'এস পি সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানাবেন। আমরা তাহলে চলি।'

লোকটি বলল, 'সাহেবের সঙ্গে হয়ত রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'উনি কি কলকাতার দিকে গিয়েছেন?'

'আর বলবেন না। আগে রাতের বেলায় হত। কিছুক্ষণ আগে এই দিনের বেলায় মুখে কাপড় বেঁধে হাইওয়ের ওপর রানিং বাসে গুলি চালিয়ে গাড়ি থামিয়েছে কিছু উগ্রপন্থী।'

'উগ্রপন্থী'

'ডাকাত নয়। ডাকাতির উদ্দেশে গাড়ি থামায়নি। ওরা কাউকে খুঁজতে গিয়েছিল। তাকে না পেয়ে ফিরে যায় কোনও জিনিসপত্র হাত না দিয়ে।'

কথাটা শোনামাত্র মাধবিকা সপ্তমের দিকে তাকাল। সপ্তম এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার মাথা নাড়ল।

মারুতি ভ্যানে উঠে সপ্তম বলল, 'বাসে আমাকে না পেয়ে ওরা থানায় গিয়েছে, এতটা সাহস হবে ভাবতে পারছি না।'

'ক্ষমতা মানুষকে সাহসী করে তোলে। থাক, এ বিষয়ে কথা না বলাই ভাল।'

ড্রাইভার টেপ রেকর্ডার চালিয়েছে। রোজার গান। ওর কানে ওইসব সংলাপ যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। গাড়ি এখন ছুটছে হাইওয়ে দিয়ে। ওপাশ থেকে গাড়ি আসছে। হঠাৎ দুটো দ্রুতগামী গাড়িকে আসতে দেখে টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ কমিয়ে ড্রাইভার বলল, এস পি সাহেবের গাড়ি। খুব জোর যাচ্ছেন।'

'ঠিক আছে। তুমি চলো।' মাধবিকা বলল। গাড়ি দুটো পাশ দিয়ে হুস করে চলে যাওয়ার পর সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবে না?'

'সময় নষ্ট হতো। ওঁকে তো ধন্যবাদ জানিয়েই এসেছি।' শান্তমুখে বলল মাধবিকা, 'তাছাড়া উনি হয়ত চাইতেন না আমরা গাড়িতে ফিরে যাই।'

'তা অবশ্য।'

গাড়ি আশি-নব্বইতে ছুটছে। বেশ কাঁপছে খাঁচাটা। সে নিচু গলায় বলল, 'আস্তে ভাই।' ড্রাইভার পঁচাত্তরে নামালো গতি। এইসময় ওরা দূরে রাস্তার পাশে বাসটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। পেছনে একটা ভ্যান। সম্ভবত মেকানিকরা ওই ভ্যানে এসে গাড়ি সারাচ্ছে। যাত্রীদের বেশিরভাগই নেমে এসেছে নিচে দু'পাশে শুধু নিস্ফলা মাঠ। বুনো ঝোপ।

বাসটাকে পেরবার সময় ভ্যানের গতি কমিয়েছিল ড্রাইভার। বলল, 'এই বাসে ডাকাতি হয়েছিল।'

জায়গাকে পেরিয়ে এসে টেপ রেকর্ডারের গানের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল ড্রাইভার। হঠাৎ মাধবিকা বলল, 'সপ্তম, কলকাতায় নির্বিঘ্নে ফিরতে হলে ওই বাসটাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'তাই?'

'ভেবে দ্যাখো, ওরা খুঁজে গিয়েছে, যাকে চেয়েছে তাকে পায়নি। অতএব ওই বাস সম্পর্কে ওদের আর কোন কৌতূহল থাকবে না। এটাই স্বাভাবিক।' মাধবিকা বলল।

সপ্তম মাথা নাড়াল, 'ওদের ধারণা হবে আমরা এখনও অনেক পেছনে রয়ে গেছি।'

'ঠিক। তাছাড়া পুলিস নিশ্চয়ই বাসটার ওপর নজর রাখবে।' মাধবিকাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি আমাদের একসঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি না।'

'ওরা তো ভাবতেই পারবে না—।'

'ওদের এখনও তুমি নির্বোধ ভাবছ?'

'না—।'

'কলকাতায় যাওয়ার পথে ওদের কন্টাক্ট পার্সন নেই এমন ভাবার কোনও কারণ আছে? সেই লোককে ওরা মোবাইলে জানিয়ে দিতে পারে যে আমাদের আটকাতে হবে তোমার আমার বর্ণনা দিতে তো কোনও অসুবিধে নেই। তাছাড়া এক ভদ্রমহিলা ও এব ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন বললেই তো আমাদের ওপর নজর পড়বে।' মাধবিক বলল।

'তাহলে কী করা যায়? পেছনে যে বাসটা আসছে তাতে যাবে? তুমি তো বলছ ওখানে উঠলে কেউ সন্দেহ করবে না। তুমি বরং সামনে কোনও স্টপে বাসটাকে ধরে নাও। আমি এই ভ্যানে কৃষ্ণনগর স্টেশনে গিয়ে লোকাল ট্রেন ধরি।'

'তুমি একা যেতে পারবে?'

'মাই গড। আমাকে তুমি কি ভাবছ?'

'বেশ।' ব্যাগ খুলল মাধবিকা। তারপর তিনটে পাঁচশো টাকার নোট বের করে সপ্তমকে দিল, 'ভ্যানের ভাড়া আর ইমার্জেন্সি খরচ বাবদ—। কলকাতায় পা দিয়েই সোজা আমার দাদার বাড়িতে চলে যাবে। আমিও সেখানেই যাব। এই নাও ওঁর ঠিকানা।' টাকা দেওয়ার পর একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিল মাধবিকা।

সপ্তমের মন দুর্বল হল। সে মাধবিকার হাত ধরল, 'আমি খুব দুঃখিত!'

'কেন?'

'খুব খারাপ লাগছে। তোমার সঙ্গে আমি না এলে অথবা ওদের অস্তিত্ব বুঝেও যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে এভাবে তোমাকে সমস্যায় পড়তে হত না।'

'বাঃ। তাহলে তো চমৎকার এক বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতে। সপ্তম, তুমি যা করেছ ঠিক করেছ। বোধহয় এই জন্যেই আমি তোমাকে—।'

কথা শেষ করল না মাধবিকা।

সপ্তম তাকাল। মাধবিকা হাসল, 'বাকিটা কলকাতায় গিয়ে বলব।'

ছোটখাটো অনেকগুলো জায়গা পার হওয়ার পর বেলডাঙায় এসে গাড়ির গতি কমাতে বলল মাধবিকা। একটা বড়সড় বাসস্টপে পৌঁছে সে দাঁড় করাতে বলল। নিজে ব্যাগ দুটো টানার চেষ্টা করতে সপ্তম বলল, 'হালকাটা নিয়ে যাও। ভারিটা তোমার দাদার ওখানে আমি পৌঁছে দেব।'

'থ্যাঙ্কস!' মাধবিকা হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে সপ্তমের আঙুল স্পর্শ কর 'এলাম।'

'ভালভাবে যেও।' সপ্তম বলল।

'টেক কেয়ার।' মাধবিকা হালকা ব্যাগ নিয়ে নেমে গেল। সপ্তম ড্রাইভারকে ব 'চল ভাই। বেশি জোরে চালিও না।'

'মেমসাহেব কলকাতায় যাবেন না?' ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'উনি তো এস পি সাহেবের বোন?'

'কে বলল তোমাকে?'

'আমি জানি।'

'ঠিক আছে, তুমি মন দিয়ে চালাও।'

গাড়ি আবার হাইওয়েতে পড়তেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব কিছু খাবেন না?'

প্রশ্নটা কানে যেতেই খেয়াল হল, অনেকক্ষণ কিছুই খাওয়া হয়নি। খাওয়ার কথা হতেই খিদেটা যেন চাগাড় দিয়ে উঠল। কিন্তু সে বলল, 'খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

'আমারও যে খিদে জেগেছে। সেপাইটা এমন করে ধরে আনল যে খাওয়ার সময় পাইনি। সামনে একটা বড় ধাবা আছে। ওখানে দশ মিনিটে খাওয়া হয়ে যাবে।' ড্রাইভার বলল।

রাজি হল সপ্তম। রুটি আর কষা মাংসের অর্ডার দিতে গিয়ে দেখল ড্রাইভার তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক গাড়িতে যদি বসতে পারে তাহলে এক টেবিলে বসতে দোষ কোথায়? সপ্তম দুজনের খাবার অর্ডার দিল। ড্রাইভার আরাম করে বসল, 'এখানে খুব ঠাণ্ডা বিয়ার পাওয়া যায় স্যার। মাংস খাওয়ার আগে খেয়ে নিতে পারেন।'

'না।' সপ্তম গম্ভীর হল। তার মানে হল, মাধবিকা সঙ্গে থাকলে এসব কথা বলা দূরের কথা এখানেই বসত না লোকটা। খাবার এল। কাঁচা পেঁয়াজে কামড় দিয়ে রুটি, মাংস মুখে পুরতে পুরতে লোকটা বলল, 'আপনি তো আমাকে কৃষ্ণনগরে ছেড়ে দেবেন, কথা আছে কলকাতা পর্যন্ত যাওয়ার। কথাটা মনে রাখবেন স্যার।'

'তোমার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেইমত টাকা পাবে।'

'বাঁচালেন। তখন কানে এল কথাটা, তারপর থেকেই চিন্তায় পড়েছিলাম।'

খাওয়া চলতে লাগল। আবার মুখ তুলল ড্রাইভার, 'কিন্তু আপনি যখন ট্রেনেই উঠবেন খন কৃষ্ণনগর থেকে কেন? একটু পরে এখানে থেকেই ট্রেন পেয়ে যাবেন।'

'এখান থেকে?'

'আরামে সে যেতে পারবে।'

'তাহলে তোমাকে কৃষ্ণনগর পর্যন্তও যেতে হচ্ছে না অথচ কলকাতার ভাড়া পেয়ে াবে।'

সপ্তম কথাগুলো বলতে বলতে দেখল কৃষ্ণনগরের দিক থেকে একটা অ্যাম্বাসাডার সে ধাবার সামনে থামল। দুজন স্বাস্থ্যবান লোক গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করল, র্দারজি, সব ঠিক হ্যায়?'

ক্যাশবাক্সের পাশে বসা সর্দারজি হাসলেন, 'বিলকুল। বহুৎ দিন বাদ আয়া।'

'দিল্লি, বোম্বাই ঘুমকে আয়া। আরে, এ বেটা, বিয়ার লাগাও।'

দুটো লোকই সুদর্শন। ওদের কাছাকাছি টেবিলে বসল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ার চলে া। গ্লাস নিল না ওরা। সোজা মুখে ঢালল। এই সময় মোবাইলের আওয়াজ হতেই জন পকেটে হাত দিল। মোবাইল অন করে কানে চাপল সে, 'ডিস্কো স্পিকিং।' াশের গলা শোনামাত্র সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'স্যার ওদের দিকে তাকাবেন না।'

'কেন?'

‘ওরা এই লাইনের দাদা।’

দ্বিতীয় লোকটি চোখ বন্ধ করে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। প্রথম লোকটি কথা শেষ করে ফিরে এসে তাকে কিছু বলতেই সে সোজা হল। দ্রুত বিয়ার শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মোবাইল হাতে লোকটা চলে গেল ক্যাশ কাউন্টারে। সর্দারজির সঙ্গে কথা বলে ফিরে গেল গাড়িতে। লোকটা বিয়ারভর্তি গ্লাস স্পর্শ করল না। গাড়ি চোখের সামনে থেকে চলে গেলে ড্রাইভার বলল, ‘কুছ গড়বড় হ্যায়।’

‘এরা কারা?’

‘এই এলাকার দাদা এরা। কৃষ্ণনগর থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত ওদের লোক আছে। অনেকদিন বাইরে ছিল বলে দেখতে পাইনি। আবার ফিরে এসেছে।’

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেই বেয়ারাকে না দিয়ে টাকা ক্যাশ কাউন্টারে দিল সপ্তম। সর্দারজি জিজ্ঞাসা করল, ‘খানা ঠিক হ্যায় সাব’

‘খুব ভাল।’ চেঞ্জ ফেরত নিয়ে সপ্তম বলল, ‘আপনার ওই কাস্টমাররা বিয়ার না খেয়েই চলে গেল?’

‘ছোড দিজিয়ে উনলোগোকে বাত। ধান্দামে হ্যায়। দুজন ছেলেমেয়ে কলকাতায় তাদের খুঁজতে চলে গেল। আমাকে বলে গেল এরকম দুজন এখানে খেতে এলে যেন [illegible] মারে, আমি কীভাবে বসিয়ে রাখব? গায়ের জোরে? যত্ত সব।’ সর্দারজি [illegible] গাড়িতে উঠে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, ‘স্টেশনটা কোন দিকে?’

‘এই একটু এগিয়ে।’

‘দ্যাখো ভাই, যদি এখনই ট্রেন থাকে তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব নইলে—।’

‘আপনাকে ট্রেনে বসিয়ে আমি যাব।’

ছোট স্টেশন। সব ট্রেন থামে বলে মনে হয় না। টিকিট কাউন্টারে গিয়ে জানা গেল মিনিট দশেকের মধ্যে একটা লোকাল ট্রেন আসছে যেটা কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যাবে। টিকিট কেটে ড্রাইভারকে বিদায় করে দিল সপ্তম। লোকটা ভাল, টাকা পেয়েই সরে গেল না ট্রেন এলে সপ্তম উঠে পড়ার পর হাত নেড়ে বিদায় নিল।

পুরো কামরায় স্থানীয় মানুষের ভিড়। ট্রেনের গতিও অসাধারণ। দু'মিনিট জোরে ছুটেই গড়াতে আরম্ভ করছে। কোনও মতে একটা বসার জায়গা বের করল সপ্তম। কি করার নেই। ট্রেন যখন-তখন কৃষ্ণনগরে পৌঁছবেই।

শেষ মুহূর্তে মাথায় বুদ্ধিটা এসে যেতে দমদম স্টেশনে নেমে পড়ল সপ্তম। চক্ররেলের কল্যাণে এখন ট্রেনগুলো দমদম থেকে বাঁক নিয়ে শিয়ালদায় না গিয়ে বাগবাজার শোভাবাজার হয়ে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত যাচ্ছে। কৃষ্ণনগর লোকাল সোজা শিয়ালদায় যায় ওইরকম একটা ট্রেনে উঠে বসল সে দুটো ব্যাগ নিয়ে।

সন্ধে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। প্রিন্সেপ ঘাটে নেমে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল না ধারে এখন প্রেমিক-প্রেমিকা আর অবাঙালিদের ভিড়। ট্যাক্সি আসছে আর খালি হচ্ছে মাধবিকার দেওয়া ঠিকানা এখান থেকে অল্প দূরে। পুলিসের বড় সাহেবের বাড়িতে গেল সে। সাহেবের আর্দালি জানাল কোনও মেমসাহেব ব্যাগ নিয়ে আজ দুপুরের সাহেবের কাছে আসেননি। সাহেব তার মেমসাহেব আর মেয়েকে নিয়ে সন্ধের আগে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন তা আর্দালির জানা নেই।

বেশ ফাঁপড়ে পড়ল সপ্তম। মাধবিকা বলেছিল সোজা এখানে চলে আসতে। ওর দাদা-বৌদি যখন বাড়িতে নেই তখন সে ভেতরে ঢুকতে পারে না। দরজার বাইরে স্যুটকেস নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। কিন্তু মাধবিকার এত সময় লাগছে কেন? ওরা কি ওকে খুঁজে বের করতে পেরেছে? মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন পেলে ওর তো অনেক আগে এখানে চলে আসার কথা।

ভাবতে ভাবতেই মাধবিকা চলে এল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কতক্ষণ?'

'এই তো।'

'এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলে?'

'গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ট্রেনে এসেছি।' অজুহাত হিসেবে সে ধাবায় দেখা লোক দুটোর কথা বলল, 'ওরা তোমাকে আর আমাকে খুঁজছে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

'তোমার দাদা-বউদি বাইরে গেছেন।'

'ওঃ।' মাথা নাড়ল মাধবিকা। বোঝা গেল এখানে ওর আসা-যাওয়া বেশ কম তাই আর্দালি তাকে চিনতে পারছে না। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

'মোবাইলে কথা বল না।' সপ্তম বুদ্ধি জোগালো।

'নেই।'

'নেই মানে?'

'ব্যাগ থেকে বের করে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম বস-এর সঙ্গে। একটা স্টেশনে ট্রেনটা থেমেছিল। ট্রেন ছাড়ার মুখে হঠাৎ একটা লোক হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে নেমে গেল। চিৎকার করলাম, ততক্ষণে লোকটা হাওয়া।'

'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ অন্য অর্থে। মোবাইলের ফোনবুকে অনেক জরুরি টেলিফোন নাম্বার ছিল।'

'পুলিসে ডায়েরি করবে না।'

'শেয়ালদা স্টেশনে এসে বলেছি। ওরা লিখে নিল। ও আর পাওয়া যাবে না।'

এইসময় মাধবিকার দাদা, বউদি, মেয়ে ফিরে এলেন। গাড়ি থেকে নেমে ওদের দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক অবাক, 'কী ব্যাপার, লাগেজ নিয়ে---।'

'ভেতরে চল, বলছি।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকে মাধবিকা প্রথমে টয়লেটে চলে গেল। সপ্তম সোফায় বসে বলল, 'আমার নাম সপ্তম চ্যাটার্জি। মাধবিকা আর আমি একসঙ্গে পড়তাম।'

'ও। কী হয়েছে বলুন তো।' ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

পাশ থেকে ওঁর স্ত্রী বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য দেখে বুঝতে পারছ না ওরা খুব টায়ার্ড। একটু ফ্রেশ হয়ে নিক তারপর কথা শুরু করো।'

'সরি। আপনি এক কাজ করুন সপ্তমবাবু, ওপাশের টয়লেটটা ব্যবহার করুন। ভেতরে তোয়ালে রয়েছে, ইচ্ছে করলে স্নানও করে নিতে পারেন।' মাধকিার দাদা বললেন।

'হ্যাঁ। তাই ভাল। আমি ততক্ষণে চা করতে বলি।' ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

স্নান করল সপ্তম। আঃ। কি আরাম। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে মনে হল স্বর্গসুখ এর

চাইতে কি আর এমন বেশি। স্নান শেষ করে ব্যবহৃত পোশাক পরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু সে আবার নতুন পোশাকের জন্যে স্যুটকেস খোলে।

আয়নায় নিজেকে দেখলে সে। দাড়ি গজিয়ে গেছে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ সেই নেপালি ড্রাইভারের মুখ মনে পড়ল। সুমো গাড়িতে থাকলে এই স্নানটা সে করতে পারত না। এখন একটা অর্গানাইজড মাফিয়া দল তাকে খুন করতে হন্যে হয়ে খুঁজছে। বাইরের পৃথিবীটা আর তার কাছে মোটেই নিরাপদ নয়। কী করবে সে?

এখন পুলিসের ওপরতলার অনেক অফিসারকে দেখে পুলিস বলে মনে হয় না। তাঁদের চেহারা পেশি ফোলানো নয়, ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত। নিজের পড়াশুনা শেষ করে আই পি এস দিয়ে পুলিসে এসেছেন এমন অধ্যাপকের সংখ্যাও কম নয়। এঁরা যেমন রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন, অপর্ণা সেনের ছবি দেখেন, তেমনি দক্ষতার সঙ্গে নিজের কাজটা করে যান। মাধবিকার দাদা এই শ্রেণীর একজন।

মুখোমুখি বসেছিল ওরা। মাধবিকা এবং তার বউদিও পাশে আছেন। টেবিলে চা এবং খাবার। সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে ট্যাক্সি ধরা থেকে শুরু করেছিল সপ্তম। ডলার পাওয়ার প্রসঙ্গে এসে গল্প থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি সংক্ষেপে বলব?'

সপ্তম মাইক্রোফোনের দিকে তাকাল। কথা শুরু করার আগে মাধবিকার দাদা প্রস্তাব দিয়েছেন যে সপ্তমের স্টেটমেন্টটা তিনি রেকর্ড করে রাখতে চান। অতএব যন্ত্রটির ভেতর চাকা ঘুরছে। সপ্তম আবার বলা শুরু করল। যখন শেষ করল তখন দু'দুটো ক্যাসেট ভরে গেছে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর ডি আই জি সাহেব মুখ খুললেন, 'এতদিন যে পুলিসকে কিছু জানাননি?'

'দেখুন আমি কখনই চাইনি ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে। তাছাড়া পুলিসকে বললে কি রি-অ্যাকশন হবে তা-ও আন্দাজ করতে পারছিলাম না। তখন ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল, সুভাবাদা বনাম রশিদদের লড়াই। ওরা যে কী ভয়ঙ্কর তা আমি রশিদের ডেরায় গিয়ে দেখেছি। মাধবিকার সৌজন্যে চাকরি পেয়ে ভেবেছিলাম কলকাতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে নিষ্কৃতি পাব। এ কারণেই আমি পুলিসকে কিছু জানাইনি। তাছাড়া আমার হাতে তো কোনও প্রমাণ ছিল না।' সপ্তম বলল।

'আপনি এমন একটা তথ্য তুলে ধরছেন যা প্রমাণ করছে আমাদের দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। এ রকম একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে দেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়? কেন ওরা দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়েছিল?' পুলিস সাহেব প্রশ্ন করলেন।

'আমি ঠিক জানি না। তবে কলকাতা-শিলিগুড়ি ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি করার ব্যাপারটা মনে হয় বাহানা। ওদের অন্য উদ্দেশ্য আছে।' সপ্তম বলল। মাধবিকা চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'মালয়েশিয়ানরা যখন দার্জিলিঙে তখন জনি মালেক কার্শিয়াঙে গিয়ে ওদের ডেকে পাঠান। উনি কেন দার্জিলিঙে গেলেন না? শিলিগুড়িতে উনি প্রতিনিধিদের নিয়ে ডি এম, এস পি-দের সঙ্গে মিটিং করেছেন, পি ডব্লু ডি-র সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপর কথা ছিল প্রতিনিধিরা বাই রোড আমাদের সঙ্গে আসবে। কিন্তু পরে ওদের জন্যে আলাদা গাড়ি এসে গেল, আলাদা এসকর্টও। সেই লোকগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় মিলিটারি ট্রেনিং গোছের কিছু নেওয়া আছে। এরপরে প্রায় কুড়ি

পর্যন্ত হাইওয়ের পুরোটাই যাদের দখলে তাদের সঙ্গে জনি মালেকের অত্যন্ত সুসম্পর্ক আছে। যে অংশটা বিহারের মধ্যে পড়েছে সেখানে ওদের লোকজন ছড়ানো। ওরা আমাদের সুমো গাড়ির ড্রাইভারকে অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে মেরে ফেলেছে, বাস থামিয়ে আমাদের খোঁজ করেছে কিন্তু ধরা পড়েনি।'

সপ্তম যোগ করল, 'আপনি বলছিলেন কেন আমি পুলিসের কাছে যাইনি। সুমোর ড্রাইভারকে যে খুন করা হয়েছে তাই আমরা লোকাল পুলিসকে বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হচ্ছিল ওরা অবিশ্বাস করার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন। মাধবিকার ডায়েরি নিতে চাইছিল না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ কী করে পুলিসকে বিশ্বাস করে সব কথা বলবে?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখান থেকে যাওয়ার পর আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

'না'। সপ্তম একটু সঙ্কুচিত।

'কেন?'

'আসলে এমন টেনশনে ছিলাম—।'

ভদ্রলোক উঠে একটা কর্ডলেস রিসিভার এনে এগিয়ে দিলেন, 'কথা বলুন।'

নাম্বার টিপল সপ্তম। ফোন বাজছে। তারপর মায়ের গলা। 'হ্যালো'!

'কেমন আছ তুমি?'

'তুই কোথায়? একটাও খবর দিসনি কেন?'

'একটু অসুবিধে ছিল। তাছাড়া মাত্র তো দিন তিনেক—। তুমি ঠিক আছো তো?'

'না। ঠিক নেই। গতকাল থেকে কয়েকটা লোক টেলিফোনে শাসাচ্ছে তোকে মেরে ফেলবে বলে। হিন্দিতে কথা বলছে। কাল অন্তত সাতবার ফোন এসেছিল। আজ সকালে আবার এই ফোন আসতে আমি থানায় গিয়েছিলাম। থানার অফিসার কোনও গুরুত্বই দিলেন না। বললেন, তুই ফিরে যেন দেখা করিস। তুই এখন কোথায়? দুশ্চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' মায়ের গলা ভেঙে গেল।

'তুমি চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। চাকরি নিয়ে বাইরে এসেছি, কেউ হয়ত তোমার সঙ্গে মজা করছে। আমি আজই ফিরে যাচ্ছি।'

'না-না। তুই এখানে ফিরিস না। এখানে এলে তুই বিপদে পড়বি। এক কাজ কর, তুই তোর মাসির বাড়িতে চলে যা।' মা আর্তনাদ করে উঠলেন।

'আমি দেখছি।'

'আমি বলছি তুই এখন আসিস না। আর আমাকে দু'বেলা ফোন করবি।'

'আচ্ছা, রাখছি।'

রিসিভার অফ করে ঘটনাটা জানাল সপ্তম। ফোনটা নিয়ে নাম্বার টেপার আগে সপ্তমের ঠিকানা জানতে চাইলেন মাধবিকার দাদা। তারপর নাম্বার টিপে সংশ্লিষ্ট থানায় লাইন দিতে বললেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদিকে সাড়া পাওয়া গেল। মাধবিকার দাদা নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন ও সি-র সঙ্গে কথা বলছেন কিনা। একটু পরে ওসি লাইনে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার এলাকায় এক ভদ্রমহিলার ছেলেকে খুন করা হবে বলে টেলিফোনে শাসানো হচ্ছে এ কথা আপনি জানেন?' ভদ্রলোকের জবাব শুনে মাথা নাড়লেন তিনি, 'আপনি খোঁজ নিন, আমি লাইনে আছি।'

একটু পরে ও সি রিপোর্ট করলেন। মাধবিকার দাদা বললেন, 'আপনার সেকেন্ড

অফিসার মনে করেছেন ভদ্রমহিলা বাড়াবাড়ি করছেন। যদি ওঁর ছেলে খুন হয় তা হলে উনি কি দায়িত্ব নেবেন? এইরকম একটা অভিযোগ ডায়েরিতে না লেখা গুরুতর অপরাধ। সেকেন্ড অফিসারের নাম এবং ওর রিফিউজালের ব্যাপারটা আমাকে লিখে জানান।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পুলিস সাহেব, 'সপ্তমবাবু, আপনি আজ রাত্রে কোথায় থাকবেন?'

'বাড়িতে ফেরা যাবে না?'

'একটু ঝুঁকি নেওয়া হবে। আপনার বাড়ির সামনে পুলিস পোস্টিং করা যেতে পারে। অফিসার মাথা নাড়লেন, 'নাঃ। ওদের আন্ডার এস্টিমেট করা ঠিক হবে না। আমি একটা গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেখানে নিজের পরিচয় দেবেন না। ভুলেও গেস্ট হাউস থেকে বেরুবেন না। আর মাধবিকা, তোরও বাড়িতে ফেরার দরকার নেই। তুই আমার এখানেই থেকে যা।'

'কী আশ্চর্য? আমি কেন?' মাধবিকা প্রতিবাদ করল।

'সব শুনে মনে হচ্ছে তোকেও ওরা টার্গেট করবে।'

'কিন্তু আমার অফিস?'

'তোর বস-এর সঙ্গে কথা বল। মাকেও ফোন করবি। আমি এখন বেরুচ্ছি। টেলিফোন নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন ভদ্রলোক। মাধবিকার বউদি চুপচাপ শুনছিলেন এতক্ষণ, এবার কথা বললেন, 'তুমি ওই ফোনে কথা বলতে পার। ওটার লাইন আলাদা।'

প্রথম ফোনটা শেষ করল মাধবিকা। করে বলল, 'মাকে বললাম ক'দিন মাসির বাড়িতে ঘুরে আসতে কারণ আমার ফিরতে দেরি হবে।'

'ভাল করেছ। এসব শুনলে ওঁর টেনশন বাড়ত।' বউদি বললেন।

মাধবিকার দাদা তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। সপ্তমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার লোক আপনাকে গেস্ট হাউস পৌঁছে দিয়ে আসবে। মনে রাখবেন, আমাকে না জানিয়ে আপনি ঘরের বাইরে যাবেন না।' ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

সপ্তম চোখ বন্ধ করল। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চাইলে মৃত্যু অনিবার্য। এই লোকগুলো যে কোনও মানুষকে টুপ করে মেরে ফেলতে পারে। তার চেয়ে বন্দি হয়ে থাকা ঢের ভাল। সে হেসে ফেলল। মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছ তুমি?'

'হাসি এল, কী করব? কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিলাম একজন দাগী অপরাধী খুন করেই পুলিসের কাছে চলে গিয়েছিল ধরা দিতে। কারণ বাইরে থাকলে শত্রুপক্ষ তাকে শেষ করে দেবে। জেলের ভেতরটা তার জীবনের পক্ষে অনেক নিরাপদ জায়গা।' সপ্তম বলল, 'আমার ক্ষেত্রেও তাই হবে। কলকাতা শহরে থেকেও আমাকে একটা গেস্ট হাউসের বন্ধ ঘরে থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।'

মাধবিকার বউদি বললেন, 'কয়েকটা দিনের ব্যাপার তো। আচ্ছা, অনেক হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। মাধবিকা, তুমি ওঁকে গেস্ট রুমটা দেখিয়ে দাও, একটু রেস্ট নিয়ে নিন।'

'রেস্ট-এর কী দরকার? এখনই তো যেতে হবে।' সপ্তম বলল।

'এখনই মানে এই মুহূর্তে বলে ভাববেন না। একে টেনশন তার ওপব অতটা পথ এসেছেন, যান, একটু গড়িয়ে নিন।' বউদি বললেন।

মাধবিকা ওকে নিয়ে এল গেস্টরুমে। সুন্দর সাজানো ঘর। জানলায় ভারি পর্দা। মাধবিকা বলল, 'নাও শুয়ে পড়।'

'দূর, এখন শুলে আর উঠতে পারব না। তাছাড়া তুমিও তো কম ক্লান্ত নয়!'

মাধবিকা কিছু বলল না, শুধু হাসল।

সপ্তম তাকাল ওর দিকে। হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল ওর। কাছে গিয়ে বলল, 'মাধবিকা, আমি সত্যি খুব দুঃখিত। তুমি আমার উপকার করার চেষ্টা করেছিলে আর আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর সমস্যায় টেনে আনলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, এ রকম হবে আমি কল্পনা করিনি।'

'কী করে করবে? তুমি তো জানতে না ওরা কারা!'

'হ্যাঁ, জানলে হয়ত যেতাম না।'

'তাহলে তো দাদার কাছে আসা হত না, পুলিসও খবরটা পেত না। নিজের অজান্তে তুমি এই দেশের বিরাট উপকার করেছ।' মাধবিকা বলল।

'কিন্তু তোমাকে তো আমার জন্যেই বাড়ি ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। তোমার অফিস—।'

'বস-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি কয়েকদিন ছুটি পেয়েছি।'

'আমি সঙ্গে না গেলে ওরা তোমাকে শত্রু বলে ভাবত না।'

'তোমাব শত্রু আমার শত্রু নয়?'

সপ্তম তাকাল। প্রশ্নটির অর্থ সে ঠিক বুঝতে পারল না।

মাধবিকা হাসল, 'তোমাকে বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে একটা ব্যাপারে কথা বলব, মনে আছে?'

মাথা নাড়ল সপ্তম।

'দ্যাখো, আমি ডিভোর্সি। একজনের সঙ্গে সংসার করার চেষ্টা করেও পারিনি। তারপর থেকে জীবনের ইমোশনাল ব্যাপারগুলো সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছি। আমাদের এই ট্রেডে কাজ করতে হলে পুরুষ মানুষের সংস্পর্শে আসতেই হয়। আর পুরুষরা যেমন হয়, সুন্দরী মহিলা তার ওপর একা, খবর পেলেই প্রেমের প্রস্তাব দেয়। ব্যবসার খাতিরে ভদ্রতা বজায় রেখে এদের কাটিয়েছি একের পর এক। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলাম। নিজেকে অনেক বুঝিয়েছি। তুমি এখনও অবিবাহিত, আমার মত সংসারভাঙা মেয়ের সঙ্গে তুমি কেন জড়াতে চাইবে। শেষ পর্যন্ত পারলাম না। আমাদের ট্রেডে কাজ করার কোনও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বস্‌কে প্রভাবিত করে তোমাকে অফিসে ঢোকালাম। বাইরে নিয়ে গেলাম নিজেকে যাচাই করতে। খুব খারাপ লাগছে এসব শুনতে, না?'

'শেষ করনি এখনও। প্লিজ—।'

'বুঝতেই পারছ কী কথা বলব?'

'যাচাই করে কী দেখলে?'

আমার মনের কাছে আমি হেরে গিয়েছি। মাধবিকা তাকাল সপ্তমের মুখের দিকে। সপ্তমের হাত কাঁপছিল। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মাধবিকাকে স্পর্শ করতে। কিন্তু কোনও রকমে কাঁপা গলায় বলতে পারল, 'আমাকে সত্যি তুমি ভালবাসবে মাধবিকা?'

মাধবিকা চোখ বন্ধ করে নীরবে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

অদ্ভুত শক্তি এল মনে। দু'হাতে মাধবিকাকে জড়িয়ে ধরল সপ্তম। জীবনে প্রথমবার সে কোনও নারীশরীরকে এইভাবে আলিঙ্গন করছে। একটা তুলতুলে নরম অনুভূতি, স্নান করে পারফিউম মেখে আসার কারণে মোলায়েম গন্ধ সপ্তমকে সম্রাট করে দিচ্ছিল। মাধবিকা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যে ডিভোর্সি—'

'আমি ওসব মনে রাখতে চাই না—।' সপ্তম বলল। আর তখনই ওপাশের ঘর থেকে বউদির গলা ভেসে এল, 'মাধবিকা?'

দ্রুত নিজেকে সরিয়ে নিল মাধবিকা। নিয়ে হাসল। তারপর গলা তুলল, 'বল?'

বউদির উত্তেজিত গলা শোনা গেল, তাড়াতাড়ি চলে এস এখানে, খবর শোন!'

মাধবিকা সপ্তমের হাত ধরল, 'এস।'

টিভির সামনে বসেছিলেন ভদ্রমহিলা, বললেন, 'মারাত্মক কাণ্ড হয়ে গেছে।'

সংবাদপাঠক তখন হেডলাইন বলার পর প্রধানমন্ত্রীর খবর বলছিলেন। সেটা শেষ হওয়ার পর গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় সল্টলেকের এক নম্বর সেক্টরে কিছু উগ্রপন্থী বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষবাবুর ওপর হামলা চালায়। অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ওঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। উগ্রপন্থীদের এই আক্রমণে গাড়ির ড্রাইভার এবং দেহরক্ষী ঘটনাস্থলেই মারা যান। মারাত্মক আহত অবস্থায় সমাজসেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষ খবর অনুযায়ী তাঁর অবস্থা ভাল নয়। বুক ছাড়াও মাথার একদিকে গুলি লেগেছে। তিনি এই শহরে সুভাষদা হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন।' তারপর গুলিবিদ্ধ গাড়ি এবং দু'জনের মৃতদেহ দেখানো হল। সংবাদপাঠক বললেন, 'আততায়ীরা ধরা পড়েনি। সন্দেহ করা হচ্ছে তারা বাইকে চেপে এসেছিল। পুলিস ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে।'

সপ্তমের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'সর্বনাশ।'

মাধবিকা জিজ্ঞাসা করল, 'এই সুভাষদা কি—?'

মাথা নাড়ল সপ্তম, 'ওঁর মত ক্ষমতাবান মানুষ, দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারতেন, তাকেও ওরা মেরে ফেলতে পারল? ভাবতে পারছি না।'

মাধবিকা বলল, 'উনি এখনও মারা যাননি।'

'কিন্তু যেভাবে গুলি লেগেছে সেটাই তো অকল্পনীয়।'

'ওর অনেক শত্রু ছিল নিশ্চয়ই।' বউদি বললেন।

'হ্যাঁ, ছিল। সমাজসেবীর পরিচয় ওঁর একটা ছদ্মবেশ। জনি মালেক চেয়েছিল এলাকাটা যেন সুভাষদা ছেড়ে দেয়। সুভাষদা রাজি হয়নি। আর যাই হোক, সুভাষদা রশিদদের থেকে অনেক ভদ্রমানুষ। আমার সঙ্গে ইচ্ছে করলে খারাপ ব্যবহার করতে পারতেন, করেননি। একসময় আমাকে ভদ্রভাবে রোজগারের জন্যে একজন ইনস্যুরেন্স এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। উঃ, খুব খারাপ লাগছে।' দু'হাতে মুখ ঢাকল সপ্তম।

বউদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঁকে কারা খুন কবার চেষ্টা করেছে আপনি অনুমান করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি। অনুমান নয়, ওটাই সত্যি।'

'আপনি ওঁকে টেলিফোনে জানিয়ে দিন!'

'কাকে?' সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

মাধবিকা বলল, 'দাদার কথা বলছেন বউদি।'

ভদ্রমহিলা স্বামীর মোবাইলের নাম্বার টিপে এগিয়ে দিলেন। কানে চাপল সপ্তম। মাধবিকার দাদার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো!'

'আমি সপ্তম বলছি।'

'ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। লোক পৌঁছে যাবে।'

'না-না। আমি ও ব্যাপারে ব্যস্ত নই। আজ সন্ধ্যায় সুভাষদার ওপর কারা আক্রমণ করেছে, তা কি আপনারা জানতে পেরেছেন?'

'আপনি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো অস্পষ্ট নয়।'

'তাহলে তো আপনারা ওদের ধরে ফেলতে পারেন।'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কোনও প্রমাণ ছাড়া একজন নামী শিল্পপতিকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি না। তাছাড়া আজ মালয়েশিয়ানদের সম্মানার্থে উনি তাজ বেঙ্গলে যে পার্টি দিচ্ছেন তাতে শিল্পমন্ত্রী যোগ দিচ্ছেন। ঠিক আছে, রাখছি।'

'শুনুন, আপনি একবার রশিদের ডেরা খোঁজ করুন।'

'রশিদের ডেরা?'

জায়গাটা বুঝিয়ে দিল সপ্তম। তারপর বলল, 'আর একজনকে ধরা দরকার। সেই অফিসার যে আমাকে নকল জনি মালেকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তার নাম কি?'

'নাম আমি জানি না কিন্তু দেখে বলতে পারি।'

'আপনি বাড়ি থেকে কাউকে ফোন করবেন না। যখন বেরবেন তখন নির্জন রাস্তার টেলিফোন বুথ থেকে করে দেখতে পারেন। লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

দশ মিনিটের মধ্যে একজন লোক এসে জানাল, 'সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

সপ্তম উঠল। মাধবিকা ওর পাশে চলে এল, 'সাবধানে থাকবে।'

'হ্যাঁ, তুমিও।'

'আমি তো এখানে আছি। দাদার অনুমতি পেলে তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব।'

'ঠিক আছে।'

এখন বেশ রাত। ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই সেটা চলতে শুরু করল। এসব জায়গা খুব নির্জন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সপ্তম লোকটাকে বলল, 'একটা টেলিফোন করব ভাই, ফাঁকা বুথ পেলে দাঁড়াবেন।'

মিনিট চারেকের মধ্যে সে রকম বুথ পাওয়া গেল। রাসেলের নাম্বার টিপল সপ্তম। রিং হচ্ছে। তারপর রাসেলের গলা, 'হ্যালো।'

'সুভাষদার খবরটা শুনলাম রাসেল!'

'কে?'

'আমি সপ্তম।'

'কত নাম্বার চান?'

ঠিকঠাক নাম্বার বলল সপ্তম।

রাসেল জানাল, 'সরি। রং নাম্বার।' লাইন কেটে গেল। ফোনের ওপরের ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে তাকাল সপ্তম। সেখানে রাসেলের নাম্বার জ্বলজ্বল করছে। সে হতভম্ব হয়ে গেল।

রাসেলের ব্যবহার আচমকা পাল্টে গেল কেন বুঝতে পারছিল না সপ্তম। টেলিফোনে গলা চিনতে তার একটুও ভুল হয়নি। এই গলা সে অনেকবার শুনেছে। মনে হচ্ছিল রাসেল বেশ বিরক্ত হয়েছিল এবং চাইছিল কথা না বাড়াতে। এমন হতে পারে ওর সামনে অন্য লোক ছিল। কে জানে!

গেস্ট হাউসটি একটি পাঁচতলা বাড়ির শেষতলায়। ড্রাইভার তাকে কেয়ারটেকারের অফিসে পৌঁছে দিতে সেই লোকটা তাকে লিফটে চাপিয়ে নিয়ে এল ওপরে। দরজা খুলে ঘর দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি রাত্রে কী খাবেন?

'রুটি। সঙ্গে যা হোক কিছু হলেই হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। আমি পাঠিয়ে দেব। ওখানে ইন্টারকাম আছে, কোনও সমস্যায় পড়লে আমাকে ডাকবেন। আচ্ছা, নমস্কার।' লোকটি চলে গেল।

সুন্দর সাজানো তিন ঘরের ফ্ল্যাটকে গেস্ট হাউস করা হয়েছে। তাকে এখানে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে এবং সেটা কতদিন তাই তার জানা নেই। জামাপ্যান্ট পাল্টে আর একটু তাজা হয়ে সে বাইরের ঘরে এল। রিমোট টিপতেই টিভি চালু হল। নাচ, গান, নাটক সিনেমা চলছে। এগুলো দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হচ্ছিল না।

ঝিমুনি আসছিল সপ্তমের। হঠাৎ খবর আরম্ভ হল। দিল্লির খবর শেষ হওয়ার পর সংবাদপাঠক তাঁর কৌতূহল মেটালেন, আজ সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত জনসেবক সুভাষদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চিকিৎসকের সম্মিলিত প্রয়াসও তাঁর জীবনরক্ষা করতে পারেনি। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্র তাঁর অনুগামীরা ছুটে এসেছিলেন। মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সুভাষদার মৃতদেহ একঝলক দেখাল টিভির ক্যামেরা। লোকটা যাই হোক, তার সঙ্গে সরাসরি খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু ওঁর কথাই ছিল ওখানে শেষ কথা। সুভাষদাকে যে জনির লোক মেরেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? কে দেখেছে?

খাবার দিয়ে গেল একটা কিশোর। খেয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে শুতে যাবে এমন সময় টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলল সে, 'হ্যালো?'

'সব ঠিক আছে?' মাধবিকার দাদার গলা।

'হ্যাঁ।' সপ্তম বলল।

'খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কাছে আমার লোক যাচ্ছে। ওই গাড়িতে আপনি লালবাজারে চলে আসুন। আমাদের লোকজন আরও ডিটেলসে খবর জেনে নেবে।'

'লালবাজারে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো ওরা জেনে যাবে।'

'জানলেও ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া—, আচ্ছা, আসুন তো।'

ভদ্রলোর টেলিফোন রেখে দিলে সপ্তমের মনে হল এবার এখান থেকে পালিয়ে গেলে ভাল হয়। রাতের কোনও ট্রেন ধরে দূর দেশে গিয়ে থাকলে সে এই বিপদ কাটাতে পারে। কিন্তু সেটা করলে কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে যেতে হবে। মায়ের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না।

লালবাজারে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতেই এত লোক তার দিকে যেরকম চোখে তাকাল যে, সপ্তম জীবনের আশা ছেড়ে দিল। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই জনি মালেকের লোক রয়েছে। দোতলায় একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তাকে।

মাধবিকার দাদা ওই ঘরে নেই, কিন্তু তিনজন মানুষ অজস্র প্রশ্ন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। আপনি কি জানেন না বেআইনিভাবে ডলার কুড়িয়ে বাড়িতে রাখা গুরুতর অপরাধ। আপনি কেন তখনই পুলিসকে জানালেন না? আপনার বাড়িতে এসে একজন ডলার ফেরত চাইল? বিশ্বাস করতে বলেন? আপনার ঠিকানা তারা জানত না, ট্যাক্সিওয়ালা যে আপনাকে বাড়ির সামনে নামায়নি, তাও আপনি স্বীকার করেছেন। তাহলে কোন ক্লু ছিল লোকটার কাছে যা হাতড়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছেছিল?

আমি জানি না, এই উত্তর ওঁরা মানতেই চাইছিলেন না। একটার পর একটা প্রশ্ন করে ওঁরা প্রমাণ করতে চাইছিলেন সপ্তম মিথ্যেবাদী। গোড়ার দিকে সে প্রতিবাদ করছিল, প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করছিল, শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। ওরা যা ইচ্ছে বলে যাক, তার কান দেওয়ার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত ওই তিন অফিসারের মুখে যখন বিজয়ীর হাসি ফুটেছে, তখন সপ্তম সোজা হল, 'তাহলে আপনারা প্রমাণ করলেন আমি টেপরেকর্ডারে যা বলেছি, সব বানানো, মিথ্যে কথা।'

'সিওর।'

'তাহলে?'

'তাহলে মানে?'

'মিথ্যে কথা বলার অভিযোগে হয় আমাকে আদালতে তুলুন, নয় ছেড়ে দিন, বাড়ি চলে যাই। অবশ্য আমি তো কাউকে একটা গল্প বানিয়ে বলতে পারি আর তিনি সেটা রেকর্ড করে রাখতে পারেন। যিনি আপনাদের টেপটা দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই অভিযোগ করেননি যে, তাকে আমি ঠকাবার চেষ্টা করেছি?' উঠে দাঁড়াল সে।

'না না—।'

'তাহলে আমি কি যেতে পারি?'

তিনজন অফিসার হতভম্ব হয়ে এ-ওর দিকে তাকালেন। তারপর একজন বললেন, 'না, মানে, আমরা জানতে চাইছিলাম আপনি সত্যি বলছেন কিনা!'

'সেটা জেনে নিয়েছেন। পুরো বানানো গল্প বলেছি। তাই না?' সপ্তম উত্তেজিত হচ্ছিল, 'তাহলে আমাকে যেতে দিতে আপনাদের আপত্তি হচ্ছে কেন?'

এই সময় আর একজন প্রবীণ অফিসার ঢুকলেন। এঁদের কাছ থেকে সমস্যাটা শুনলেন। হেসে বললেন, 'নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছ তোমরা। কতবার বলেছি একজন ভদ্রলোক আর একজন খুনির সঙ্গে একই ট্রিটমেন্ট কোর না। ওঁর স্টেটমেন্টের ফাঁক ধরতে ব্যস্ত হলে তোমরা? আই অ্যাম সরি মিস্টার চ্যাটার্জি। ধরে নিন এটা একটা সরকারি পদ্ধতি। পদ্ধতিটা সঠিক নয়। আসুন আমার সঙ্গে।'

ভদ্রলোক ওকে নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে। চেয়ারে বসামাত্র টেলিফোন বাজল। 'হ্যাঁ স্যার, উনি আমার সামনে বসে আছেন। আপনি আসবেন? ওঁকে নিয়ে আমি যেতে পারি—, ও, আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ওকে।' রিসিভার নামিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খাবেন? চা, না কফি?'

'ধন্যবাদ, কিছু না।' মাথা নাড়ল সপ্তম।

'ডিনারের পরেও তো কফি খাওয়া যায়—। অবশ্য—।'

'ঠিক আছে বলুন। রেগুলার কফি।'

বেল বাজিয়ে আর্দালিকে অর্ডার দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'কমিশনার নিজে আসছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কেন?'

'সেটা ওঁর মুখে শুনবেন। যে গেস্ট হাউসে আছেন, তাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না। ভালই।

'আর হ্যাঁ। আপনার মায়ের জন্যে চিন্তা করবেন না। চব্বিশ ঘণ্টা আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে যাতে কেউ ওঁর ক্ষতি না করতে পারে!'

সপ্তম কিছু বলল না। তাদের গলিতে যে কোনও বাইরের লোক কিছুক্ষণ থাকলেই পাড়ার মানুষের নজরে পড়ে যাবে, এ কথাটা এদের বলে কী লাভ!

একটু পরেই কমিশনার ঘরে ঢুকলেন। সামনের ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, হেসে বললেন, 'ইনিই—।'

'সপ্তম চ্যাটার্জি?' কলকাতা পুলিসের বড়কর্তা হাত বাড়ালেন। বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দনের পর বললেন, 'উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। পশ্চিমবাংলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি।'

'আমি?'

'নিশ্চয়ই। আপনি যদি সন্দেহ না করতেন, তাহলে যে মালয়েশিয়ান প্রতিনিধিরা সি এমের সঙ্গে দেখা করে হাইওয়ে বানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কোনও খোঁজখবরই আমরা নিতাম না।'

'আপনারা খোঁজখবর নিয়েছেন?'

'ইয়েস। এরা মালয়েশিয়া থেকে এসেছে বটে, তবে পেশায় কেউ ইঞ্জিনিয়ার নয়, কোনও ফার্মের সঙ্গে জড়িত নয়। একটু আগে ওরা কলকাতায় ফিরে এসেছে।'

'ও। কিন্তু জনি মালেকের নামে কোনও শিল্পপতি কি আকে থেকে এখানে ছিল?'

'হ্যাঁ। সেই ব্যাপারটা আমাদের সমস্যায় ফেলেছে। মিস্টার মালেকের বয়স এখন সত্তরের ওপর হওয়া উচিত ছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে কেউ দেখেনি। সি এমের সঙ্গে

মালয়েশিয়ানদের নিয়ে যে শিল্পপতি নিজেকে মিস্টার মালেক পরিচয় দিয়ে দেখা করেছেন, তাঁর ঠিকানা ওই একই। অথচ এই ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের নিচে।'

'সেই অরিজিনাল মিস্টার মালেককে কেউ আইডেন্টিফাই করছে না?'

'এখনও সুযোগ পাইনি। তাছাড়া ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে, বউ, কেউ বেঁচে নেই।'

'আপনারা এদের অ্যারেস্ট করেছেন।?'

'না। আমরা আরও কয়েকজনকে চাই। এদের অ্যারেস্ট করলেই তারা হাওয়া হয়ে যাবে।'

'আমি আপনাকে আরও তিনটে নাম দিতে পারি। যে মানিব্যাগে ডলার ছিল, তাতে একটা পাতলা কাগজও ছিল যাতে নামগুলো লেখা ছিল। এই চারজনের একজন জনি মালেক। এদের ওপর কলকাতার এক-একটা অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।'

'কে দিয়েছিল?'

'জানি না। তবে বিদেশ থেকে হুকুম এসেছিল।'

'বুঝেছি।' কমিশনার বসেছিলেন পাশের চেয়ারে। এবং তখন মাধবিকার দাদা যে ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তাকে দেখে সপ্তম অবাক।

প্রায় কাঁপতে কাঁপতে আগন্তুক বললেন, 'আমায় ডেকেছেন স্যার?'

মাধবিকার দাদা বললেন, 'ইনি এয়ারপোর্টের—।'

'ও হ্যাঁ। নিশ্চয়ই ডেকেছি। কেমন আছেন?'

'ভাল। মানে—।'

'সুভাষদাকে কারা খুন করেছে?'

'কী করে বলব স্যার? সল্টলেক তো আমার এলাকায় পড়ে না।' ভদ্রলোক জোরে মাথা নাড়লেন, 'উনি সমাজসেবী, সম্পর্ক ভাল ছিল, তাই পরিচয় ছিল।'

'জনি মালেক কেমন দেখতে?'

'কে জনি মালেক?'

'আপনি মশাই পুলিসের কলঙ্ক। সরকারের কাছে মাইনে নিচ্ছেন, সুভাষবাবুর কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন আবার জনি মালেকের হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন।'

'এ আপনি কী বলছেন স্যার। আই অ্যাম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড সৎ অফিসার অফ—। ছি ছি, এ আপনি কি দুর্নাম দিচ্ছেন স্যার।'

'ওই ভদ্রলোককে চেনেন?' আঙুল তুলে সপ্তমকে দেখালেন কমিশনার। যেন সামনের আলোটা অসুবিধা করছে, মাথা নাড়লেন অফিসার, 'নো স্যার। হু ইজি হি?'

'আমি সপ্তম চ্যাটার্জি। সুভাষদার ওখানে প্রথম দেখা হয়।'

'বাপের জন্মে এমন নাম শুনিনি।'

'শোনেননি?' সপ্তম উঠে দাঁড়াল। তারপর ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বলল, 'জনি মালেক সুভাষদার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। আপনি সেই প্রস্তাব নিয়ে সুভাষদার কাছে গিয়েছিলেন। সুভাষদা নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠালেন। এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট থেকে আপনি আমাকে নিয়ে যান সামনের পার্কিং লনে যেখানে গাড়িতে জনি বসে আছে বলে জানিয়েছিলেন। মনে পড়ছে? কিন্তু গাড়িতে জনি ছিল না। আর একজনকে জনি সাজিয়ে আপনি এনেছিলেন। মনে পড়ছে?'

'বাজে কথা। সব বাজ কথা।' অফিসার মাথা নাড়লেন।

'প্রমাণ চান?'

'প্রমাণ?'

'সেদিন আমি একা যাইনি। আপনি তো রাসেলকে চেনেন।'

'রাসেল?'

'সুভাষদা যে সমস্ত প্রমোটরকে নিজের দলে টেনেছিলেন তাদের একজন।'

'রাসেল কী প্রমাণ দেবে?'

'সেদিন এয়ারপোর্টে রাসেল তো আপনার-আমার ছবি তুলতে পারে?'

অফিসার কমিশনারের দিকে ঘুরে বললেন, 'স্যার এ সব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। ওই রাসেল ছেলেটা ভয়ঙ্কর। এতদিন সুভাষদার চামচা ছিল, কাল থেকে জনির দলে ভিড়ে গিয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে আপনি এতক্ষণে একে চিনতে পারছেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। খবর সংগ্রহের জন্যে এখানে-ওখানে যেতে হত। হয়ত কোথাও পরিচয় হয়ে থাকতে পারে।'

'আপনি এখন ক'দিন আমাদের এখানে থাকবেন। অফিসিয়ালি আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না, কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে পারবেন না। ওঁকে নিয়ে যান।'

এই সময় টেলিফোন বাজল। মাধবিকার দাদা রিসিভার তুললেন। চাপা গলায় কথা বলে রিসিভার রেখে জানালেন, 'ওরা আলিপুরের একটা গেস্ট হাউসে উঠেছে।'

'আলিপুর? অদ্ভুত।' কমিশনার বললেন।

'নির্জন জায়গা। নিরাপদ।'

'ক'জন?'

'পাঁচজন।'

'ঠিক আছে। সপ্তমবাবুকে এবার গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

সপ্তম উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে কতদিন থাকতে হবে ওখানে?'

'আপনি এখনই আপনার বাড়িতে চলে যেতে পারেন। শুধু আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা আপনাকে গেস্ট হাউসে থাকতে বলছি।'

সপ্তম দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, রশিদদের খবর পেয়েছেন?'

মাধবিকার দাদা বললেন, 'ওদের আস্তানার খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু এখনই আমরা ওদের ঘাঁটাব না। যদি প্রয়োজন হয় দুটো অপারেশন একই সঙ্গে চলবে।'

মধ্যরাতে লালবাজার থেকে বেরিয়ে গেস্ট হাউসে আসছিল সপ্তম। রাস্তা শুনশান। সে কেবলই পেছন দিকে তাকাচ্ছিল। তার লালবাজারে আসার খবর কি ওদের অজানা? যে রকম নেটওয়ার্ক তাতে এখন তো ওদের উচিত তার গাড়িকে অনুসরণ করা। সামনে, ড্রাইভারের পাশে এখন একজন দেহরক্ষী রয়েছে। যাওয়ার সময় ছিল না। না, কোনও গাড়িকে পেছন পেছন আসতে দেখল না সপ্তম।

সেই টেলিফোন বুথটা এখনও খোলা। সপ্তম গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামলে দেহরক্ষী আপত্তি জানাল, 'স্যার, আপনার নিচে নামা ঠিক হবে না। অর্ডার নেই।'

'কেউ যখন ফলো করেনি তখন ভয় পাবেন না।' বলে নিচে নেমে বুথে ঢুকে পড়ল সপ্তম। নাম্বার টিপল। দশটা নাম্বার। তারপর রিংয়ের আওয়াজ এবং রাসেলের গলা, 'হ্যালো।'

'আমি সপ্তম।'

'মাই গড। আপনি কোথায়? এটা কীসের নাম্বার?'

'তখন রেসপন্স করেননি কেন?'

'অসুবিধে ছিল, আপনার আমার দুজনেরই।'

'আপনি জনি রাসেলের দলে ঢুকেছেন?'

'কে বলল?'

'সেই অফিসার, যে এয়ারপোর্টে আমাকে —।'

'হ্যাঁ। উপায় নেই। কাজ করে খেতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই।'

'সুভাষদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন?'

'না। সুভাষদাই আমাকে এক্সপ্লয়েট করে গেছেন।'

'ওঁকে যারা মেরেছে তাদের চেনেন?'

'আমি স্পটে ছিলাম না।'

'আপনি এখন কোথায়?'

'ক্যামাক স্ট্রিটে।'

'সেই ফ্ল্যাটে?'

'হ্যাঁ। সপ্তম, আমি ব্যবসা করি। যে দেবতা সামনে এসে দাঁড়ায়, তার পুজো না করলে ব্যবসা করতে পারব না। আপনি কোথায়?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সপ্তম। রাসেলকে সে ঠিক দোষী বলে ভাবতে পারছে না। সুভাষদা ওর কাছে ভাগ নিত। এখন জনি নেবে। জনিকে টাকা না দিলে ও ব্যবসা করতে পারবে না। আর এই মুহূর্তে রাসেল তার কোনও উপকার করতে পারবে না।

গেস্ট হাউসে ওকে পৌঁছে দিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে টিভি চালাল। সব লোকাল চ্যানেল এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল সপ্তমের। কিন্তু ওর দাদার টেলিফোন নাম্বার তার জানা নেই। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সে ভাবতে শুরু করল। আজ রাতে পুলিস যদি ওদের সবাইকে অ্যারেস্ট করে, তাহলে তো তার কোনও ভয় নেই আর। সহজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। পুলিস এত দেরি করছে কেন, তাই সে বুঝতে পারছিল না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ টেলিফোনের প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে উঠে বসল বিছানায়। ঘড়িতে এখন রাত দুটো।

রিসিভার তুলে হ্যালো বলল সপ্তম।

'সরি, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?' মাধবিকার দাদার গলা।

'হ্যাঁ। কী হয়েছে?'

'ওপর থেকে গ্রিন সিগনাল পাওয়া মাত্র আমরা একটু আগে সবাইকে অ্যারেস্ট করেছি।

দরজায় কেউ শব্দ কবল, ঘুম ভেঙে গেল সপ্তমের। সারাদিনের ধকলে শরীরে দারুণ অবসাদ, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। তবু শব্দটা যখন হয়েই চলেছে তখন শুয়ে থাকাও গেল না। দরজা খুলতেই একজন পুলিস অফিসার খুব বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাব ঘুম ভাঙানোর জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে বলা হয়েছে এখনই আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'কোথায়?'

'লিন্ডসে স্ট্রিটে।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! আপনি আমাকে কেন নিতে এসেছেন তা জানেন না?'

'এটা বোধহয় টপ সিক্রেট ব্যাপাব। আমরা পরে জানতে পারি।'

'আমি একটা ফোন করতে চাই।'

'কাকে?'

মাধবিকাব দাদার নাম বলল সপ্তম। অফিসার মাথা নাড়লেন, 'ওর মোবাইল নাম্বার জানেন? কাবণ উনি বোধহয বাড়িতে নেই।'

'তবু—।'

গেস্টহাউসেব কেয়ারটেকাব দূবে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সপ্তম তার দিকে এগিয়ে যেতে লোকটা তড়িঘড়ি রিসেপশনের ফোনটা তুলে ডায়াল করে বিসিভার এগিয়ে দিল। সপ্তম দেখল ঘড়িতে এখন রাত দুটো। এ সময় কারও জেগে থাকার কথা নয়। আটবার রিং হওয়ার পর নামিয়ে রাখতে গিয়ে থমকে গেল সপ্তম, ওপাশে মহিলার ঘুমভাঙা গলা, 'হ্যালো!'

'আমি সপ্তম, খুব দুঃখিত এইসময় ফোন করছি বলে—'

'ও আপনি!' মাধবিকার বউদির গলা, 'কী হয়েছে?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এত রাতে পুলিস অফিসার আমাকে লিন্ডসে স্ট্রিটে নিয়ে যেতে এসেছেন। আর দাদা বলেছিলেন যেন আমি এখান থেকে বের না হই। উনি আছেন?'

'না। একটু আগে আমি ওকে মোবাইলে ধরতে চেয়েছিলাম, সেটাও বন্ধ করে রেখেছেন।' বলা শেষ করে চাপা গলায় বললেন, 'সপ্তমবাবু।'

'নিন, কথা বলুন।'

সপ্তম বুঝল রিসিভার হাতবদল হল, মাধবিকার গলায় উদ্বেগ, 'কী হয়েছে?'

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলল সপ্তম।

'তুমি সিওর ওরা সত্যি সত্যি পুলিস?'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

'দাদার সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আমার খুব ভয় হচ্ছে সপ্তম।'

'কী করা যাবে। আমাকে যেতেই হবে! তোমাকে জানিয়ে গেলাম!'

'সপ্তম!'

মাধবিকার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে সপ্তমের খুব ভাল লাগল। এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছে করছিল বেশ ভাল ভাল কথা বলতে। মাধবিকা যে কতখানি জায়গা এর মধ্যে তাব জীবনে নিয়ে নিয়েছে, তা জানাতে। কিন্তু দুটো মুখ তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাতে—! সে নিচু গলায় বলল, 'ছাড়ছি।'

তৈরি হয়ে পুলিসের জিপে উঠে বসল সপ্তম। নির্জন রাজপথ, জিপ ঝড়ের মত উড়ে এল লিন্ডসে স্ট্রিটে। দুটো বাড়ির মাঝখানের প্যাসেজে আরও কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অফিসার বললেন, 'নামুন।'

ওঁকে অনুসরণ করে পুরনো বাড়ির দোতলার ঘরে ঢুকতেই বেশ কয়েকজন পুলিসের কর্তাকে গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখা গেল। সপ্তমকে বসতে বলা হল। সপ্তম বসল।

মাধবিকার দাদা এগিয়ে এলেন, 'যে পার্সে ডলার পেয়েছিলেন সেখানে একটা চিরকুটে জনি মালেক ছাড়া আব যাদের নাম লেখা ছিল তাদের আপনি আইডেনটিফাই করতে পারবেন?'

মাথা নাড়ল সপ্তম, 'না। আমি ওদের কখনও দেখিনি।

'ও। সপ্তম, আপনার দেওয়া স্টেটমেন্টে আমরা অনেক অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি। আপনাকে কে বলেছিল যে জনি মালেক মাধবিকাদের ট্রাভেল এজেন্সিকে দাযিত্ব দিয়েছিল মালয়েশিয়ানদেব নর্থ বেঙ্গলে ট্যুর অর্গানাইজ করতে? কে বলেছিল?' প্রায় ধমকের পর্যায়ে চলে গেল প্রশ্ন করার ধরন।

'আমায় কেউ বলবে কেন? আমি পরে মাধবিকার কাছে জেনেছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। মাধবিকা আপনার সঙ্গে বহু বছর আগে পড়ত। এতদিন তার কোনও যোগাযোগ ছিল না আপনার। হঠাৎ তার অফিসে গিযে চাকরি চাইলেন কেন?'

'আমার চাকরির দরকার ছিল। মাধবিকা সাহায্য করল।'

'ওখানে গিয়ে চাকরি চাইতে কে বলেছিল আপনাকে?'

'কেউ না।'

'আপনার এই বক্তব্যটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ট্রাভেল এজেন্সির কাজে ভাল ইংরেজি জানা দরকার। সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা। এই দুটো আপনার আয়ত্তে নেই। তবু মাধবিকার বস আপনাকে চাকরি দিয়েছে। আমি যদি বলি যারা আপনাকে ওখানে চাকরি চাইতে পাঠিয়েছিল তাদের কারও সুপারিশ মাধবিকার বস ফেলতে পারেননি তাহলে কি ভুল বলা হবে?'

'সম্পূর্ণ ভুল। আমাকে যদি ওরা ওখানে পাঠাত তাহলে আমার পরিচয় ওদের জানা থাকত। বহরমপুরে এসে পরিচয় জানার পরেই আমাকে খুন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ত না।'

'জানি। আপনার তরফে এইটেই অজুহাত হবে। বহরমপুরে এসে ওদের মনে হয়েছিল আপনি একটু বেশি জেনে গেছেন তাই সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। এটাই ঠিক, তাই না?'

'না। আপনারা মিছিমিছি আমার ওপর এসব চাপাচ্ছেন।'

'বেশ। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।'

শরীর প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল সপ্তমের। উঠতে দেরি করাতে একজন অফিসার তার হাত ধরতে চাইলেন। সে উঠে পড়ল। মাধবিকার দাদা তাকে পাশের ঘরে নিয়ে

গেলেন। সেখানে দুটি লোক দুটো চেয়ারে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে, মাথা ঝুঁকে আছে ওদের। দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড অত্যাচার হয়েছে ওদের ওপর।

মাধবিকার দাদা চাপা গলায় বললেন, 'ওমর, দ্যাখো তো কে এসেছে?'

লোকটা মুখ তুলল। মারের চোটে মুখ ফুলে গেছে, একটা চোখ ছোট হয়ে গেছে, মুখ ঘুরিয়ে লোকটা সপ্তমের দিকে তাকাতেই সপ্তম চিনতে পারল। এই লোকটাই রশিদের চৌরঙ্গির বাড়িতে সহকারী হিসেবে ছিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে মারধর করেছিল এই লোকটা।

ওমর মাথা নাড়ল নিঃশব্দে, চেনে।

'কোথায় দেখেছ ওকে?'

লোকটা কথা বলল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

মাধবিকার দাদা বললেন, 'তোমার ভালর জন্যই বলছি, মুখ খোল।

'কোই কাম থা—।'

'কি কাজ?''

'বস্ জানে।'

'তুমিও জানো।'

'হাম কুছ নেহি জানতা।'

'ও। তাহলে শোন, এই লোকটা এখন আমাদের বলবে, তোমার বস কোথায় লুকিয়ে আছে।'

শোনামাত্র ওমর মুখ তুলে তাকাল। তারপর একদলা থুতু ছুঁড়ল সপ্তমের দিকে। দুরত্ব বেশি থাকায় সেটা সপ্তমের কাছে পৌঁছল না। থুতু ছুঁড়ে ওমর বলল, 'শালা হারামিকা বাচ্চা, তেরা দিন খতম হো গিয়া বেইমান,' কথাগুলো সপ্তমের উদ্দেশে বলা।

'তোমাদের ওখানে যেদিন ও গিয়েছিল সেদিনকার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ। মনে আছে। ট্যাক্সিওয়ালাকে চেনাতে ওকে ডেকে এনেছিলাম। হারামিটা ডলার মেরে দিয়েছিল। রশিদভাইকে বলেছিলাম ডলারসমেত ওকে তুলে আনছি কিন্তু রশিদভাই আপত্তি করল। উল্টে ওকে টাকা দিল। ভাল ব্যবহার করল। কিন্তু বেইমান যে সে সবসময় বেইমানি করবে। এই শালা আমাদের কথা আপনাদের বলে দিল। কিন্তু এর জান এখন খতরামে, আমি বলে দিলাম।'

'রশিদ এখন কোথায়?'

'আমি জানি না সাহেব।'

'তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে ও কোথায় গিয়েছিল?'

'ওই ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে।'

'ডলারের বদলে ও রশিদের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিল তা কি ফেরত দিয়েছিল?'

'ওর বাপ দেবে ও তো খটমল। তখনই রশিদভাই-এর উচিত ছিল ওকে বড় শাস্তি দেওয়া। তা না করে টাকাগুলো ফেরত নিয়েছিল, বলেছিল এটাই ওর শাস্তি।'

'কি বেইমানি করেছিল ও?'

'রশিদভাই-এর কাছে টাকা খেয়েছিল আবার সুভাষবাবুকে সব খবর দিত।'

'মিথ্যে কথা।' চিৎকার করে উঠল সপ্তম।

'চেঁচাবেন না।' মাধবিকার দাদা ধমক দিলেন।

'সুভাষবাবুর কাছে টাকা পেত ও?'

'নিশ্চয়ই পেত।'

'না। এসব মিথ্যে কথা।' প্রতিবাদ করল সপ্তম।

কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মাধবিকার দাদা জিজ্ঞাসা করল, 'সুভাষবাবুকে খুন করেছিল কে? তুমি?'

'আমি? আমি কেন খুন করতে যাব?'

মাধবিকার দাদা হাসল তারপর সপ্তমকে ইশারা করল বাইরে আসার জন্যে। বাইরে এসে সপ্তম জিজ্ঞাসা করল। 'আপনি কি চাইছেন বলুন তো?'

'আমার বোনের সহকর্মী বলে আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সরি, অনেকগুলো ব্যাপার আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আপনাকে আমি এখনই অ্যারেস্ট করতে পারি, বেশ কয়েকমাস ভেতরে আটকে রাখতে পারি কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না।'

'কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'বেশ তো, আপনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করুন।'

'কীভাবে?'

'আপাতত রশিদকে খুঁজে বের করে আমাদের খবর দিন। আজ সন্ধের পর থেকেই কলকাতা থেকে বাইরে যাওয়ার সব কটা পথ আমরা সিল করে দিয়েছি। রশিদ নিশ্চয়ই এই শহরে রয়েছে। আপনি ওঁর খবর এনে দিন।

'আশ্চর্য। আমি কী করে খবর পাব?'

সেটা আপনার সমস্যা। আপনাকে আমি তিনদিন সময় দিলাম।' মাধবিকার দাদা বললেন, 'আপনি চাইলে আমাদের গাড়ি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'আমার বাড়িতে? সেখানে আমি তো নিরাপদ নই।'

'স্বাভাবিক। দুমুখো লোকেরা এই বিপদে একসময় পড়েই। অবশ্য তাতে একটা সুবিধে হবে। আপনাকে খতম করতে ওরা আপনার কাছেই উপস্থিত হবে। কীভাবে পরিস্থিতি ট্যাকল করবেন সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে।'

'আমি, আমি এখন ওই গেস্ট হাউসে যেতে পারি না?'

মাধবিকার দাদা সপ্তমের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, যেতে পারেন। তবে কাল বিকেলের আগে আপনাকে গেস্ট হাউস ছেড়ে দিতে হবে।'

কোনও অফিসার সঙ্গে এলেন না, ড্রাইভার সপ্তমকে একাই নিয়ে এল গেস্ট হাউসে। দরজা খুলে কেয়ারটেকার তাকে একলা দেখে হাসল, 'যাক, ফিরে এলেন।'

'মানে?'

'আমি তো ভেবেছিলাম আর ফিরবেন না।'

'কেন ভাবলেন?'

'এর আগে এখান থেকে মাঝরাতে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা কেউ ফেরেননি।' বলেই ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমার অবশ্য এসব কথা বলা উচিত নয়। ও হ্যাঁ, আপনার দুটো ফোন এসেছিল।'

'ফোন? আমার? এখানে?' খুব অবাক হল সপ্তম।

'হ্যাঁ। এই যে এখানে লিখে রেখেছি। ইনি মহিলা। মোবাইলে করেছে। বলেছেন যত রাত হোক এসে যেন ফোন করেন।' নাম্বার লেখা কাগজ এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

ডায়াল করতেই মাধবিকার গলা পেল সপ্তম, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'সেকি! আমার দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না, এরকমটা হয় না। তারপর শুনলাম তুমিও নেই।'

'তোমার দাদা প্রমাণ করতে চাইছেন যে আমি দুমুখো স্পাই। আসলে জনি মালেকের লোক।'

'সে কী? কী বলছ তুমি?' চিৎকার করে উঠল মাধবিকা।

'হ্যাঁ। আমাকে যথেষ্ট অপমান করার পর তিনদিন সময় দিয়েছেন রশিদকে খুঁজে বের করে দিতে। মাধবিকা, আমি শেষ, একদম শেষ হয়ে গেছি।' গলা ভেঙে গেল সপ্তমের।

'না, প্লিজ। আমি দাদার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি কখনও এরকম করতে পার না।'

'তোমার দাদা জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি আমাকে কতটুকু চেন! ওঁর বিশ্বাস জনি মালেকেরা তোমার বসকে ইনফ্লুয়েন্স করে আমাকে ওখানে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আজকের রাতটা আমাকে এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে, কাল চলে যেতে হবে। কোথায় যাব জানি না।'

'তোমার বাড়ি—'

'দেখি।'

'আমাকে না জানিয়ে কোথাও যেও না, প্লিজ।'

'আচ্ছা।'

রিসিভার রেখে অনেকক্ষণ পরে মনে হল সে এই পৃথিবীতে একা নেই। একজন মানুষ তার পাশে বন্ধুর মত আছে। এই অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। কেয়ারটেকার তাকে লক্ষ্য করছিলেন। আর একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন, 'এখানেও ফোন করতে বলেছে। নাম বলেছে রাসেল। বলেছে যত রাত হোক—।

রাসেল। এই শেষ রাতে ওকে ফোন করা ঠিক হবে? হঠাৎ সপ্তমের মনে হল রাসেল তাকে সাহায্য করতে পারে। একমাত্র ওই চেষ্টা করতে তাকে পৌঁছে দিতে পারে রশিদের কাছে।

রিং হচ্ছে। এক, দুই, তিন, বারংবার। শেষে থেমে গেল। রিডায়াল টিপল সপ্তম। তিনবারের পর ঘুম জড়ানো গলায় রাসেল বলল, 'হ্যালো।'

'আমি সপ্তম। ফোন করতে বলেছিলেন?'

'ও হ্যাঁ। কটা বাজে? বাপস। কোথায় আপনি?'

'একটা গেস্ট হাউসে। আমার নাম্বার কোথায় পেয়েছেন?'

'একটা ঘোস্ট কল এসেছিল। বলেছিল এই নাম্বারে, আপনাকে পাওয়া যাবে।'

'কে করেছিল?'

'নাম বলেনি।'

'পুলিসের কেউ ছাড়া এই নাম্বার কারও জানার কথা নয়।'

'পুলিস? মাই গড!' আঁতকে উঠল রাসেল।

'আমি বুঝতে পারছি না। কেন ফোন করেছিল?'

'আপনি কলকাতা থেকে চলে যান। আমি খবর পেয়েছি আপনাকে যারা খুঁজছে তারা—, বুঝতেই পারছেন ওরা আপনাকে শত্রু বলে ধরে নিয়েছে।'

'আপনি রশিদের হদিস দিতে পারেন?'

'রশিদ? না পারব না। আপনাকে আবার বলছি এখনই কলকাতা থেকে সরে যান।' ফোনের লাইন কেটে গেল। কেয়ারটেকারের কৌতূহলী মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে এল সে। কোথায় যাবে? কোথায় পালাবে? কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে হলে সঙ্গে টাকা থাকা দরকার। সেই টাকা এখন তার নেই। আর কাল সকাল হলে, এই কলকাতার রাস্তায় হাঁটা মানেই যে কোনও মুহূর্তেই আততায়ীর গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু রাসেলকে এই গেস্ট হাউসের নাম্বার কে দিল? মাধবিকার দাদাকে সে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল তাতে রাসেলের নাম বলেছিল। রাসেলকে খুঁজে বের করতে পুলিসের অসুবিধে হবে না। ওর মোবাইলের নাম্বার পাওয়াও খুব শক্ত নয়। তাহলে পুলিস কি—! তার মানে এই গেস্ট হাউসের ফোন ট্যাপ করা হয়েছে। এতক্ষণ যা কথাবার্তা হয়েছে সব পুলিস শুনতে পেয়েছে। পাক। সে তো কোনও অন্যায় কথা বলেনি।

ঘুম আসছিল না। মাঝে মাঝে বাইরে গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে আর সপ্তমের মনে হল কেউ হয়ত তার খোঁজে এসেছে। রাসেল কি রশিদকে জানিয়ে দেবে সে কোথায় আছে? এখন আর কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

ভোর চারটে নাগাদ সে তার হাতব্যাগ নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হল। বাইরেটা অন্ধকার। জেগে থাকার কারণ নেই বুঝে কেয়ারটেকার তার বিছানায় চলে গিয়েছে। পা টিপে টিপে সে বাইরে বেরুবার দরজায় পৌঁছে গিয়ে পরিষ্কার দেখল সেখানে তালা ঝুলছে। অর্থাৎ বাইরে যাওয়ার এই পথ বন্ধ। আবার ফিরল সে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রান্নাঘরে পৌঁছে আর একটি দরজা আবিষ্কার করতে পারল। দরজাটা খোলার সময় শব্দ হল একটু। একটা বারান্দা তারপর লন। দ্রুত পা চালালো সপ্তম। রাস্তায় এখন হালকা অন্ধকার। দুপাশে স্ট্রিটলাইটগুলো হলদে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে ওর মনে হল আড়ালে সরে যাওয়া ভাল। ঝট করে একটা গাছের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা মারুতি ভ্যান এসে থামল গেস্ট হাউসের সামনে। চারজন লোক লাফিয়ে নেমে গেল ভেতরে। লোকগুলো সশস্ত্র। সপ্তম পা চালালো। ওরা যে পুলিস নয় তা ওর কাছে স্পষ্ট। তার মানে রাসেল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আধঘণ্টা হাঁটার পর ভোর পাঁচটা নাগাদ একটা এস টি ডি বুথ খোলা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সপ্তম। নাম্বার টিপতেই রিং হল। তারপরেই মাধবিকার গলা, 'হ্যালো।'

যতটা সংক্ষেপে ঘটনাগুলো বলে সপ্তম শেষ করল, 'আমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।'

'তোমার কাছে টাকা আছে?'

'না।'

'তাহলে? কী করে যাবে?'

'আমি জানি না। আমি কী করব কিছুই জানি না।'

'তুমি যে কোনও পুলিস স্টেশনে চলে যাও। না, লালবাজারে যাও, ওখানে যাওয়াটাই ঠিক হবে।'

'তারপর?'

'তারপর ওদের বল তুমি কনফেস করতে চাও। তুমি আমার দাদার বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলিংয়ের চার্জ আনো। শুধু এই কারণে ওরা তোমাকে অ্যারেস্ট করবে।'

'দূর! পাত্তাই দেবে না।'

'দেবে। আমি সবকটা খবরেব কাগজকে বলছি লালবাজারে গিয়ে তোমাকে ইন্টারভিউ করতে।'

'তারপর?' সপ্তমেব গলায় বিস্ময়।

'কোথাও পালিয়ে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। একমাত্র পুলিস কাস্টডি তোমাকে নিবাপত্তা দিতে পারে। আর কথা বাড়িও না। প্লিজ, লালবাজার চলে যাও।'

রাস্তায় বেরিয়ে অনেকটা নিশ্চিত বোধ করল সপ্তম। পুলিসের কাছে একজন নাগরিক হিসেবে সে এই নিরাপত্তা চাইতেই পাবে। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল সপ্তম। বলল, 'লালবাজার।'

লালবাজারের ঘুম এখনও ভাঙেনি। ট্রাম রাস্তাটার ওপর বেশ গভীর ছায়া, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দুপাশের দোকানগুলো বন্ধ। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল সপ্তম। গেটে পাহারায় থাকা সেপাইদের চোখে পড়ছে না। চারধারে কী রকম ঢিলেঢালা ভাব।

সিঁড়ির মুখে অবশ্য প্রতিরোধ এল। উর্দিপরা একজন জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?'

'পুলিস কমিশনার' নির্বিকার মুখে বলল সপ্তম।

'কে আপনি?'

'আমি ভারতবর্ষেব এক নাগরিক।'

'দূব মশাই। এতদূরে ঢুকলেন কী করে! কেটে পড়ুন, যান, যান।'

'আশ্চর্য। আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন না।'

'একশবার পারি, সাতসকালে যত পাগলছাগলের কারবার।'

এই সময় হোমরাচোমরা চেহারার একজন ওপর থেকে নেমে আসছিলেন। উর্দিপরা লোকটা তাঁকে স্যালুট করতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

উর্দিপরা লোকটি বলল, 'কীভাবে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল, বলছে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। যান ভাই, চলে যান।'

'আপনার কিছু প্রয়োজন আছে?' হোমরাচোমরা জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। অনেক হয়েছে। কাল সারারাত আপনারা আমাকে দিয়ে বাঁদর নাচ নাচিয়েছেন, অনেক হয়েছে, আমি পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বলতে চাই আমাকে অ্যারেস্ট করুন।'

'আপনাকে বাঁদর নাচানো হয়েছে? কে নাচালো?'

'সবার নাম আমি জানি না।'

'আপনার নাম কি?'

'সপ্তম চ্যাটার্জি। জনি মালেকের কেসে আমাকে জড়ানো হয়েছে।'

'আই সি।' ভদ্রলোক ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, 'আসুন।'

'আপনি?'

'স্যার।' উর্দিপরা কিছু বলতে যেতেই ভদ্রলোক হাত তুলে নিষেধ করলেন। ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে ওকে বসতে বলে তিনি রুমালে মুখ মুছলেন, এই সময় আপনি কমিশনার সাহেবকে পারেন না। আপনার কোনও অভিযোগ থাকলে আমাকে বলুন।'

সপ্তম চুলে আঙুল চালালো, 'আমার প্রটেকশন চাই।'

'কীসের জন্যে?'

'আমাকে বলা হয়েছে, রশিদকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারেই কিছুই জানেন না। গোড়া থেকে সব বলা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মাধবিকার দাদার কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছি, সেটা আপনার জানার কথা নয়।'

'বোধহয় কিছুটা জানি। মাধবিকার দাদা কে?'

'নাম জানি না। আশ্চর্য! কাল বিকেল থেকে ওঁর সঙ্গে কথা বলছি, বলে যাচ্ছি অথচ---! বড় অফিসার। পুলিসের মত দেখতে নয়, রোগা, চশমা পরা, টাক হয়েছে।'

'ও। বুঝতে পেরেছি। আমাকে কি পুলিসের মত দেখতে?'

'না। এখন বোধহয় পুলিসের ওপর তলায় এটাই নিয়ম।'

'আপনাদের দেখে মনে হবে কেউ অধ্যাপক অথবা ইঞ্জিনিয়ার। অন্তত পুলিস নন। দেখুন স্যার, আমাকে একটা গেস্ট হাউসে শেল্টার দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ এখানে ডেকে এনে মিথ্যে মিথ্যে অভিযোগের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হল। বলা হয়েছে ভোরবেলায় গেস্ট হাউস ছেড়ে দিতে এবং যে করেই হোক রশিদকে খুঁজে বের করতে। আমি জানি না এত বড় শহরে সে কোথায় আছে। এতবড় পুলিসবাহিনী যাকে খুঁজে বের করতে পারছে না আমি কী করে পারব? আমি কি জেমস বণ্ড?'

'তা তো নিশ্চয়ই।' ভদ্রলোক হাসলেন।

'তার ওপর অল্পের জন্যে আজ বেঁচে গিয়েছি।'

'কী রকম?'

'আমি ভোরবেলায় বাইরে বেরুনো মাত্র একটা গাড়িতে চেপে কিছু লোক গেস্ট হাউসে ঢোকে। ওদের দেখে আমার খুনি বলে মনে হচ্ছিল। সপ্তমের কথা শেষ হওয়া মাত্র টেলিফোন বেজে উঠল, 'সেনগুপ্ত হিয়ার। অ্যাঁ? কোথায়? ও তুমি স্পটে যাচ্ছ। কুইক। আমি এখনও আর আধঘণ্টা অফিসে থাকব। লেট মি নো।' টেলিফোন অফ করে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ আপনি ভাগ্যবান। আপনি ঠিক চিনেছেন। কয়েকজন লোক গেস্ট হাউসে হামলা চালায়। কাউকে হয়ত খুঁজছিল। না পেয়ে কেয়ারটেকারকে আধমরা করে রেখে গেছে।'

'আমাকে, আমাকে খুঁজছিল। ওদের ধরলেই রশিদের খবর পাওয়া যেত স্যার।'

'ওরা যে সে সময় গেস্ট হাউসে হামলা করবে তা জানা ছিল না। থাকলে ওদের ধরার ব্যবস্থা করা যেত।' বেল বাজালেন সেনগুপ্ত। বেয়ারা ঢুকতে বললেন, 'আমাদের দু'কাপ চা দিয়ে বাড়ি চলে যাও। সারারাত জেগেছ।

'না স্যার, ঠিক আছে।' বেয়ারা চলে গেল।

'কিন্তু স্যার, আমি যে ওই গেস্ট হাউসে আছি তা পুলিস ছাড়া কেউ জানত না। তাহলে ওরা কী করে খবর পেল? সপ্তম সোজা হয়ে বলল।

'আপনি গেস্ট হাউস থেকে কাউকে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে?'

'মাধবিকাকে আর রাসেলকে।'

'তখন রাত কটা?'

'অনেক রাত। লালবাজার থেকে ফিরে যাওয়ার পর।' সপ্তম বলল, 'তখন কাউকে ফোন করার সময় নয়। কিন্তু গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার আমাকে এমনভাবে বলল।'

'কেয়ারটেকার আপনাকে ফোন করতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'মাধবিকার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'একসময় কলেজে সহপাঠী ছিলাম। এখন ওর ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করছি।'

'মাধবিকার ট্রাভেল এজেন্সি আছে?'

'না। ওর নয়। তবে ওর বেশ প্রতিপত্তি আছে।'

'ব্যাস, আর কোনও সম্পর্ক নেই?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না জানেন। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ও আমার সম্পর্কে দুর্বল। ওর অবশ্য আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। আমি তাতে কিছু মনে করি না।'

'আপনি টেলিফোন করলে মাধবিকা কী বলল?'

'ও বলল, লালবাজারে এসে সিকিউরিটি চাইতে। পুলিশ অন্তত আমাকে অ্যারেস্ট করুক।'

'আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকলে পুলিস কেন অ্যারেস্ট করবে?'

'মাধবিকা বলেছে ওর দাদার বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের চার্জ আনতে।'

'মাইগড! কেন?'

'উনি এতদিন কিছুই জানতেন না। আমি ওর সব কথা বলার পর কোথায় আমাকে সাহায্য করবেন না উল্টে আমাকেই কাঁদাচ্ছেন। বলছেন রশিদকে খুঁজে বের করতে। এটা তো ইচ্ছে করে আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। ব্ল্যাকমেইলিং নয়? আমি ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি আমাকে খুনের ব্যাপারে উনি অপরাধীদের সাহায্য করছেন।'

'আপনি একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন।'

এই সময় চা এল। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন, 'নিন, চা খান। এখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই টেনশনে চা খাওয়ার সুযোগ পাননি।'

নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক পাশের ঘরে চলে গেলেন। সপ্তম দেখল দরজাটা বন্ধ হল। এখন তার আর কিছুতেই ভয় লাগছে না। কি আর হবে? গ্রেপ্তার করে জেলে ভরে রাখবে। সেখানে তো কেউ মরে যায় না।

যায় না নাকি? পুলিস হাজতে আসামীর মৃত্যু, কাগজে এরকম খবর অনেক পড়েছে সে। রশিদদের হাত যে এখানে পৌঁছবে না তা কে বলতে পারে।

ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে, 'রাসেল কে সপ্তমবাবু?'

'একজন প্রমোটর। অল্প বয়স। সুভাষদার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল। ওখানেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মানুষটাকে ভাল বলে মনে হয়েছিল।' সপ্তম বলল।

'এই রাসেল গতরাত্রে আপনাকে ফোন করেছিল।'

'হ্যাঁ। কেয়ারটেকার বলায় আমিও কলব্যাক করেছিলাম।'

'রাসেল গেস্ট হাউসের নাম্বার কোথায় পেয়েছিল?'

'কথাটা আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলেছিল কেউ একজন, নাম বলেনি, ঘোস্ট কল, আমাকে ফোন করতে বলেছিল গেস্ট হাউসের নাম্বার দিয়ে।'

'কে হতে পারে ভাবতে পারেন?'

'না।'

'দেখুন সপ্তমবাবু, আপনি ইচ্ছেয় হোক অথবা অনিচ্ছায়, খুব ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে এনেছেন। আমি কমিশনারের সঙ্গে কথা বললাম। কেসটা দেখছেন গোয়েন্দা বিভাগের আই জি। আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা করুন।

'কীভাবে দেখা করব?'

'আমি এই মাত্র ওঁর সঙ্গে কথা বললাম, উনি এখন লেকে হাঁটছেন। একটু পরে অ্যান্ডারসন ক্লাবে ঢুকে চা খাবেন। থাকবেন সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। এখনও অনেক সময় আছে। চলুন। আমি ওদিকে যাব, আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি।'

গাড়িতে বসে ভদ্রলোক বললেন, 'রশিদের কোনও গোপন ডেরার কথা আপনি জানেন না একথা পুলিস বিশ্বাস করতে পারছে না।'

'—কেন পারছে না? আমার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'দেখুন, কথাটা ওঁকে বলে দেখুন।'

এখনও সকাল পুরোপুরি হয়নি। লেকে স্বাস্থ্যচেতনদের ভিড়। ক্লাবের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আসুন।'

আচ্ছা আমরা যাঁর কাছে যাচ্ছি তার নাম কি?'

'আমার নাম কি আপনি জানেন?'

'না। আপনি বলেননি।'

ভদ্রলোক হাসলেন। গেট পেরিয়েই বাঁ দিকে লন। লনে চেয়ার পেতে বসে অনেকে চা খাচ্ছে। হঠাৎ ছিপছিপে চেহারার কাঁচাপাকা চুলের এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'গুড মর্নিং স্যার।'

'গুড মর্নিং, চ্যাটার্জি। এর নাম সপ্তম। কথা বলুন, আচ্ছা চলি।'

'কাল সারারাত জেগেছেন শুনলাম।'

'হ্যাঁ। ঘণ্টা তিনেকের ঘুম দরকার। তাই।' ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন, 'ওয়েল আপনিই সপ্তম?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, যিনি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনি কে?'

'ওর পরিচয় আপনি জানেন না?'

'না।'

'উনি যখন আপনাকে জানাননি, তখন—যাকগে, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা আপনার অতীত সম্পর্কে যেসব খবর পেয়েছি তাতে আপনাকে ভয়ঙ্কর বা উগ্রপন্থী ভাবার কোনও কারণ নেই। ছাড়া পাওয়ার পরেও আপনি ফিরে এলেন কেন?'

'আপনারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোথায় ছেড়েছিলেন, না, ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে? একে কি আপনি ছেড়ে দেওয়া বলেন!' সপ্তম আবার উত্তেজিত হল।

'কিন্তু আমরা কী করতে পারি সপ্তমবাবু?'

'আমার বিরুদ্ধে কোনও বড়সড় অভিযোগ এনে জেলে ভরে দিন। অবশ্য জেলেও খুন হয়।'

'আপনি এমন কি করেছেন যে কেউ আপনাকে খুন করবে?'

'কিছুই করিনি। কিন্তু আপনারা রটিয়ে দিয়েছেন আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে রশিদকে অ্যারেস্ট করতে গিয়েছেন। জনি মালেক আর মালয়েশিয়ানদের আমিই ধরিয়ে দিয়েছি।'

'কথাটা কি মিথ্যে? আপনি টেপ রেকর্ডারে বলেননি?'

'যে মুহূর্তে ওরা আমাকে ওদের শত্রু ভেবে নিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে আমাকে খুন করতে চেয়েছে ওরা। আমি তাই আপনাদের কাছে শেল্টার চেয়েছিলাম।

'আমি সবই বুঝতে পারছি সপ্তমবাবু। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।'

'তাহলে আমাকে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে হয়।'

'কী রকম?'

'কলকাতার সব প্রেসের লোকদের প্রেসক্লাবে ডেকে সত্যি ঘটনা খুলে বলব। তারপর যদি মরে যাই তো যাব।' সপ্তম বলল।

'কী বলবেন আপনি?'

'এক নম্বর, কলকাতায় যে মাফিয়ারা প্যারালাল শাসনব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে তা কলকাতার পুলিস জানে না। দুবাইয়ের নির্দেশে এই শাসনব্যবস্থা চলে। কলকাতাকে চারটে ভাগে ভাগ করে চারজনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরা এখান থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ তুলে দুবাইতে পাঠাচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করে টাকা আদায় করা এদের কাছে জলভাতের মত সহজ। কলকাতার মাস্তানদের মধ্যে যারা এদের অনুগত তারা তোলাবাজ হিসেবে বিখ্যাত। এই ব্যাপারটা সম্ভব হত না যদি পুলিসের কোনও কোনও অফিসার এদের সঙ্গে না থাকত। দুই নম্বর—।'

'দাঁড়ান। পুলিসের বিরুদ্ধে এরকম ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুললে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে। না দিতে পারলে—।'

'আপনি কি অন্ধ? খবরের কাগজ পড়েন না?'

মিস্টার চ্যাটার্জি হেসে ফেললেন, 'নিশ্চয়ই পড়ি।'

'এই যে দমদমের দুলাল ব্যানার্জিকে এতদিন পরে পুলিস বাধ্য হল ধরতে, ধরার আগে কি করেছিল? ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থানায় রেকর্ড করা হয়েছে? হয়নি। এমনকি, মামলা যাতে ধোপে না টেঁকে তারজন্যে ওর বাপের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এখন বাধ্য হয়ে তদন্তে নেমে ওর এলাকার কিছু অফিসারকে বদলি করা হয়নি? আর লক আপে থেকেও ওর কাছে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে যাতে সাম্রাজ্য চালাতে পারে। খবরের কাগজে লেখা হয়নি যে একজন কমিশনার ক্যাডারের অফিসার ওকে বিভিন্ন সুবিধে পাইয়ে দিতে আদাজল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। পড়েননি?'

'বাঃ। আপনি তো অনেক খবর রাখেন।'

'হ্যাঁ। সাধারণ মানুষরাই রাখে, আপনারা রাখতে চান না। এই দুলাল ফুলাল রশিদের কাছে চুনোপুঁটি। ওদের সম্পর্ক আরও ওপরের তলায়। আপনি কি জানেন শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা আসার ন্যাশনাল হাইওয়ে কারা নিয়ন্ত্রণ করে?

'কারা?'

'মাফিয়াবাহিনী। যে কোনও ধাবায় গিয়ে খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। এই পথের আশেপাশে যত থানা আছে, তার প্রত্যেকটি অফিসার এটা জেনেও চোখ বন্ধ করে থাকেন। হয় ভয়ে, নয় ভক্তিতে। কিনে নিয়েছে এরা। যে বিক্রি করবে না তাকে সরে যেতে হবে।'

'আপনি একটু বেশি বলছেন। কলকাতায় বোম্বের মত খুন জখম হয় না। যাকগে, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের কিছু উপকার করতে পারবেন। আপনি কলকাতাকে ভালবাসেন ·'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি নিশ্চয়ই এদের হাত থেকে কলকাতাকে মুক্ত করতে চান।'

'আমি একা চাইলে কী হবে, আপনাদের ওপর মানুষের আস্থা কমে গেছে।'

'একটা প্রমাণ দিন।'

সেই যে এক ভদ্রলোকের মানিব্যাগ চুরি গেল। হাজাব টাকা ছিল। থানায় গিয়ে ডায়েরি করলেন। তারপরের দিন খবর এল পকেটমার ধরা পড়েছে, আপনি আসুন। গেলেন। অফিসার বললেন, আট'শ টাকা ছিল। এটাই তো আপনার ব্যাগ, আপনাব ছবি আছে এর খোপে। কেস করে কোনও লাভ নেই। টাকাটা নিয়ে যান।'

দেওয়ার সময় চার'শ টাকা দিলেন। বললেন, মিষ্টি খাবে সবাই, তাই রাখলাম। বাইরে সেপাই ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'আপনার চক্ষুলজ্জা নেই, ব্যাগ ফেরত পেয়েছেন, দু'শ টাকা দিয়ে যান।' তাই দিলেন। গেটের দারোয়ান নিয়ে নিল দেড়শ টাকা। হাতে রইল পঞ্চাশ। ভদ্রলোক ভাবলেন পকেটমার ধরা পড়ায় তাঁর কি লাভ হল?'

মিস্টার ব্যানার্জিই বললেন, 'বুঝলাম। রশিদের কোনও বন্ধুকে চেনেন?'

'বন্ধু? না। ও হ্যাঁ—।'

'কি হল?'

'আচ্ছা, আপনারা একজন লোককে দুবাইয়ের মাফিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অ্যারেস্ট করেছিলেন। তার নাম ইমরান রহমান। মনে আছে?'

'আছে। ইমরান বেল পেয়েছে।'

'এই ইমরান রশিদের বন্ধু।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'ওদের একসঙ্গে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'রশিদের ওখানে। ইমরান ওদের হয়ে আমাকে কাজ করতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি। লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান।'

'ইমরান ওই ঠিকানায় নেই। ও আছে পার্ক সার্কাসের গেস্ট হাউসে। রোজ থানায়

হাজিরা দেয়। আদালতকে না বলে কলকাতার বাইরে যেতে পারবে না। আপনি ওর সঙ্গে দেখা করুন। গিয়ে বলুন ওর প্রস্তাবে আপনি রাজি আছেন।' মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন।

'অসম্ভব। আমাকে মেরে ফেলবে।'

'ইমরান জানে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিস এখন থেকে ওয়াচ করছে। তাই কিছুই বলবে না। আপনাকে আমরা ক'দিন প্রটেকশন দেব বলুন? একমাত্র ইমরানই পারে ওই রশিদদের বুঝিয়ে আপনাকে বাঁচাতে।' বলা মাত্র মিস্টার চ্যাটার্জির মোবাইল বেজে উঠল। তিনি ওটাকে অন করে কানে তুললেন, 'হ্যালো। ইয়েস। কী? কখন? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ। যন্ত্রটাকে বন্ধ করে চ্যাটার্জি উঠলেন, 'চলুন সপ্তমবাবু, আপনার এক বন্ধুকে শেষ দেখা দেখে আসবেন। ভোরবেলায় বেচারা খুন হয়েছে।'

'কে?' সপ্তম হতভম্ব।

'রাসেল।' মিস্টার চ্যাটার্জি এগিয়ে গেলেন।

রাসেল খুন হয়েছে! কীরকম অসাড় হয়ে গেল সপ্তম। এই একটু আগে, গেস্ট হাউসে পৌঁছে যখন সে ওকে টেলিফোন করেছিল তখন রাসেল কলকাতা থেকে পালাতে বলেছিল। খুন হয়েছে নিশ্চয়ই তার পরে। বেচারা কি জানত আজই খুন হবে। রাসেলের জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল। মদ খাক কিংবা খারাপ মহিলার কাছে যাক, রাসেলের মধ্যে একজন উপকারী বন্ধু ছিল। কিন্তু রাসেলকে যারা খুন করেছে তারা কি নজর রাখছে না?

ততক্ষণে মিস্টার চ্যাটার্জি গাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছেন। সপ্তম দ্রুত তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'কেন?'

'ওরা নিশ্চয়ই ওয়াচ রাখছে, আমাকে দেখলে ওদের টার্গেট করতে সুবিধে হবে।' 'আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, আপনি তো ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাহলে আপনাকে টার্গেট করবে কেন ওরা?' মিস্টার চ্যাটার্জি বিরক্ত হলেন।

'কিন্তু করছে যে সেটা আপনি ভাল করেই জানেন। সেই বহরমপুর থেকে তাড়িয়ে এসেছে, গেস্ট হাউসে অ্যাটাক করেছিল। রাসেলের জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু যেতে ভয় লাগছে।'

'আমাদের সঙ্গে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আপনার কোনও ভয় নেই। আপনার যাতে বিপদ না হয় সেই ব্যাপারটা আমরা দেখব। আসুন।'

জিপের পেছনে বসে নিজেকে বোঝাল সপ্তম। বিদ্যাসাগর, সুভাষ বসু, রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিত রায়, উত্তমকুমার, কেউ আর পৃথিবীতে নেই। এঁদের মত মানুষ পৃথিবীতে অনন্তকাল থাকতে পারেননি। যে মুহূর্তে মানুষ জন্মালো সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসা শুরু করল। কেউই তো দু-দুবার মরে না। তাকেও একবারই মরতে হবে। কপালে যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই মরতে হবে। জনি মালেকের লোক যদি তাকে এখনই মেরে ফেলে তাহলে ধরে নিতে হবে সেটাই ভবিতব্য ছিল।

এরকম ভাবতেই মন হালকা হয়ে গেল।

জিপটা এসে দাঁড়াল ক্যামাক স্ট্রীটে। রাস্তার একপাশে মারুতি ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঘিরে পুলিসের কর্ডন। এই সকালেও কৌতূহলী মানুষের ভিড় করে আছে চারপাশে। হয়ত এদেরই মধ্যে রশিদের লোক লুকিয়ে আছে। থাকুক।

মিস্টার চ্যাটার্জিকে দেখে দু'জন অফিশার এগিয়ে এসে স্যালুট করলেন। জিপে বসে ওদের কথা শুনতে পেল সপ্তম। নো পার্কিংয়ে পার্ক করে আছে বলে একজন টহলদার সেপাই ড্রাইভারের খোঁজে এসেছিল। এসে দ্যাখে দরজা বন্ধ। গাড়িতে কেউ নেই। তারপরেই পেছনের সীটে নজর যায়। সিটের নীচে কাউকে পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। থানা থেকে এরা এসে গাড়ির দরজা খুলে মৃতদেহ দেখতে পায়। ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির কাগজ আর পার্সের আইডেন্টিটি কার্ড থেকে জানা গিয়েছে, ওর নাম রাসেল।

'কীভাবে খুন হয়েছে?' মিস্টার চ্যাটার্জি জানতে চাইলেন।

'হাত পা বাঁধা। মুখে চওড়া টেপ লাগানো। ঠোঁটের কাছে ফুটো। তাতে নল ঢোকানো। নলের অন্যপ্রান্ত গিয়েছে একটা বোতলে। বোতলে কার্বলিক অ্যাসিড আছে বলে মনে হচ্ছে স্যার। নিষ্ঠুরভাবে মারা হয়েছে। অ্যাসিড পেটে গিয়ে সব জ্বালিয়ে দিয়েছে তবে তার আগেই গলা চোক্‌ড হয় মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'চলুন।' দুপা হেঁটে ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার চ্যাটার্জি, 'আচ্ছা সপ্তমবাবু, লোকটা আপনার বন্ধু রাসেল কিনা দেখে বলুন।' অতএব জানাতে হল। কিছুটা দূরে মানুষের ভিড়, দুপাশে বাড়ি। তার জানালা বা ব্যালকনিতে অনেক উদগ্রীব মুখ। হাঁটল সপ্তম। আচ্ছা, একটা গুলি হয়ত এখনই তার দিকে ছুটে আসতে পারে। আসুক। সে আর ভাবতে পারছে না।

একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে পাশে। স্ট্রেচারে শুয়ে আছে যে লোকটা সে লোকটা নিশ্চয়ই রাসেল। কিন্তু গাল গলা পুড়ে যাওয়ায় অদ্ভুত কালো হয়ে গেছে মুখ। চোখ বন্ধ। দম বন্ধ হওয়ায় মৃত্যু যদি হয় তাহলে তো চোখ বিস্ফোরিত হয়ে থাকার কথা।

মৃতদেহ দেখার পর মিস্টার চ্যাটার্জি মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বললেন। তারপর নিজেই গাড়িতে উঠে কী সব পরীক্ষা করতে লাগলেন। সপ্তম চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মাথায় স্মৃতিটা ছুটে এল। হ্যাঁ, এই রাস্তা। কোন বাড়িটা যেন? নাম্বার, নাম কিছুই মনে পড়ছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বাড়িগুলো দেখতে দেখতে একটা বিশেষ বাড়ির ওপর নজর স্থির করল। সে ওপরের দিকে তাকাল। সবকটা ফ্লোরের ব্যালকনিতে দর্শকদের ভিড়, শুধু একটি ফ্লোরের সব কয়টা জানলা বন্ধ। হয় ফ্লোরে লোক থাকে না অথবা তাদের কোনও উৎসুক্য নেই।

মিস্টার চ্যাটার্জি পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'রাসেল তো আপনার বন্ধু ছিল।'

'ঠিক বন্ধু নয়। অল্পদিনের আলাপ। তবে ব্যবহার খুব ভাল ছিল।

'এ পাড়ায় রাসেলের সঙ্গে কখনও এসেছেন?'

'এ পাড়ায়? হ্যাঁ, একবার, একবার এসেছিলাম।'

'কোন বাড়িতে?'

'আমার মনে নেই, রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জোর করে নিয়ে এসেছিল।'

'বাড়ির মালিকের নাম, কীরকম দেখতে বাড়িটা মনে পড়ছে?'

'বিশ্বাস করুন, একদম ভুলে গেছি।'

'দেখুন। এই গাড়িটা এখানে এসেছে কাল রাত দশটায়। ওই বাড়ির দারোয়ান বলেছে একথা। তখন নো পার্কিং থাকে না বলে সে মাথা ঘামায়নি। সারারাত গাড়িটা এখানে

পড়ে ছিল, তার মানে রাসেল এখানকার কোনও ফ্ল্যাটে রাত কাটিয়েছে। ওর মৃত্যু যে বেশিক্ষণ আগে হয়নি তা শরীর দেখে বোঝা যায়। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পেলে সঠিক সময় জানা যাবে।'

'আমার সঙ্গে ওর কথা হয়েছিল লালবাজার থেকে ফিরে গিয়ে।'

'হুঁ। অর্থাৎ তারপর সে মারা গিয়েছে। তখন কেউ জেগে ছিল না। ওঠাকে ঠিক পাড়া বলা যায় না। ফ্ল্যাটে খুন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, না গাড়ির মধ্যেই খুন করা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। গাড়িতে কোনও দড়ি বা টেপের কাটা অংশ নেই। লক্ষ্য করুন, ওর পায়ে জুতো নেই। গাড়িতেও জুতো নেই। রাসেল জুতো ছাড়া হেঁটে এসেছে, এটা কি সম্ভব? কী মনে হয় আপনার?' মিস্টার চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। রাসেল ফিটফাট থাকত। দম বন্ধ হয়ে মরে গেলে চোখ তো বড় হয়ে ওঠার কথা। চোখ বন্ধ কেন?'

'কীভাবে মারা গিয়েছে সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।' কথাটা বলে মিস্টার চ্যাটার্জি আবার মারুতি ভ্যানের সামনে চলে গেলেন। গাড়িটাকে একপাক ঘুরে দেখলেন। তারপর পেছনের দরজার গায়ে কিছু পরীক্ষা করলেন। দরজার যে অংশ খুললে পাশাপাশি সরে যায় তার গায়ে কিছু যেন দেখতে পেলেন। তারপর অফিসারকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন সপ্তমের কাছে। 'সপ্তমবাবু, রাসেলকে খুন করা হয়েছে গাড়ির ভেতরে। যেখানে ছিল সেখান থেকে ওকে হাত বেঁধে মুখে টেপ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তখন নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল লোকটা, তাই পায়ে জুতো ছিল না। গাড়িতে ওঠার জন্য ওকে দরজা খুলে টেনে ফেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আর তখনই বাইরে বেরিয়ে থাকা ওর পায়ে ধাক্কা লাগে। প্যান্টের একটু কাপড় ছিঁড়ে যায়। আপনি ওর প্যান্টের নিচের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপরটা কুঁচকে আছে। অবশ্য সবই আমার অনুমান। ওর পায়ের তলায় জুতো রয়েছে। অর্থাৎ সে হেঁটেছিল অবশ্যই। এখন ওই ফ্ল্যাটে আমাদের যেতেই হবে। আপনি ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, ঠিক কোন ফ্ল্যাটে রাসেল আপনাকে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে রাসেলের খুনিদের ধরতে পারা।

সপ্তমের নিঃশ্বাস ভারী হল। সে আবার তাকাল বাড়িগুলোর দিকে। না। কিস্যু মনে নেই।

মিস্টার চ্যাটার্জিকে কথাটা জানাতে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। চলুন।'

ক্যামাক স্ট্রিট থেকে গাড়ি চলে এল আলিপুরে। যে বাড়িতে তাকে আনা হল সেখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে। মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন, 'কাল সারারাত ঘুমাননি। সারাদিন টেনশনে ছিলেন। ভাল করে স্নান করে নিন। ব্রেকফাস্ট পাঠাতে বলছি। খেয়ে লম্বা ঘুম দিন। ঠিক মনে পড়ে যাবে তখন। এখন টায়ার্ড বলে আপনার মগজ কাজ করছে না ভাই।'

'এখানে?'

'কেউ যখন আপনাকে কোনও প্রশ্ন করবে না তখন কোথায় আছেন সে ব্যাপারে মাথা খাটিয়ে লাভ কি। আচ্ছা, দেখা হবে।' মিস্টার চ্যাটার্জি চলে গেলেন।

একটুও সময় নষ্ট করল না সপ্তম। স্নান সেরে মনে হল দাড়ি কামাতে পারলে মনটা ভাল লাগত। কিন্তু তার ব্যবস্থা এই বাথরুমে নেই। বেরিয়ে আসামাত্র দরজায় শব্দ হল।

সে ‘কাম ইন’ বলতে একটা লোক ট্রে হাতে ঢুকল। সপ্তম দেখল, টোস্ট, ডিমের পোচ, দুধে ভেজানো কর্নফ্লেক্স, চিনি, জেলি এবং টি পটে চা তার জন্যে প্রস্তুত। লোকটা টেবিলে ওসব রেখে বেরিয়ে গেলে চেয়ার টেনে বসল সে। এত খিদে পেয়েছিল তার যে নিজেই বুঝতে পারেনি। চায়ে চিনি এবং দুধ মেশানো নেই। চিনি আলাদা দিয়েছে বটে, দুধের পট দেয়নি। এরা কি লিকার চা খায়? এটা মোটেই পছন্দ নয় তার। কিন্তু ডেকে দুধ দিতে বলতে ইচ্ছে হল না। খাওয়া শেষ করে মনে হল আর একটু বেশি থাকলে মন্দ হত না।

এবং তখনই তার মনে হল মাধবিকার কথা। মাধবিকা যা-যা করতে বলেছিল তার কোনওটাই করা হয়নি। আসলে লালবাজারে যাওয়ার পর দুই উচ্চপদস্থ অফিসার তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করছে যে সাংবাদিকদের ডেকে সব কথা খুলে বলার কথা মনেই হয়নি।

মাধবিকা এখন কোথায়? সে চারপাশে তাকিয়ে টেলিফোনটাকে একটা গোল টেবিলের ওপর আবিষ্কার করল। রিসিভার তুলতে ডায়াল টোন এল না, কিন্তু লাইন মৃত নয়। তারপরেই গলা কানে এল, ‘ইয়েস!’

‘আমি কি এই ফোন থেকে একটা কল করতে পারি?’

‘নাম্বার প্লিজ!’

অর্থাৎ লোকটা অপারেটার। এটা কত বড় বাড়ি যে অপারেটার আছে। অগত্যা মাধবিকার নাম্বার বলল সে। কয়েক সেকেন্ড তারপর রিঙ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মাধবিকার গলার স্বর কানে এল, ‘হ্যালো।’

‘আমি সপ্তম।’

‘কোথায় তুমি?’

‘জানি না। তবে জায়গাটা আলিপুর। তুমি কি তোমার দাদার বাড়িতেই আছ?’

‘না। আমি আমার বাড়িতে চলে এসেছি।’

‘সেকি! তোমার নিরাপত্তা—’

‘আমি তো কারও ক্ষতি করিনি যে বিপদে পড়ব?’

‘ও, আচ্ছা।’

‘কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই সপ্তম।’

‘কেন?’

‘বিকজ, আমি আবিষ্কার করলাম, তোমাকে ভাল বেসেছি।’

‘কীভাবে দেখা করব জানি না, আই অ্যাম হেল্পলেস, তুমি কি তোমার অফিসে যাচ্ছ?’ সপ্তম নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করছিল।

‘হ্যাঁ, আমি নর্মাল লাইফ লিড করতে চাই।’

‘তোমার দাদা বোধহয় এই উপদেশ দিয়েছে?’

উত্তরটা শোনার আগেই লাইন মৃত হয়ে গেল। বেশ কয়েকবার বোতাম টিপেও কাজ হল না। অর্থাৎ লাইন কেটে দেওয়া হল। বোঝাই যাচ্ছে ওদের কথোপকথন তৃতীয় ব্যক্তি শুনেছে। হয়ত রেকর্ডে করে রেখেছে। মাধবিকাকে তার দাদার বিরুদ্ধে কোনও কথা ওরা শোনাতে চায়নি।

বিছানায় শুয়ে পড়ল সপ্তম। হঠাৎ মনে হল আজ সুভাষদা বেঁচে থাকলে তার সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করে দিতেন। সুভাষদা নেই, রাসেলও নেই। সমস্ত শরীর যখন আবার চায় তখন প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। সপ্তম আচমকাই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ঠিক ক'টা বাজে সে ঠাওর করতে পারল না। জানলার সব পর্দা ভাল করে টানা। এই ঘরে এসি ছিল যে খেয়াল করেনি, যন্ত্রটা এখন চলছে। ফলে একটা হালকা ঠাণ্ডা চমৎকার আরাম দিচ্ছে।

সপ্তম ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল। ঘন ছায়ায় ঘড়ির কাঁটা যখন বুঝল তখন সে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। দুটো বাজে। বাপস। প্রচুর ঘুমিয়েছে। এবং সে যখন মরার মত ঘুমোচ্ছিল তখন কেউ এসে এসি চালিয়েছে এবং পর্দা টেনেছে। তখনই চোখে পড়ল যে টেবিলে ব্রেকফাস্ট খেয়েছে সেখানে তার ব্যাগটা কেউ রেখে গেছে। এই ব্যাগ ছাড়াই সে ছিল এতক্ষণ। ব্যাগটাকে কোথায় শেষবার রেখেছিল তাও মনে পড়ছে না। আলো জ্বেলে সে ব্যাগ খুলল। জামাপ্যান্ট ইত্যাদি যতই ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা হোক, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কেউ ওগুলো ঘেঁটেছে। নিশ্চয়ই খুঁজছে কিছু। সে ফোনটা তুলল। ওটা এখনও মৃত।

ঘরের দরজা খুলে গেল। এবার অন্য লোক, 'আপনি কি এখন লাঞ্চ করবেন?'

'লাঞ্চ? কী আছে?'

'ভাত আর মুরগির ঝোল।'

'নিশ্চয়ই।'

লোকটা চলে যাচ্ছিল, সপ্তম ডাকল, 'এই যে ভাই। টেলিফোনটাকে ঠিক করা যায় না? ডেড হয়ে গেছে।'

'ওর যখন ঠিক হওয়ার সময় হয় আপসেই হয়। ভাববেন না।' লোকটি চলে গেল

শালা! শব্দ করেই বলল যে শব্দটা।

খাওয়া-দাওয়ার পর লোকটি আবার এল, 'আপনার গাড়ি এসে গিয়েছে।'

'গাড়ি? আমি তো গাড়ি বলিনি!'

'বড় সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে যেতে বলেছেন।'

ব্যাগ খুলে পোশাক বদলে সপ্তম বেরিয়ে এল। লোকটি তাকে নিয়ে এল একটা প্রাইভেট গাড়ির সামনে। এসে দরজা খুলে দিল।

গাড়ি সোজা তাকে নিয়ে চলে এল লালবাজারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে পৌঁছে গেল মিস্টার চ্যাটার্জির সামনে।

মিস্টার চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ঘুম হল?'

'হ্যাঁ।'

'গুড সপ্তমবাবু, আমার ধারণাই ঠিক। ওকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ভ্যানের কাছে। মনে পড়ল কিছু?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল সপ্তম, 'আচ্ছা, মাধবিকার সঙ্গে আমি ফোনে ক' বলছিলাম, লাইনটা ডেড করে দেওয়া হল কেন?'

'কোনও বোনকে তার দাদার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা কি ঠিক?'

'বেশ। আমি মাধবিকার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মনে হয় তিনিও তাই চাইছেন।'

'তাহলে?'

'আপনি এখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ওঁর অফিসে গিয়ে দেখা করতে পারেন। আমার কোনও আপত্তি নেই। শুধু তার আগে বলতে হবে কিছু মনে পড়েছে কি না?' মিস্টার চ্যাটার্জি হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেন।

'আচ্ছা আপনি একটু মাথা ঘামাচ্ছেন না কেন?'

'কী রকম?'

'ওই ফ্ল্যাট বাড়িতে নিশ্চয়ই প্রায়ই যেত। ওখানকার দারোয়ানগুলোকে জিজ্ঞাসা করুন। তারা নিশ্চয়ই রাসেলকে আগে দেখেছে। অতএব ওরাই বলে দিতে পারবে ও কোন ফ্ল্যাটে যেত।' সপ্তম বলল।

'এই সার্ভে আমরা ইতিমধ্যে করেছি। কিন্তু কেউ মুখ খোলেনি। ওদের প্রত্যেককে ধরে এনে যন্ত্রণা দিয়ে কথা বের করতে তো আমি পারি না। তাই আপনাকে বলছি, মনে করার চেষ্টা করুন। আপনি মনে করতে পারলেই খুনি ধরা পড়ে যাবে।' মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন।

'আমাকে তাহলে ওই পাড়ায় আর একবার যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আচ্ছা ওই ফ্ল্যাটে কতজন লোক ছিলেন?'

'আমি ড্রইংরুমে বসেছিলাম। শুধু দুজন মহিলাকে দেখেছি।'

'কী রকম বয়স?'

'একজন চল্লিশের ওপরে। অন্যজন অল্পবয়সী।'

'রাসেল ওখানে মদ্যপান করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি?'

'আমি মদ খাই না।'

'ও। আপনার মনে হয়েছিল রাসেল কোনও কলগার্লের ডেরায় এসেছে, তাই তো? এটা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তো সবই জানেন।'

'না জানি না। ওই পাড়ায় এরকম মাসির সংখ্যা সাতজন। তাদের কাছে প্রচুর মেয়ে বাইরে থেকে আসে। চল্লিশের ওপরে যিনি তার চেহারা মনে আছে? আছে? গুড। বলুন।'

সপ্তম বলল। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে একটা ডায়েরি খুললেন।

তারপর মাথা নাড়ল, 'সপ্তম আপনাকে ওই ফ্ল্যাটে যেতে হবে।'

'আমাকে? কেন? না-না, ওসব জায়গায় আমি যেতে পারব না।'

'আপনি না গেলে খুনি ধরা পড়বে না।'

'কীভাবে যাব? আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?'

'আমি একটা নাম্বারে ফোন করছি। কোনও মহিলা ফোন ধরলে তাকে বলবেন, কি হল? নতুন কেউ এসেছে? আপনার পরিচয় জানতে চাইবে সে। আপনি বলবেন আপনার নাম অলক গাঙ্গুলি। বছর খানেক আগে ইউ এস এ থেকে এসে আপনি এক বন্ধুর সঙ্গে

ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। আবার দেশে ফিরেছেন। ফিরেই ফোন করছেন। এটা শুনলেই মহিলা আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন।'

'তারপর,' সপ্তম কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'সেটা আমি পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। তার আগে আপনাকে পার্ক সার্কাসের গেস্ট হাউসে গিয়ে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'ইমরানের সঙ্গে?' হতভম্ব হয়ে গেল সপ্তম।

'হ্যাঁ। এখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন। একা!'

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'আমি একা ট্যাক্সিতে যাব?'

'হ্যাঁ। তবে চিন্তা করবেন না, পেছনের কোনও একটা গাড়িতে আমাদের লোক থাকবে। আপনি বিপদে পড়েছেন দেখলেই সাহায্য করবে।' মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন।

মিস্টার চ্যাটার্জির একজন সহকারী সপ্তমকে বুঝিয়ে দিল গেস্ট হাউসের ঠিকানা। পার্ক সার্কাসের একটি অভিজাত পাড়ায় তাকে যেতে হবে। তাকে দুশো টাকা দেওয়া হল ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য। এত টাকা লাগার কথা নয়। তবুও। বলা হল ইমরানের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে সে যেন ক্যামাক স্ট্রিটের ওই জায়গায় চলে আসে যেখানে আজ সকালে রাসেলের ভ্যান দাঁড় করানো ছিল।

সপ্তম সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। লালবাজারের ভেতর সে বেশ স্বস্তিতে ছিল। যেদিকে তাকাও একজন না একজন পুলিস চোখে পড়বেই। কিন্তু গেট পার হলে ট্রাম রাস্তায় গেলেই তো জনসমুদ্র। বলা হয়েছে তাকে কোনও গাড়িতে পুলিসের লোক অনুসরণ করবে। কিন্তু তেমন কাউকে তো চোখে পড়ছে না।

গেটের বাইরে এসে দ্রুত চারপাশে তাকিয়ে নিল। এখানে যে কেউ বশিদের লোক হতে পারে। জনি মালেক এবং তার তিন সহকর্মী মাফিয়া কোথায় আছে তা এখনও জানা যায়নি। একটা লোক হন হন করে ফুটপাত ধরে এগিয়ে আসছিল। মুখ দেখে মনে হয় খুন-টুন করা ওর কাছে কিছুই নয়। সপ্তম তৈরি হল। লোকটা যা-ই করুক সে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু লোকটা কিছুই করল না, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তখনই একটা খালি ট্যাক্সি নজরে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দাঁড়াতে বলে ছুটে গেল সপ্তম। ট্যাক্সিটা দাঁড়াতে দরজা খুলে উঠে বসে বলল, 'পার্ক সার্কাস।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করা মাত্র সে পেছনে তাকাল। কোনও সন্দেহজনক মানুষ বা গাড়ি চোখে পড়ছে না। অথচ গাড়ি আসছে প্রচুর। পুলিসের গাড়ি কোনটা? হঠাৎ একটা ছোটগল্পের কথা মনে পড়ে গেল। জন্তু-জানোয়ারকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেও যখন বাঘকে আনানো গেল না তখন একটি মানবশিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। নিজেকে এখন সেই টোপ বলে মনে হচ্ছে। পুলিস তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাকে একা পেয়ে যদি জনি মালেকের লোকজন চড়াও হয় তাহলে পেছনে অনুসরণ করা পুলিসরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অবশ্য তার আগে সে যদি খতম হয়ে যায় তাহলে পুলিসের কিছু করার নেই। নিজেকে আরও বেশি অসহায় লাগছিল সপ্তমের। কোনও গাড়ি যখন তার ট্যাক্সিকে ওভারটেক করছিল তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল।

ক্রমশ ফাঁকা রাস্তায় চলে এল ট্যাক্সি। বারবার পেছনে তাকাচ্ছিল সপ্তম। মিস্টার চ্যাটার্জির প্রতিশ্রুতি মত পুলিসের গাড়ি চোখে পড়ছে না। সে সোজা হয়ে বসল।

হওয়ার তা হবে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সপ্তম। তারপর গেস্ট হাউসের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় চারপাশে তাকাল। যারা ইমরানের ওপর ওয়াচ করছে তাদের তো এখানেই থাকার কথা। কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে এগিয়ে যেতেই রিসেপশনে পৌঁছে গেল। সুন্দর দেখতে একটি ছেলে বলল, ইয়েস?'

'মিস্টার ইমরান?'

'কোত্থেকে আসছেন?'

'উনি আছেন?'

'হ্যাঁ আছেন। কিন্তু সবার সঙ্গে দেখা করেন না। আপনার কার্ড আছে?'

'না। বলুন, আমার নাম সপ্তম। উনি আমাকে চেনেন।'

ছেলেটি রিসিভার তুলে নাম্বার টিপল, 'রিসেপশন' একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। নাম বললেন সপ্তম। ওকে স্যার। রিসিভার নামিয়ে ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, 'সরি স্যার। উনি ব্যস্ত আছেন।'

'আমার মনে হচ্ছে উনি আমাকে ঠিক প্লেস করতে পারেননি। খুব জরুরি দরকার। আপনি আমাকে একবার কথা বলিয়ে দিন।'

সপ্তমের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা রিসেপশনিস্ট উপেক্ষা করতে পারল না। সে আবার বোতাম টিপে অনুরোধটা জানায়। তারপর রিসিভাব এগিয়ে দিল। রিসিভার কানে চেপে সপ্তম বলল, 'মিস্টার ইমরান, আমি সপ্তম, রশিদ ভাইয়ের ওখানে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আপনার মানিব্যাগ আমি ট্যাক্সিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। মনে করতে পারছেন আমাকে?'

'আচ্ছা, তুম আ গিয়া! ঠিক আছে, ওকে দাও।'

রিসিভার ফেরত দিতেই আদেশ শুনে রিসেপশনিস্ট একটি লোককে বলল তাকে ইমরান ভাইয়ের ঘরে পৌঁছে দিতে।

দরজা বন্ধ। শব্দ করতেই গলা শোনা গেল, 'কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকল সপ্তম। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর। ইমরানের শরীরে একটি বারমুডা ছাড়া কিছু নেই। খাটের ওপর বালিসে আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। তাকে দেখে বই নামিয়ে বলল, 'আইয়ে সপ্তমজি। তাহলে আপনি আমার কাছে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু বড্ড খারাপ সময়ে এলেন। যাক গে, কী করা যাবে, বসুন।' সপ্তম বলল, 'আপনি যদি বলেন পরে আসতে।'

'না না। ঠিক আছে। একা সময় কাটে না বলে একজন বান্ধবীকে আসতে বলেছিলাম। সে এখন ওখানে স্নান করছে।' হাসল ইমরান, 'তারপর? ঠিকানা কে দিল? পুলিস?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি চটপট স্বীকার করে নিলেন।'

'মিথ্যা কথা বলার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। রশিদ ভাই আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। আমার চাকরির দরকার ছিল বলে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিয়েছিলাম, তারা আমাকে ট্যুরিস্টদের দেখাশোনা করার জন্যে পাঠিয়েছিল নর্থ বেঙ্গলে। করুন, আমি আগে জানতাম না ওরা জনি মালেকের লোক। যেই জানলাম, ওরা আমাকে খুন করার জন্য ক্ষেপে গেল। কীভাবে ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে

কলকাতায় ফিরেছি তা আমিই জানি। আমি পুলিসের কাছে আশ্রয় চাই। ওরা সেটা দেবে বলেছিল। কিন্তু কাল রাত্রে বলে দিল নিজের ব্যবস্থা নিজেই যেন করে নিই। ভোরের আগে গেস্ট হাউসে ফিরে বুঝতে পারলাম আমি কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারব না। গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসামাত্র ওরা আমাকে খুন করতে সেখানে পৌঁছে যায়। আমি বিনা দোষে ভিকটিম হয়ে গিয়েছি। পুলিস যখন জানাল আপনি এখানে আছেন তখন ভাবলাম আপনার সাহায্য নেব।' একটানা কথাগুলো বলে গেল সপ্তম।

'আমার ক্ষমতা কতটুকু বলুন। কী সাহায্য আমি করতে পারি? কারও সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। এই গেস্ট হাউসের ওপর পুলিস চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখছে বলে আমার কাছে কেউ আসে না। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।'

'আপনি বলুন কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।'

'আপনাকে বললে তো পুলিস জানতে পারবে। ঠিক আছে। আপনি কাল বিকেলে ফোন করবেন। করে জিজ্ঞাসা করবেন কাজ হয়েছে নাকি। আমি ওদের জানাতে পারলেই হ্যাঁ বলে দেব।'

'দেখুন, আমি আপনার ওপর ভরসা করে থাকব।'

'আমি কে? আল্লার ওপর ভরসা করুন। তিনিই সব।'

এইসময় একটি মহিলা বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মাথায় জল পড়েনি এক ফোঁটাও, সম্ভবত দেহখানি জলে ভিজিয়েছিলেন। বালিশের নিচ থেকে রাবারে মোড়া টাকার বান্ডিল থেকে কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল ইমরান, 'এসো সখী, তোমার সময়ের দাম নিয়ে যাও।'

মহিলা 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে টাকাটা নিতেই সপ্তমের মনে হল একে সে দেখেছে। কোথায় দেখেছে? কোথায় দেখতে পারে? সদর স্ট্রিটের হোটেলে? না। সেখানে মনে রাখার মত মহিলা ছিলেন একজনই। হোটেলের মালকিন।

তারপরেই স্পষ্ট হল। রাসেলের সঙ্গে ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে কি এই মহিলাকে দেখেছিল সে। আন্টি কি একেই ডেকে নিয়ে এসেছিল রাসেলের জন্য। হঠাৎ মহিলা খিলখিল শব্দ করে হাসল। 'তোমার বন্ধু এমনভাবে আমাকে গিলছে, ওর হজম হবে তো?'

'তোমাকে হজম করবে এমন পুরুষ আছে নাকি?'

মহিলা আবার হাসল। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে ব্যাগ থেকে প্রসাধন দ্রব্য বের করল। ইমরানের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সপ্তম বলল, 'ঠি আছে, আপনি আমাকে যে কাজের অফার দিয়েছিলেন সেটা করতে রাজি।'

'আমাদের কাজ করবে আর পুলিসকে রিপোর্ট দেবে?'

'যে আমার প্রাণ বাঁচাবে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।'

'আমাদের লাইনে একটা কথা চালু আছে, যে বেইমান সে মরে গিয়েও নিজের সঙ্গেই বেইমানি করে। কী করে জানো?'

'না।'

মহিলা মুখ ঘোরালো 'ইন্টারেস্টিং'।

'এক বেইমান মারা গেল। ওপরে উঠে সে দেখল দুটো দরজা। একটা বেহেস্তে যাওয়ার অন্যটা দোজখে ঢোকার। লোকটা একটু ভাবল। বেহেস্তে গেলে আল্লা যা

করেছেন তাই মানতে হবে। শুধু সুখ আর আনন্দ ভোগ করতে হবে। নিজের কোনও লাভ হবে না। এত লোক বেহেস্তে যায়। তাদের কথা কেউ জানতে পারে না যাওয়ার পর। সব আল্লার মহিমায় ঢাকা পড়ে যায়। দোজখে গেলে খুব কষ্ট দেবে শয়তান। কিন্তু শয়তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যদি তাকে ল্যাং মারা যায় তাহলে সে নিজেই একদিন দোজখের কর্তা হয়ে যেতে পারে। অতএব লোকটা সোজা দোজখে ঢুকে গেল। ও বুঝতেই পারল না নিজের সঙ্গে নিজেই বেইমানি করল।' গল্পটা বলে ইমরান শব্দ করে হাসতে লাগল।

ওর হাসি থামলে সপ্তম বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আপনি শুধু ওদের নিষেধ করুন আমার পেছনে লাগতে।'

'কী করে করব? তুমি ভাল করেই জান আমি পুলিসের নজরবন্দি হয়ে আছি। এখানে পয়সা দিয়ে ভাল খেতে পারছি, ইচ্ছে করলে পয়সা খরচ করে বান্ধবী আনাতে পারছি, কিন্তু এখান থেকে বাইরে যাওয়া নিষেধ। এর আগে যে অফিসার ছিল তাকে ম্যানেজ করে মাঝে মাঝে বের হতে পারতাম। এখন পারি না। আর এখান থেকে পালিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই না। তাতে একটুও আরাম নেই। কারণ জানি আমার বিরুদ্ধে পুলিস কোনও প্রমাণ কোর্টকে দিতে পারবে না। তোমাদের দেশের কোর্ট এখনও ন্যায় বিচার থাকে।' ইমরান বিছানা থেকে নেমে সোজা টয়লেটে চলে গেল। ঠোঁট কামড়াল সপ্তম। হঠাৎ মহিলা প্রশ্ন করল, 'খুব প্রবলেম?'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল সপ্তম।

'লোকটা ভাল। আমি তো দু'দিন এলাম। শুধু শুধু টাকা দিল। কী বলল জানেন? বলল, একা বসে আছি, কথা বলব বলে তোমাকে ডাকলাম। ভাল করে ধরুন, ঠিক রাজি হয়ে যাবে।' মহিলা হাসলেন।

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।' গম্ভীর গলায় বলল সপ্তম।

'বাবা, খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে!'

'আমি যার সঙ্গে কথা বলছি তার নামই জানি না।'

'লোকে আমাকে আদর করে ঝুফুসোনা বলে ডাকে।'

'নিশ্চয়ই এটা আসল নাম নয়?'

'পাগল। এই লাইনে আসল নাম বলতে হয়?'

সপ্তম হাসতে লাগল নিঃশব্দে। ঝুফুসোনা জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ হাসি?'

'আপনার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ।'

'কেন?'

'আচ্ছা, এই যে এর মাঝে দু'দিন কাটালেন ওকে কতদিন মনে রাখবেন'

'মনে হয় অনেকদিন।'

'কেন?'

'একগাদা টাকা দিল অথচ আমাকে স্পর্শ করল না।'

'যারা স্পর্শ করে তাদের ভুলে যান?'

'সবাইকে মনে রাখতে পারি না। আমি সপ্তাহে দু'দিন বের হই। বছরে [illegible] দিন। এত লোককে মনে রাখা যায়?'

'সেজন্যেই হাসলাম।'

'মানে?'

'আপনি আমাকে ভুলে গিয়েছেন?'

'তাই? আপনি আমার সঙ্গে, সত্যি? কোথায়?'

'ক্যামাক স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে।'

'মাই গড? মনি আন্টির ফ্ল্যাট।'

'হ্যাঁ।'

'এমা। কী অদ্ভুত। একদম ভুলে গিয়েছি।'

'তাই তো দেখছি।'

'আসলে আমি তো এখন মনি আন্টির ফ্ল্যাটে যাই না।'

'কেন?'

'অনর্থক মোটা কমিশন নেয়। আমরা শরীর দেব আর বুড়ি তা থেকে টাকা কাটবে। কেন? ফ্ল্যাটটার মালিক বলে? আপনি এখনও যান?'

'না। আপনার সঙ্গে সময় কাটানোর মাসখানেক পরে ওকে ফোন করে বলেছিলাম আপনাকে খবর দিতে। গিয়ে দেখি মুটকি এক মহিলাকে ডেকে এনেছে। বলল, আপনি নাকি কলকাতার বাইরে গেছেন। আর যাইনি।'

'মিথ্যে কথা। আমাকে মোটেই খবর দেয়নি। যত কলোনির বউ আর মেয়ে এখন ওর কাছে ভিড় করেছে। আমাদের স্ট্যাটাসে মেলে না।'

'কিন্তু জায়গাটা ভাল।'

'তা অবশ্য।'

'একদিন সময় দিন না?'

'ওখানে?'

'হ্যাঁ। জায়গাটা ভাল বলেই বলছি।'

ঘড়ি দেখল মহিলা। তারপর বলল, 'বেশি বেলা হয়নি। আজই যাওয়া যেতে পারে। আমাকে কিন্তু ছ'টার মধ্যেই ছেড়ে দেবেন। আমার স্বামী ঠিক সাতটায় বাড়ি ফেরেন।'

'আমি জানি। সেদিনও একই কথা বলেছেন।' সপ্তম বলল।

চোখ ঘুরিয়ে হাসল মহিলা, 'দুষ্টু।'

'কীভাবে যাব? মানে ইমরান।' কথা শেষ করল না সপ্তম।

'আপনি এক কাজ করুন। ঠিক আধঘণ্টা বাদে বর্ধন মার্কেটের সামনে চলে আসুন। বেশি দেরি করবেন না। আমি আগে বেরিয়ে যাচ্ছি।' মহিলা বলল, এইসময় ইমরান বেরিয়ে এল। মহিলা বলল, 'ডার্লিং আমি তাহলে যাই?' 'যাবে?' ইমরান বিছানায় বসল. 'যাও। পরশু আসবে?'

'সিওর?'

'তাহলে ঠিক এগারোটায়।'

'ওকে। বাই।' মহিলা বেরিয়ে গেল।

ইমরান তাকাল সপ্তমের দিকে। একটু ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে পুলিস সিকিউরিটি দেবে না?'

'না।'

'দ্যাখো ভাই। আমি তোমাকে বিশ্বাস করব যদি তুমি আমার কথা শুনে কাজ কর। করবে?'

'কী কাজ?'

'কাজের কথা পরে। আগে বল আমি যা বলব তা করবে?'

নিঃশ্বাস ফেলল সপ্তম, 'করব।'

'ওই চারজন মালয়েশিয়ান যারা নর্থ বেঙ্গল গিয়েছিল তাদের খতম করতে হবে। পারবে?'

'খতম করতে হবে?' হাঁ হয়ে গেল সপ্তম।

'কখনও কাউকে খতম করোনি?'

'না।'

'তাহলে তোমার দ্বারা হবে না।'

'না না। আপনি বলে দিন কীভাবে খতম করতে হবে?'

'কখনও রিভলভার হাতে ধরেছ?'

'না।'

'তাহলে? কীভাবে গুলি চালাবে তাই জান না।'

'আমি যদি বিষ খাইয়ে ওদের খুন করি?'

'ওরা কোথায় আছে জান?'

'জানি। পুলিস ওদের অ্যারেস্ট করেছে। জেল হাজতে আছে।'

'গুড। জেল হাজতে কীভাবে বিষ খাওয়াবে?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এর জন্যে তিনদিনের বেশি সময় আমি তোমাকে দিতে পারছি না। ঠিক চারদিনের মাথায় পুলিস ওদের কোর্টে তুলবে। ওরা খুন হয়ে গেলে কেসটাও শেষ হয়ে যাবে।'

'আপনি যা চাইছেন তাই হবে।'

'ঠিক বলছ?'

'ঠিক।'

বালিশের তলা থেকে টাকার বান্ডিল বের করে চারটে পাঁচশো টাকার নোট বের করে উঁচিয়ে ধরল ইমরান, 'তোমার বিষের দাম।'

'কিন্তু ওরা যদি তার আগে আমাকে খুন করে ফেলে?'

সপ্তমের কথায় মাথা নাড়ল, ইমরান, করবে না। এই তিনদিন করবে না।

গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এল সপ্তম। চারপাশে তাকিয়ে বুঝতেই পারল না তাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না। যে সব পুলিসের লোক এই গেস্ট হাউসের ওপর নজর রাখছে, তারা এখন কোথায়? আর শুধু পুলিসের লোক নয়, জনি মালেক বা রশিদের লোকজনও কি আশপাশে নেই?

সপ্তম দাঁড়িয়ে রইল। মিস্টার চ্যাটার্জি যে টাকা দিয়েছিলেন তার পরেও ইমরানের কাছে সে টাকা পেয়েছে। অতএব এখন সে হাঁটবে কেন? ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করাই তো উচিত। যদি ইমরানের কথা ঠিক হয়, তাহলে আগামী তিনদিন রশিদের লোক ওকে

গরম করতে চাইবে না। খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত ইমরান বোঝাচ্ছিল ওর সঙ্গে বাইরের কোনও মানুষের যোগাযোগ নেই। অতএব কাউকে কোনও অনুরোধ করতে পারবে না। অথচ বেরোবার আগে স্বচ্ছন্দে বলে দিল এই তিনদিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত। যোগাযোগ না থাকলে কী করে বলল? হঠাৎ কীরকম শীত-শীত করতে লাগল সপ্তমের। ইমরান তাকে ভাঁওতা দেয়নি তো?

এই সময় একটা রিকশাওয়ালা তার হাতরিকশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, 'চলিয়ে বাবু।'

'না লাগবে না।'

'ঠিক হ্যায়।' চলে যাওয়ার আগে চাপা গলায় বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। চলে যান।' বলে রিকশ নিয়ে হেঁটে গেল ওপাশে।

চমকে উঠল সপ্তম, এই লোকটা নিশ্চয়ই পুলিস। রিকশওয়ালার ছদ্মবেশে ঘুরছে। সে ভয় পেয়েই রিকশর দিকে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক পা যেতে না যেতে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল সে। বলল, 'সোজা।'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে তাকাল উঠে বসে। ইনি কার লোক কে জানে! তাই এলোমেলো খানিকটা ঘুরে হোটেল হিন্দুস্থানের কাছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সে। কিছু বিশ্বাস নেই। কয়েক পা হেঁটে শেষে একটু ঘুরে ক্যামাক স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল। এখান থেকে মাধবিকার অফিস বেশি দূরে নয়। কিন্তু প্রলোভন সামলাল সপ্তম।

মহিলা দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'তা হলে আপনি এলেন!'

'অনেকেই বলে কিন্তু আসে না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। অন্য লোকের ঘরে দেখলে ভাবে আমি এঁটো হয়ে আছি। কোনও কোনও মানুষ যে এসবের ধারে-কাছে নেই তা ভাবতেই পারে না তারা। তাই কথা দেওয়ার সময় কথা দিয়ে পরে বোধহয় ভাবে না যাওয়াই উচিত। বলুন।'

'কতটা রাস্তা?'

'আপনি তো গিয়েছেন। ওখানেই আলাপ হয়েছিল বলেছেন।'

'রোজ তো যাই না। মনে ঠিক নেই।'

ওরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এল অনেকটা। হঠাৎ মহিলা বলল, 'এবার আপনি পিছিয়ে যান। একসঙ্গে বাড়িতে ঢোকা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'লোকের কৌতূহল বাড়বে। আমি যে লিফটে উঠব সেটায় আপনি উঠবেন না। পরেরটায় উঠে দরজায় নক করবেন। ডান হাতের দরজা।'

'ক তলায় উঠতে হবে?'

মহিলা বলল, 'আহা রে, ঝিনুকে খাইয়ে দিতে হবে খোকাবাবুকে। লিফটের আলো দেখে বুঝে নেবেন। আমি যাচ্ছি।'

দূর থেকে মহিলাকে যে বাড়িতে ঢুকতে দেখল সেই বাড়ির সামনে পৌঁছেই চিনতে পারল সপ্তম। হ্যাঁ, এখানেই সে রাসেলের সঙ্গে এসেছিল। তা হলে রাসেল একটু দূরে গাড়ি রেখে গতরাতে এসেছিল এখানে। সে চারপাশে তাকাল। একটা ঝাঁকামুটে পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সিঁড়ি কিধার হ্যায় বাবু?'

'সামনে।'

সে ভেতরে ঢুকে লিফটের সামনে দাঁড়াল। লিফট ততক্ষণে ওপরে উঠে থেমেছে। নাম্বার দেখে নিল সপ্তম। হঠাৎ নিচু গলায় প্রশ্ন শুনল, 'কত নম্বর ফ্ল্যাট?'

সে চমকে তাকাল আবার। ঝাঁকা মুটে বলল, 'আমি আই বি-র লোক।'

'আমাকে খুঁজতে হবে। এখনই আমার সঙ্গে উঠবেন না। নিচে নেমে এলে জিজ্ঞাসা করবেন, খুঁজে পেলে বলে দেব।'

'কিন্তু—'

'আপনাদের বড় সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যা বলছি তাই করুন।'

লিফট নেমে এসেছিল। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। লোকটি কী করবে বুঝতে না পেরে লুকোন মোবাইল বের করল।

লিফট থেকে নির্দিষ্ট ফ্লোরের বদলে তার ওপরটায় নামল সপ্তম। পুলিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে সে কোন ফ্লোরে যাচ্ছে। একটা তলা নেমে এল সে। তারপর বলে দেওয়া দরজায় বেল বাজাল। দ্বিতীয়বারে দরজা খুলল একটি মোটাসোটা লোক। জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

হঠাৎ ফাঁপরে পড়ল সপ্তম। মহিলার নামটা— হ্যাঁ, ঝুনু সোনা। বলার আগেই—।

'ঠিক আছে তেওয়ারি। আসতে দাও।' মহিলাই আদেশ দিল।

'আসুন।' তেওয়ারি সরে দাঁড়াল। সপ্তম ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে দিল। সামনে একটা আড়াল, আর তার পরেই বসার ঘর। হ্যাঁ, এই ঘরেই সে সপ্তমের সঙ্গে এসে বসেছিল। ঘরের একপাশে একজন পোড়খাওয়া চেহারার প্রৌঢ়ার পাশে বসে আছে ঝুনুসোনা। তাকে দেখে মিষ্টি হাসি হেসে বলল, 'এস।'

প্রৌঢ়া বলল, 'বলুন ভাই। কী খাবে গরম না ঠাণ্ডা? নাকি একটু বিয়ার চলবে?'

'না না। কিছু খাব না।'

'আপনি আগে এখানে এসেছেন?' প্রৌঢ়ার কপালে ভাঁজ।

'হ্যাঁ। তাই তো মনে হচ্ছে। তবে সোফাটা ওরকম ছিল না।'

'কীরকম ছিল?'

'একটা লম্বা ডিভান মত—।'

'আপনি কি কারও সঙ্গে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' সপ্তম ইচ্ছে করেই সত্যি কথাটা বলল, 'রাসেল।'

'রাসেল? নাঃ এই নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'এখানে যারা আসে তাদের সবাইকে আপনি চেনেন?'

'আমি পরিচিত লোকের রেফারেন্স ছাড়া কাউকে অ্যালাউ করি না।'

ঝুনুসোনা বলল, 'যাক গে, টাইম নষ্ট করে কি হবে?'

'হ্যাঁ। দু-নম্বরে ঘরে যাও। আপনি যখন এর আগে এসেছেন তখন এখানকার রেট জানেন। এত জিনিসের দাম বেড়েছে কিন্তু আমি দাম বাড়াইনি।' প্রৌঢ়া বলল।

'এই তো মুশকিলে পড়লাম।' সপ্তম বলল।

'মুশকিল কেন?' প্রৌঢ়ার চোখে সন্দেহ।

'এর আগেরবার আমি যার সঙ্গে এসেছিলাম সেই ভেতরের ঘরে গিয়েছিল। আমি এখানে যে ডিভানটা ছিল সেখানে বসেছিলাম।'

'এখানে কোনও ডিভান ছিল না।' প্রৌঢ়া জোরের সঙ্গে বলল।

ঝনুসোনা প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল, 'বুঝতে পেরেছ আন্টি।'

'কী?'

'উনি নিশ্চয় ফ্ল্যাটে যেতেন।'

'কতদিন আগে?' প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করল।

'মাস দুয়েক আগে, তাই না?' ঝনুসোনা হাসল।

'আমার ঠিক মনে নেই।' ঝনুসোনা কিছু আড়াল করতে চাইছে বুঝে মিথ্যে বলল।

'আপনি যেখানে গিয়েছিলেন ওটা একটা নর্দমা। এই পদ্মটাকে ওই নর্দমা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। পুলিসের এক কর্তা পেছনে আছে বলে বেঁচে যাচ্ছিল। লোকটা এখন রিটায়ার করেছে। আজ খবর পেলাম কাল রাত্রে ওর কাছে একজন ক্লায়েন্ট এসেছিল, বন্দুক দেখিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। কেউ মুখ খুলছে না। আমারই বা কী দরকার! তুমি যদি বেশি টাকার লোভে ওখানে যাও ঝনুসোনা তাহলে আমি তোমাকে পুলিসের হাত থেকে মোটেই বাঁচাব না।' প্রৌঢ়া বলল।

'আমার বয়েই গিয়েছে। আপনি তো জানেন আমি সপ্তাহে একবার বাইরে আসি। আমার তো অত টাকার খাঁই নেই। কী হল ডার্লিং যাবে না?' ঝনুসোনা তাকাল।

'না বাবা, এ বাড়িতে খুন হয়েছে, আমি এর মধ্যে নেই।' সপ্তম মাথা নাড়ল।

'এ তো অদ্ভুত লোক। খুন হয়েছে ষোল নম্বরের ক্লায়েন্ট। আমার এখানে তো কিছু হয়নি। পকেটে মালকড়ি আছে তো?' প্রৌঢ়া বলল।

'কত চান? দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু খুনের বাড়িতে আমি আজ থাকব না।'

'দিলে দিনটা নষ্ট করে। তুমি কি আমাকে ভিখিরি ভেবেছে যে না খেটে টাকা নেব। যাও কেটে পড়।' ঝনুসোনা বলল।

সপ্তম আর কথা বাড়াল না। যা জানার তা জানা হয়ে গিয়েছে। এই ঝনুসোনা লুকিয়ে লুকিয়ে ষোল নম্বর ফ্ল্যাটেও যায়। সেটা এখানে বলে না। অন্তত সপ্তাহ দুয়েক আগে যে ওকে ওখানে দেখেছে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা। সিঁড়ি ভেঙে ঠিক তার নিচের তলায় নেমে এল সে। একই প্যাটার্নের বাড়ি। ষোল নম্বর লেখা রয়েছে যে দরজায় তার বেল বাজালো সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার মাঝামাঝি জায়গায় ইঞ্চি দুয়েক আলো দেখা গেল। ওইখানে দরজা কেটে ছোট্ট জানলা মত করা হয়েছে। একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

খুব সরল গলায় সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'ঝনুসোনা এসেছে?'

'আপনি কে?'

'ঝনুসোনার বন্ধু। ও আমাকে আজ এখানে আসতে বলেছিল।'

দরজা একটু খুলে গেল কিন্তু ভেতর থেকে চেন দিয়ে আটকানো। মহিলার ঘরের একফালি দেখা যাচ্ছে, 'সে আজকাল এখানে আসে না।'

'সে কী! দিন আষ্টেক আগেও তো এখানে দেখা হয়েছিল।'

'ওর সঙ্গে কীভাবে দেখা হয়েছিল?'

'বর্ধন মার্কেটে। গতকাল।'

দরজা খুলে গেল। ফ্ল্যাটে পা দিতেই সপ্তমের আর সন্দেহ রইল না। এই ফ্ল্যাটেই সে

রাসেলের সঙ্গে এসেছিল। মহিলাকেও সে চিনতে পারল। তার মানে এই ফ্ল্যাট থেকেই ওরা রাসেলকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

'ঝুনুসোনা যখন থাকতে বলেছে তখন একটু বসুন।'

সপ্তম ডিভানে বসল। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী খাবেন?'

'কিছু না।'

'কেন?'

'ও আগে আসুক।'

'যদি না আসে?'

'আমি মিনিট পনের দেখে চলে যাব।'

'বসুন।' মহিলা অন্য ঘরে চলে গেল।

একা ঘরে বসে সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ছিল। সব ঠিকঠাক আছে, শুধু রাসেল নেই। ও যে তাকে এখানে থাকার সময় ফোন করেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গেস্ট হাউসে ফোন করেছিল মাঝরাতে। সে গেস্ট হাউসে গিয়ে যখন ফোন করে তখন প্রায় শেষ রাত। অত্যন্ত ভয়ার্ত গলায় রাসেল তাকে বলেছিল শহর থেকে পালিয়ে যেতে। কী খবর পেয়েছিল সে, তা এখন জানা যাবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, রাসেলকে তার নাম্বার কে দিয়েছিল? গেস্ট হাউসের নাম্বার পুলিস ছাড়া অন্য কারও জানা সম্ভব নয়। কেয়ারটেকার তাকে বারংবার চাপ দিচ্ছিল তখনই রিংব্যাক করার জন্যে। মোবাইল কি ট্যাপ করা যায়? পি এন টি-র ফোন ট্যাপ করলে ওরা তার আর রাসেলের কথাবার্তা জানতে পেরেছিল। এই ওরা যেমন পুলিস হতে পারে, আবার জনি মালেকের লোকজন হওয়াও বিচিত্র নয়। ওরা সেই সূত্রে কি রাসেলের হদিস পেয়ে গিয়েছিল। নাঃ। ব্যাপারটা কষ্টকল্পিত। মোবাইল ফোনে কথা বললে, সেই কথা কোথা থেকে হচ্ছে, তা বোঝা যাবে না।

মহিলা ঘরে এল, 'এই মেয়েটা মোটেই প্রফেশনাল নয়। দেখুন তো আপনাকে কীভাবে বসিয়ে রেখেছে! তা আমি বলি কী, চলে না গিয়ে আর একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন না।'

'না না!'

'আরে লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনারা তো স্বামী-স্ত্রী নন। একটু আনন্দ করতে চেয়েছিলেন। একটু মুখ বদলে দেখবেন?'

'মুখ বদলে?'

'দারুণ সুন্দরী মেয়ে। খুব কম আসে এখানে। স্বামী দুদিনের জন্যে দিল্লি গিয়েছে বলে গত সন্ধ্যায় এসেছিল। একজন ক্লায়েন্টের ওকে খুব পছন্দ হওয়ায় বাড়ি ফিরতে পারেনি। আর আজ সকাল থেকে এ পাড়ায় পুলিসে পুলিসে ছয়লাপ, তাই ওকে বললাম না বের হতে। সন্ধের সময় সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে চলে যাবে। মুখ বদলাবেন?'

রাসেলের ঘটনার পর যে মেয়েটি এই ফ্ল্যাট থেকে বেরুতে পারেনি সে কি রাসেলের সঙ্গে ছিল? সে মহিলাকে প্রশ্ন করল, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

'বেশি না। মাত্র পাঁচশো।'

পকেট থেকে ইমরানের দেওয়া একটা নোট বের করে মহিলার হাতে দিতেই মহিলা খুশি হয়ে বলল, 'এই তো, মিষ্টি ছেলে আসুন, ওই ঘরে ঢুকে যান।'

পাশের দরজার ভারি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সপ্তম। একটা খাট, তলায় কার্পেট, লাগোয়া টয়লেট ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। সে খাটের ওপর বসল। মহিলা ঢুকল। 'কী কাণ্ড! গরমে ঘামছেন, এ সি-টা বন্ধ আছে যে।' যন্ত্রটা চালু করল মহিলা। তারপর একটা চোখ ছোট করে বলল, 'আসছে। সময় ভাল কাটুক।' বলে পর্দা সরিয়ে চলে গেল।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ ভাল লাগছিল সপ্তমের। সে চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ মাধবিকার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। আজ ঝোঁকের মাথায় ইমরানের কাছ থেকে টাকা নেওয়াও ঠিক হয়নি। পুলিসের হেফাজতে থাকা মালয়েশিয়ানদের সে খুন করবে কী করে? বিষ মিশিয়ে দেওয়া অত সহজ কথা?

দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হতেই সে চোখ খুলল। হাউসকোট পরা লম্বা ফর্সা টান টান সুন্দরী মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে থেমে নিচের ঠোঁট আলতো করে কামড়াল যে, সপ্তমের শরীরে ভূমিকম্প হল। কয়েক পা এগিয়ে এসে হাউসকোট খুলে ফেলে দিল অবহেলায়। মাটিতে পড়ে থাকল সেটা। এখন ঊর্ধ্বাঙ্গে এবং মধ্যাঙ্গে শুধু অন্তর্বাসের আড়াল। ধবধবে চামড়ায় লাল কাপড় আরও রহস্য তৈরি করেছে। মেয়েটি বলল, 'আমি রম্ভা।'

'রম্ভা?'

'হুঁ।' শরীর দুলিয়ে এসে খাটের আর এক প্রান্তে বাঁ হাঁটু মুড়ে বসল মেয়েটি, 'অপ্সরাদের মধ্যে সবচেয়ে সেক্সি। কিন্তু খুব ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে।'

'কী করে?'

'পাশে এসে বসেছি তবু চোখ দিয়ে গেলা হচ্ছে না, হাত দিয়ে ছোঁয়াও নয়।'

'আমাকে কত দিতে হবে?'

'আন্টি বলে দেয়নি?'

'না।'

'দু হাজার। এই শরীরের তুলনায় টাকাটা নস্যি। কিন্তু আমি তো টাকার জন্যে এখানে আসি না। একটু আনন্দ করতে চাই, অন্যরকম আনন্দ।'

'কাল রাতে যার সঙ্গে ছিলেন, সে আনন্দ দিয়েছিল?'

'প্রথম দিকে খুব ভাল ছিল। আমাকে জোর করে আটকে রাখল। তারপর মাঝরাতে একটা ফোন এল ওর মোবাইলে, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে—।'

'ও মারা গিয়েছে, জানেন?'

'শুনলাম। কিন্তু আপনি এসব কথা বলছেন কেন? কে আপনি?'

'ওর বন্ধু। শুনুন, আমি আপনার সাহায্য চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রম্ভা, 'না, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। ও, তাহলে আপনি এই ধান্দায় এসেছিলেন? কিন্তু এসে তো ঝুনুসোনার নাম করেছেন। আমি যে ওর সঙ্গে ছিলাম, তা আপনি জানতেন না!'

'জানতাম না। কিন্তু ওকে এখান থেকে বের করে দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই কোনও মহিলা ওর সঙ্গে ছিল, এটা জানতাম। আপনার আন্টির কথায় যখন বুঝতে পারলাম সেই সঙ্গিনী আপনি, তখন কথা বলতে চাইলাম। ঝুনুসোনার কাছেও আমার বন্ধু আসত। তাই ওর নাম ব্যবহার করেছিলাম এখানে ঢুকতে।' সপ্তম উঠে দাঁড়াল।

ততক্ষণ মহিলা তার হাউসকোট তুলে নিয়ে অঙ্গে জড়িয়েছে, 'আপনি আমার সময় নষ্ট করেছেন, শরীর দেখেছেন, এবার টাকাটা দিন।'

'দেব, কিন্তু প্লিজ, আমাকে সাহায্য করুন।'

'এ ব্যাপারে মুখ খুললে আমি মরে যাব।'

'বেশ। একটা কথা বলুন। যারা ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে এসেছিল। কিন্তু ভোররাতে ঢুকেছিল কী করে? সপ্তম জিজ্ঞাসা করল।

'বেল বাজিয়ে। বন্দুক দেখালে সবাই দরজা খুলে দেয়।'

'অত ভোরে বেল বাজালে দরজা খুলে দিল ওরা?'

'দিত না। একজন চেনা লোক ছিল ওদের মধ্যে।'

'কার চেনা? আন্টির?'

'হ্যাঁ। খুব বড় গুণ্ডা।'

'কী নাম তার?'

'ইকবাল। রিপন স্ট্রিটে থাকে। এবার দিন।'

পকেট থেকে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে রম্ভার হাতে দিল সপ্তম, 'গন্ধ পেলে অর্ধেক খাওয়া হয়। আমি তো শুধু গন্ধ নিলাম। তাই অর্ধেক।' বলে বেরিয়ে গেল সে।'

জিপটা পাশে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠল সপ্তম। মাধবিকার দাদা বসে আছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'উঠে আসুন।'

চট করে চারপাশে তাকাল সপ্তম। সে যে পুলিশের জিপে উঠছে তা নিশ্চয়ই খবর হয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সে জিপে উঠতেই সেটা চলতে শুরু করল। মাধবিকার দাদা বলল, 'আমাদের লোককে এড়িয়ে ওই বাড়ির যে ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন সেখানে নিশ্চয়ই অনেকবার যাওয়া হয়েছে?'

না। আমি দ্বিতীয়বাব গেলাম।'

'বাজে কথা। আপনি চরিত্রহীন, অর্থলোভী। টাকার জন্যে এইসব আন্তর্জাতিক স্মাগলারের সঙ্গে হাতে মেলাতে একটুও বিবেকে লাগেনি। আমি আপনার সম্পর্কে ঠিক অ্যাসেসমেন্ট করেছিলাম।' মাধবিকার দাদার টেলিফোন বেজে উঠল। তিনি সেটাকে অন করলেন, 'ইয়েস। সবকটাকে ধরেছ তো? গুড? মহিলা ক'জন? সোজা লিন্ডসে স্ট্রিটে নিয়ে এস। আর হ্যাঁ, কোনও রিপোর্টার যেন খবর না পায়! আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। টেলিফোন বন্ধ করলেন ভদ্রলোক।

সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ভদ্রলোক জবাব দিল না।

'আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করেছেন?'

'তাহলে কি এত আরামে নিয়ে যেতাম?'

সিকিউরিটি পার হয়ে লিন্ডসে স্ট্রিটের যে ঘরটাতে ওকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে ঢুকে সে চমকে উঠল। ঘরের একপাশে কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। তার একধারে মা বসে আছে। মাথা নিচু করে। অন্যপাশে মাধবিকা। তাকে দেখামাত্র মাধবিকা উঠে দাঁড়াল। মাধবিকার দাদা ইশারা করলে তাকে, আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ঘরের পরে ঘর। সেখানে পৌঁছে ভদ্রলোক টেবিলের পেছনে চলে গিয়ে চেয়ারে বসলেন। এদিকে একটি মাত্র চেয়ার। বেয়ারা এসেছিল, তাকে বললেন, 'ওই বয়স্কা ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। ওকে আগে পাঠাও, উনি চলে গেলে দ্বিতীয়জনকে পাঠাবে।'

দ্বিতীয়জন। সপ্তম শব্দটা শুনল। বোন বলে পরিচয় দিলেন না ইনি। মা ঘরে আসতেই মাধবিকার দাদা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন। প্লিজ।' মা বসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু উপায় ছিল না। ইনি আপনার ছেলে?'

মাথা নাড়লেন মা। হ্যাঁ।'

'ছেলেকে কতদিন পরে দেখতে পেলেন?'

'প্রায় এক সপ্তাহ।'

'আপনি কি জানেন আপনার ছেলে কলকাতায় ফিরে এসেও আপনার কাছে যায়নি। বাইরে রাত কাটাচ্ছে?'

মা অবাক হয়ে সপ্তমের দিকে তাকাল। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না সপ্তম। সে অফিসারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিল না।

'না। কেন?'

'সেটা ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'মা, এঁর কথা একদম বিশ্বাস করো না। একটা মিথ্যে অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করে আটকে রেখেছে।' সপ্তম উত্তেজিত গলায় বলল।

'আপনার ছেলে কী করে? চাকরি?'

'না। শেয়ার না কীসের এজেন্সি, মানে ওইসব বিক্রি করে কমিশন পায়।'

'কত? মাসে কত?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে বেশি নয়।'

'হঠাৎ ও অনেক টাকা বাড়িতে আনে। তাই না?'

'টাকা না। ডলার। ট্যাক্সিতে কুড়িয়ে পেয়েছিল।'

'আপনি বিশ্বাস করেন? অতগুলো ডলার কেউ ট্যাক্সিতে ফেলে যাওয়ার মত অসতর্ক হবে?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'তারপর?'

'একজন লোক এসে ডলার ফেরত নিয়ে যায়। ওকে তার বদলে টাকা দেয়।'

'কত টাকা?'

'আমাকে বলেনি।'

'সেই টাকা কোথায়?'

'তাও আমি জানি না।'

'এই কিছুদিনের মধ্যে নতুন কেউ বাড়িতে আসত?'

'ওই যে বললাম। তাছাড়া রাসেল নামের একজন ফোন করত।'

'আপনার সঙ্গে রাসেলের কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ও ছিল না। সেটা জানাতেই নিজের নাম বলে ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আপনার বাড়িতে সার্চ করে কিছু পাইনি। কিন্তু আমাকে স্পষ্ট বিশ্বাস ওর সঙ্গে ইদানীং অপরাধ জগতের লোকদের যোগাযোগ হয়েছিল।'

'ও যদি অপরাধ করে থাকে তাহলে শাস্তি দিন। তবে—'

'তবে?'

'আমি বিশ্বাস করি ও কোনও অপরাধ করতে পারে না।'

'আস্থা। এখন আপনি যেতে পারেন।'

মা চলে গেলে ভদ্রলোক সপ্তমের দিকে তাকালেন। 'বাঃ। মায়ের কাছে নিজের আসল পরিচয় বেশ চমৎকার লুকিয়ে রেখেছিলেন!'

'আমি যা তাই মা বলে গেল।'

এই সময় মাধবিকা ঢুকল। তার দাদা বললেন, 'তোর বউদির মুখে শুনলাম তুই নাকি আমার ওপর খুব ক্ষেপে গিয়েছিস। পুলিসে চাকরি করে আমরা যা দেখতে পাই তা সাধারণ মানুষ পায় না। এই লোকটি তোর সঙ্গে একদা পড়াশুনা করত। তখন ও একটি ছাত্র ছিল। তারপর কত জল গড়িয়ে গেছে। ওর বর্তমানটা তো তুই জানিস না।'

মাধবিকা তাকাল সপ্তমের দিকে।

'শোন, ক্যামাক স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাটে ওর যাতয়াত আছে। সেখানে মহিলাদের ভাড়া খাটানো হয়। যারা যায় তাদের কোনও সূত্র ধরে যেতে হবে এবং টাকার পরিমাণ কম নয়। তোর এই তথাকথিত বন্ধুটি ওখানকার খদ্দের।' ভদ্রলোক হাসলেন।

'বাজে কথা।' মাথা নাড়ল মাধবিকা, 'ওর আর্থিক অবস্থার কথা আমি জানি।'

'ভুল জানিস, আজও গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ছিল। ওরা নিশ্চয়ই ওর মুখ দেখার জন্যে দরজা খুলে ভেতরে যেতে বলত না।'

মাধবিকা তাকাল সপ্তমের দিকে, 'কিছু বল!'

'ও কি বলবে!' ভদ্রলোক ইন্টারকামে কাউকে নির্দেশ দিলেন, 'নিজেই শোন।'

'কি?'

পাশের দরজা ঠেলে একজন অফিসার যাকে নিয়ে এল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সপ্তম। মাধবিকাব দাদা বললেন, 'ইনি হচ্ছেন ওই ফ্ল্যাটের মালকিন। আপনি এই ভদ্রলোককে চেনেন?'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি এরকম বেইমানি করলেন বাবু? পেছনে পুলিস নিয়ে আমার ওখানে গেলেন? আমরা খারাপ কাজ করতে পারি কিন্তু কখনও বেইমানি করি না। ছিঃ।'

মাধবিকার দাদা বললেন, 'শুনলি?'

মাধবিকা সোজা হল, 'ইনি আপনার ওখানে যেতেন?'

মহিলা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আগেও এসেছেন বলেছিলেন। সবার মুখ নাম মনে থাকে না। একজন ভদ্রঘরের মেয়েছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন।' বলেই মহিলা মাধবিকার দাদার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল, 'সাহেব আমাকে আপনি যা শাস্তি চান দিন কিন্তু মেয়েটাকে ছেড়ে দিন। ওর সংসার বরবাদ হয়ে যাবে।'

মাধবিকার দাদা বললেন, 'একে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করুন।'

অফিসার মহিলাকে খানিকটা জোর করে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

'শুনলি?' ভদ্রলোক হাসলেন।

মাধবিকা উঠে দাঁড়াল, 'আমি কি যেতে পারি?'

'সিওর। এবার নিশ্চয়ই আমার ওপর তোর রাগ নেই।'

'এলাম।'

সপ্তমেব দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল মাধবিকা।

ভদ্রলোক বললেন, 'আসুন সপ্তমবাবু, এবার আপনি বসুন।'

সপ্তম দাঁড়িয়ে থাকল, 'এসব কেন করলেন?'

'প্রয়োজন ছিল। এবার আপনি কি চান তাই বলুন!'

'আপনি ভাল করেই জানেন আমি নিরপরাধ।'

'বেশ তো, আপনি স্বচ্ছন্দে এখান থেকে চলে যেতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'কিন্তু কোথায় যাবেন? ওরা তো আপনাকে ছেড়ে দেবে না। ভদ্রলোক হাসলেন, 'আব কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পেরে যাব রাসেলকে কারা খুন করেছে। ওই মহিলা মুখ না খুললেও যার সঙ্গে ছিল সে খুলতে বাধ্য হবে। খুনিদের জানতে পারার সোর্স যে আপনি তা ওরা জেনে যাবেই।'

'আমাকে তিনদিনের মধ্যে যতটা দূরে সম্ভব কোথাও চলে যেতে হবে।'

'মালয়েশিয়ানগুলোকে আগে মেরে ফেলুন, তারপর। কীভাবে মারবেন যেন? বিষ খাইয়ে, তাই তো? বিষের দামও তো নিয়ে এসেছেন!'

হতভম্ব হয়ে গেল সপ্তম। ইমরানের সঙ্গে তার যা কথা হয়েছিল তা এই ভদ্রলোক জানতে পারলেন কী করে? সেই মেয়েটি যে নিজেকে ঝুনুসোনা বলেছিল সে কী পুলিসের লোক? নাকি ইমরান—!

'আমি ভাবতেই পারছি না আপনার মত একজন সাধারণ মানুষ কী করে জেলে বন্দী থাকা কয়েকজনকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার অঙ্গীকার করে টাকা নিতে পারেন?'

'তখন অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমার এই তিনদিনের নিরাপত্তা দরকার।'

'শুনুন। অমাদের প্রয়োজন রশিদকে।'

'সেটা নিশ্চয়ই ইমরান জানে!'

'না। জানে না। এই যে ইমরানকে রাজার হালে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে, রোজ মেয়েমানুষকে ওর কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে, এতে রশিদের মনে সন্দেহ তৈরি কবেছে। বাজাবে চাউড় হয়ে গেছে ইমরান রাজসাক্ষী হবে।'

'তা হলে তো ওরা ওকেই খুন করবে। গেস্ট হাউসের পাহারার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।' সপ্তম বলল।

'আছে কি নেই সেটা আপনার চেয়ে আমি ভাল জানি। আমরা চাই ওরা ওকে খুন করতে আসুক। কিন্তু ওরা এত ধূর্ত যে ফাঁদে পা বাড়াচ্ছে না।' এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। মাধবিকার দাদা ফোন ধরলেন, 'ইয়েস। তাই? গুড।' কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। বলুন।' খসখস করে লিখলেন কয়েকটা লাইন। তারপর ও কে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। চোখ বন্ধ করে ভাবলেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি শেষ কবে খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'মনে পড়ছে না।'

'এই ক'দিন ধরে কাগজগুলো সুভাষবাবুর খুন, রাসেলের খুন, মালয়েশিয়ানদের

গ্রেপ্তার আর জনি মালেকের উধাও নিয়ে গরম গরম খবর ছাপছে। অবশ্যই আমাদের দায়ী করছে ওরা। এতে যেমন খারাপ লাগে আবার ভাল ফলও পাওয়া যায়। এখন আপনার সাহায্য চাই। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

'কি রকম?'

'এখান থেকে বেরিয়ে সোজা গ্লোবের গলি দিয়ে সদর স্ট্রিটে চলে যাবেন। সেখানে একটা হলুদ ট্যাক্সিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন। লোকটাকে আপনি চেনেন।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। ওর গাড়িতে আপনি ডলার কুড়িয়ে পেয়েছেন।'

'কিন্তু সে তো মারাত্মক আহত। ওরা মেরেছিল।'

'আহত তো একসময় সুস্থ হয়। ও খবর দিয়েছে রাজাবাজারে রশিদের এক সাকরেদকে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে দেখেছে। পুলিস গেলেই ওরা অ্যালার্ট হয়ে পালিয়ে যাবে। ওসব জায়গায় পালাবার হাজারটা পথ আছে। আপনি রশিদের খোঁজ নিন। যদি ওর কাছে পৌঁছে যান—।' ড্রয়ার থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপে এগিয়ে দিলেন, 'এটা পকেটে রাখুন। দেখা পাওয়া মাত্র এই বোতামটায় চাপ দেবেন। ওকে কথা বলে আটকাতে চেষ্টা করবেন। আমরা পৌঁছে যাব। যান।' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াবেন।

'কিন্তু আমি কেন এই ঝুঁকি নেব?'

'কারণ আপনার অন্য কোনও পথ খোলা নেই। আপনি যদি সুস্থভাবে বাঁচতে চান তাহলে এটা করুন। আর কিছু না হোক, মালয়েশিয়ানদের খুন করার জন্যে আপনি টাকা নিয়েছেন তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। নিজের গলা শুনতে চান?'

বড় নিঃশ্বাস ফেলল সপ্তম। তারপর বলল, 'না। দরকার নেই।'

ট্যাক্সিওয়ালাটাকে দেখেই চিনতে পারল সে। কাছে যেতেই লোকটা বলল, 'যাবে না। গাড়ি খারাপ।' লোকটার মুখের দাগ এখনও শুকিয়ে যায়নি।

'আমাকে বলা হয়েছে আপনি রাজাবাজার নিয়ে যাবেন।'

অলস ভঙ্গিতে বসেছিল লোকটা, শোনামাত্র সোজা হল, 'ও। বসুন।'

সপ্তম সামনে বসতে যাচ্ছিল, লোকটা বলল, 'না। পেছনে বসুন।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে লোকটা বলল, 'আপনাকে আমি এর আগে কোথায় যেন দেখেছি।'

'একদিন রাত্রে, তখন মনে থাকার কথা নয়। পরে রশিদের ডেরায়। যেদিন ওরা আপনাকে খুব পিটিয়েছিল।'

গাড়ি থামিয়ে লোকটা এবার সপ্তমকে দেখল, 'আচ্ছা। আপনার জন্যে আমার এই হাল।'

'সে কথা আমিও বলতে পারি। সেদিন আপনার ট্যাক্সিতে না উঠলে আজ আমাকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত না।'

'আপনার সঙ্গে ওদের ঝামেলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'রশিদের সঙ্গীকে আপনি রাজাবাজারে কবে দেখেছেন? কী করে বুঝলেন লোকটা রশিদের সঙ্গী?'

'যেদিন ওরা ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরেছিল সেদিনও ওখানে লোকটাকে দেখি। আর আজ সকালে দেখলাম বাজার নিয়ে গলিতে ঢুকল।' ট্যাক্সিওয়ালা বলল।

রাজাবাজারে এসে গেল ট্যাক্সি। একটা গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটা বলল, 'ওই গলি। ওর ভেতরে গিয়েছিল।'

সপ্তম দেখল গলির পাশে একটা দোকানে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে। অত বড় শরীর পাঁঠার হতে পারে না। ফুটপাতও নোংরা, বস্তির মানুষ দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে। এ রকম পরিবেশে রশিদ থাকবে তা চিন্তাও করা যায় না। ট্যাক্সি থেকে নামল সপ্তম। ড্রাইভার বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'না। না। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করুন। যাবেন না।'

সে ফুটপাত পেরিয়ে গো-মাংসের দোকানের সামনে পৌঁছল, 'আচ্ছা ভাই, রশিদভাই কোথায় থাকে?'

খালি গায়ে লুঙ্গিপরা একটা নিরীহ লোক উদাস চোখে তাকাল, 'কোন রশিদ? এখানে সাতজন রশিদ আছে। আপনার কাকে চাই?'

'রোগা চেহারা, আস্তে কথা বলে, খুব অল্পদিন হল এখানে এসেছে।' সপ্তম বলল। লোকটা পিটপিট করে তাকাল, 'এখানকার সাতজন রশিদের সঙ্গে এরকম কারও মিল নেই। আপনি নাম ভুল করছেন। তাছাড়া কারও খোঁজ নিতে হলে পুরো ঠিকানা আনা দরকার। আপনার রশিদ কী করে?'

সপ্তম হাসল, 'কী করে সেটাই তো জানি না।'

'এক কাজ করুন। সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ুন। একটা সিগারেটের দোকান পাবেন। সেখানে জিজ্ঞাসা করুন। যান।' তারপর নিজের মনেই বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার। কী করে না জেনে খোঁজ করছে।'

গলিতে পা দেওয়ার সময় পকেটে হাত ঢোকাল সপ্তম। মোবাইল ফোনের বোতামটায় আঙুল রাখল। মাধবিকার দাদা বলেছে বিপদ বুঝলেই ওটায় চাপ দিতে। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা খুব বোকা বোকা হচ্ছে। রশিদ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নেরই জবাব সে দিতে পারবে না। ফলে এখানকার মানুষ তো অবাক হবেই। অথচ তার ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। নেই কেন? বাইরে বেরিয়ে সে মাধবিকার দাদার ফোনে বলতে পারে রশিদকে এই বস্তিতে পাওয়া গেল না। বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন ভদ্রলোক। তারপর সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দূরপাল্লার কোনও ট্রেনে উঠে বসলেই হল। এমন জায়গায় সে চলে যাবে যেখানে কেউ তার নাগাল পাবে না। না পুলিস না রশিদ। আর কিছু না পারুক, কুলিগিরি করে পেট ভরাতে তো পারবে।

হঠাৎ সিগারেটের দোকান চোখে পড়ল। গলিটা এখানে বেশ সরু। দু'পাশের ঝুপড়ির মধ্যে মানুষের সংসার দেখা যাচ্ছে। কিছু বেকার ছেলে সিগারেটের দোকানদারের সঙ্গে আড্ডা মারছে। সে কিছু বলার আগেই হিন্দিতে প্রশ্ন ছুটে এল, 'কি চাই দাদা?'

'একজনকে আমার খুব দরকার। শুনেছি, এখানেই কিছুদিন হল তিনি এসেছেন। তাঁর নাম রশিদভাই। এর বেশি কিছু আমি জানি না।' সপ্তম বলল।

'রশিদভাই। কৌন রশিদ?' একটি ছেলে রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'আমি শুনেছি এখানে আরও রশিদ থাকে। কিন্তু আমি যার খোঁজ করছি তিনি এখানে সাতদিনের মধ্যে এসেছেন।'

সিগারেটের দোকনদার বলল, 'ঠিক হ্যায়, আপনি এখানে দাঁড়ান। আমাদের এখানে বাইরের লোক একা ঘুরুক, সেটা আমরা পছন্দ করি না।' লোকটা ছেলেগুলোকে নিচু গলায় কিছু বলতেই তাদের দুজন গলির ভেতরে চলে গেল। অন্যরা তার দিকে এমন চোখে তাকিয়ে থাকল যে নিজেকে ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছিল সপ্তমের।

খানিকটা পরেই ছেলে দুটো ফিরে এল একজনকে নিয়ে। সপ্তমের ঝাপসা মনে পড়ল একে সে রশিদের ডেরায় দেখে থাকতে পারে। লোকটা সামনে এসে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'রশিদভাইকে এখানে পাওয়া যাবে কী করে ভাবলেন? আপনি কে? পুলিস?'

'না। আমার নাম সপ্তম। আপনি ওঁকে আমার নাম বললেই উনি চিনতে পারবেন।' সপ্তম বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলি বলল।

এ রকম সাপের মত গলি কলকাতায় আছে জানা ছিল না। কলেজে পড়ার সময় ওরা একদিন শখ করে সার্পেন্টাইন লেন দেখতে গিয়েছিল। দেখে হতাশ হয়েছিল। সেটা বেশ বড়সড় গলি। আর এখন দু'পাশের বস্তির ঘরগুলো যেন শরীরে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাঝে মাঝেই ছোট্ট ঘরগুলোর সংসার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষ এই শহরে কী ভয়ঙ্করভাবে বাস করে, তা বাইরের রাস্তায় দাঁড়ালে বোঝা যাবে না।

দুটো লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। ওরা দাঁড়ানোতেই গলির মুখ বন্ধ। পথ দেখিয়ে যে নিয়ে যাচ্ছিল, সে নিচু গলায় কিছু বলতে একজন এগিয়ে এসে সপ্তমের পকেট, কোমর, প্যান্টের নিচের দিকে তন্নতন্ন করে হাতড়াল। তারপর ইশারা করল এগিয়ে যেতে, মোবাইল হাতিয়ে নিয়ে।

মানুষের মুখ যদি মনের প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে যে সব মানুষকে অতিক্রম করে সপ্তমকে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল, তাদের মানুষ না বলে হিংস্র প্রাণী বলাই সঙ্গত। কিন্তু এতকাল কলকাতা থেকেও সে জানত না, এই শহরের ভেতরেই এমন অঞ্চল আছে যার সঙ্গে পশ্চিমবাংলা অথবা বাঙালির স্বদেশ ভাবনার কোনও মিল নেই।

হঠাৎ গলিটা একটু বড় হতেই ঘরটাকে দেখতে পেল। ওপরে টালি থাকলেও দরজা বা জানলা একটু আলাদা। পথপ্রদর্শক তাকে দরজায় নিয়ে আসতেই সে বেশ বড় একটা ঘর দেখতে পেল। ঘরে ফরাস পাতা। কয়েকজন লোক সেখানে বসে গল্প করছে। এই সময় ওপাশের একটা দরজা দিয়ে রশিদ বেরিয়ে এল। হাতের মোবাইল কানে চাপা। মাথা নেড়ে কথা বলতে বলতে ইশারায় সে সপ্তমকে বসতে বলে মন দিয়ে কথা শুনতে লাগল। অবাক হল সপ্তম। রশিদ যেভাবে বসতে বলল তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ওদের প্রায়ই দেখা হয় এবং তার এই এখানে আসাটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

ইতস্তত করে ঘরের একপাশে বসল সপ্তম। রশিদ তখনও কথা বলছে। সপ্তম লক্ষ্য করল ঘরটি বেশ পরিস্কার। দেওয়ালে সাতটি সদ্যোজাত শিশুর পাশাপাশি শুয়ে থাকার ছবি বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো। এই ভয়ঙ্কর বস্তিতে এরকম একটা ঘরের কথা কল্পনা করা যায় না। সে রশিদের দিকে তাকাল। পরনে পাঞ্জাবি আর চোস্ত, পরিস্কার

করে গাল কামানো। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন বিন্দুমাত্র নেই। হাসিটি সরল। এই লোকটিকে এই মুহূর্তে কলকাতা পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে অথচ পাচ্ছে না, ভাবা যায়?

কথা শেষ করে মোবাইল বন্ধ করে রশিদ তাকাল, 'বলুন সপ্তমবাবু, কী খাবেন? ঠাণ্ডা না গরম? একটু কফি বানাতে বলি?'

গলা শুকিয়ে গেল সপ্তমের, 'কফি— ।'

'হ্যাঁ। এখানে সব বাড়ির ভেতরেই তৈরি হয়। দোকানের খাবার আমি খাই না। এ কাদের ভাই, দো কফি, জোলদি।' মুখ তুলে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল রশিদ। তারপর বলল, 'আপনাকে পুলিস খুব ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে আমি জানি। ওই যে কথাটা, মেয়েমানুষ থাকলেই ঝামেলা তার ছায়া হয়ে আসে, খুব সত্যি কথা।

'মেয়েমানুষ— ।'

'আরে, আপনি এত পড়ালিখা মানুষ, আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনার ওই ট্রাভেল কোম্পানির বান্ধবীই তো বিপদে ফেলল। ওর সঙ্গে আপনার রিলেশন তৈরি হয়েছে বলেই তো আপনি ওর দাদার কাছে গেলেন। না হলে যেতেন? আর ওই শালা হারামি বোনকে ফুটিয়ে দিয়ে আপনাকে মুরগি বানাল। বলল, রশিদকে ধরে দিতে। আরে, তার তো এত লোকজন, তারা যে কাজটা করতে পারছে না, সেই কাজটা আপনাকে কেন করতে হবে! তাজ্জব বাত।' রশিদ হাসল, 'আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। ওই ট্রাভেল কোম্পানির মহিলা যে পুলিস অফিসারের বোন, এ কথা আমরা আগে জানতাম না। যখন জানলাম তখন আপনি ওর সঙ্গে বাইরে। সুতরাং মনে হয়ে গেল, আপনি পুলিসের লোক। ওয়াচ রাখতে গিয়েছেন। এ কেস অফ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং।'

কফি এল। রশিদ বলল, 'নিন, কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমার ভাল লাগে না।'

বাধ্য হয়ে কফির কাপে চুমুক দিল সপ্তম।

রশিদ বলল, 'দেখুন সপ্তমবাবু, আপনি কোনও অন্যায় করেননি। তবু পুলিস বলেছে, আপনি যদি আমাকে খুঁজে বের করে দেন, তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেবে। তাই তো?'

অবাক হয়ে তাকাল সপ্তম।

রশিদ হাসল, 'আরে ভাই, এখানে কোনও কথা চাপা থাকে না। কিন্তু আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করলেন না কেন আপনার অপরাধটা কী? হ্যাঁ, পুলিস যে কোনও মানুষকে একটা না একটা কেসে ফাঁসাতেই পারে। আপনার অপরাধ আছে। কী বলুন তো? আপনি ওই ট্রাভেল কোম্পানির মেয়েটার সঙ্গে— ! বুঝতেই পারছেন। ওর দাদা সেটা মানতে পারছে না। এটাই আপনার অপরাধ। একেবারে জলের মত পরিস্কার।'

'না।' সজোরে মাথা নাড়ল সপ্তম, 'মাধবিকা ওর দাদার কথায় চলে না।'

'ওই জন্যে বলে বারো ঘণ্টা উপোস না করে ব্লাড পরীক্ষা করালে ক্লোরেস্টরাল আর কী সব ঠিক ধরা পড়ে না। আপনার মনে এখনও ওই মেয়েমানুষের ছোঁয়া আছে। আপনি সাদা চোখে দেখবেন কী করে? আরে সপ্তমবাবু, যেই সে তার দাদার কাছে শুনল আপনি কলগার্লের বাড়িতে গিয়েছিলেন, অমনি সে হাওয়া হয়ে গেল? হাঃ হাঁ।'

তাজ্জব হয়ে গেল সপ্তম। লোকটা যেন সিনেমা দেখে এসে গল্প বলছে। এত বিস্তারিত কথা যা কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে তা এই লোকটা জানল কী করে?

'আপনি কেন এখানে এসেছেন?'

'ওরা আমাকে পাঠিয়েছে তাই।'

'আপনি ফিরে গিয়ে বলবেন, রশিদভাই অমুক গলির মধ্যে ওই ঘরে আছেন আর পুলিস এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে? পুলিস এখানে ঢুকতে পারবে? আব ঢুকলেও তখন আমি ওদের জন্যে বসে থাকব? পাগল নাকি!' রশিদ তাকাল, 'তাছাড়া ওই সব কথা ওদের যাতে বলতে পারেন, তাই আপনাকে আমি ছেড়ে দেব?'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন? আমি কি অপরাধ করেছি যে আমাকে এইভাবে পুতুলের মত নাচাবে সবাই?' চিৎকার করে উঠল সপ্তম।

'শাবাশ। এতক্ষণে ঠিক প্রশ্ন করলেন। অন্যায় আপনি আর একটা করেছেন। ইমরানের কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা আপনার ভুল হয়েছে। মিথ্যে কথা বলে আপনি টাকা নিয়েছেন। জেলহাজতে যে মালয়েশিয়ানরা বন্দি হয়ে আছে, আপনি তাদের বিষ খাইয়ে মারবেন? সম্ভব? কেউ বিশ্বাস করবে?'

'উনি রাজি হচ্ছিলেন না বলে মাথায় যা এসেছিল তাই বলেছি।' বলেই খেয়াল হল, 'এই যে ইমরানভাই, আপনাদের লোক, কিন্তু পুলিসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তা জানেন?'

'কে কার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, তা কেউ বলতে পারে না সপ্তমবাবু। তবে ও আপনাকে যে টাকা দিয়েছে, তা আমার দেওয়া।' পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক বের করে রশিদ বলল, 'আপনার কাছে তো ওর দেওয়া টাকা এখনও আছে। পাঁচশো টাকাব নোটের নাম্বার দেখুন তো, এক্স ওয়াই টি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ওয়ান সিরিজের কিনা? লাস্ট নাম্বারটা জিরো থেকে নাইনের মধ্যে হবেই।'

অবাক হয়ে পকেট থেকে নোট বের করে তাজ্জব হয়ে গেল সপ্তম। হুবহু এক। শেষ নম্বর হল আট। সে মাথা নাড়ল।

'যাক। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার অন্য কাজ আছে। ইমরান আপনাকে তিনদিন ছেড়ে দিয়েছিল। আমি আপনাকে সারাজীবন ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু এমনি এমনি ছেড়ে দিলে আমার দলের লোকজন একটুও খুশি হবে না। তাই একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে।'

রশিদের মুখ এখন রহস্যময়। সপ্তম জিজ্ঞাসা করল, 'কী কাজ?'

'এখনই একটা লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।' রশিদ কাপ রাখল, 'আপনি বলতে পারেন এই কাজটা খুব কঠিন কিনা? আমি বলব, না। আমাব লোকজনকে একটু ইশারা করলেই লোকটা নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে চলে যাবে। কিন্তু তাতে তো আপনাকে পরিস্কার করা যাবে না। আপনি যদি কাজটা করে দেন, তাহলে দলের লোকজন বলবে, বাহ্, সপ্তমবাবু আমাদের লোক। ওর কোনও ক্ষতি করা ঠিক হবে না। ব্যস্।' রশিদ উঠে দাঁড়াল।

'কোনও মানুষকে খুন করতে আপনাদের একটু হাত কাঁপে না, না?'

'মানুষ?' রশিদ গম্ভীর হল, 'মানুষ বলতে আপনি কী বোঝেন?'

উত্তর দিতে চাইল না সপ্তম।

'একটা লোক ডাবল এজেন্ট জেনেও আমরা ওর সঙ্গে কাজ করতাম। ও আমাদেরও খবর দেয় আবার আমাদের শত্রুকেও খবর সাপ্লাই করে। এ সব খবরের ওজন বেশি নয় বলে মনে হয়েছিল লোকটার লোভ বেশি নয়, কারণ তার ক্ষমতাই নেই। কিন্তু সেই লোক যদি সত্যি লোভী হয়ে ওঠে, তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে

চায়, তাহলে তাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। পুলিস আমাদের ওপর সুভাষবাবুর হত্যায় দায় চাপিয়ে দিয়েছে। কোনও কিছুর প্রমাণ না পেলে নিজের মুখ ঢাকতে পুলিস এই কাজটা করে থাকে। কিন্তু সুভাষবাবুকে খুন করল কে ? আমরা এর তদন্ত করেছি। সুভাষবাবু যখন খুন হন, তখন এই লোকটা ঘটনাস্থলের খুব কাছে ছিল। সুভাষবাবুর লোক বলে ওকে যারা জানত, তারা সন্দেহ করেনি। সুভাষবাবু ওর ওপর রেগে গিয়েছিলেন। যে কোনও মুহূর্তে ওকে ফাঁসিয়ে দিতেন। তা থেকে বাঁচবার জন্যেই ও কাজটা করেছে। কাল সুভাষবাবুর সঙ্গে যে বেইমানি করেছে, আজ আমার সঙ্গে সেটা করতে তার অসুবিধে কোথায়?' একটানা বলে গেল রশিদ।

'লোকটা কে?'

'আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। সুভাষবাবুর ওখানে, এয়ারপোর্টে।'

'অফিসার?'

'হ্যাঁ। ওকে সরিয়ে দিন, আপনাকে আমরা বিরক্ত করব না।'

'আমার পক্ষে কাউকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়।'

'তাহলে এখানে আর সময় নষ্ট করবেন না। আপনাকে আমার লোক নিয়ে এসেছে। তাই এই বস্তি থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত কেউ আপনার ক্ষতি করবে না। বস্তির বাইরে যাওয়ার পর আপনাকে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।' রশিদ চলে যাচ্ছিল।

'রশিদভাই।' সপ্তম ডাকল, 'আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন, কিন্তু আমি তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি।'

'রাস্তা আপনার সামনে দুটো, কোন রাস্তায় হাঁটবেন সেটা বেছে নিন সপ্তমবাবু।'

'কিন্তু আমি কী করে খুন করব?'

ঘুরে দাঁড়াল রশিদ, 'গুড। আমার একজন লোক আপনার সঙ্গে যাবে। ঠিক সময় সে আপনার হাতে রিভলভার তুলে দেবে। আপনি শুধু ট্রিগার টিপবেন।'

'ঠিক আছে।'

'কিন্তু কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না।' রশিদ জানিয়ে দিল।

মাথা ঝাঁকাল সপ্তম, হতাশায়।

সারাটা সন্ধে ওকে ওই ঘরে অপেক্ষা করতে হল। ইতিমধ্যে ভালমন্দ খাবার এসেছে। ইতিমধ্যে ওকে বালিশ দেওয়া হয়েছিল বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। রাত দশটা নাগাদ একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল, 'চলুন, টাইম হয়ে গিয়েছে।'

'কোথায় যাব?'

লোকটা জবাব দিল না, শুধু কাঁধ নাচাল।

অত রাত্রে গলি শুনসান। এবার ওকে নিয়ে লোকটা উল্টোদিক দিয়ে বের হল। একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড় করানো বাইকে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে লোকটা বলল, 'আমার নাম ইন্দ্রনাথ। নামটা না বললেও চলবে। উঠুন।'

খুব অবাক হয়ে গেল সপ্তম। রশিদের সঙ্গীর নাম ইন্দ্রনাথ? সে বাইকে উঠল। সেই তখন কথা বলার পর রশিদ আর একবারও তার সামনে আসেনি। ওই বাড়িতেই সে আছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। বাইক ছুটছিল রাতের কলকাতার রাস্তায়। এই সময় কলকাতা বেশ সুন্দর।

বৌবাজার স্ট্রিটের ট্রামরাস্তা ধরে অনেকবার গিয়েছে সপ্তম, কিন্তু যে বাড়িটার সামনে বাইক থামল, সেটার দিকে তাকালে তার এতদিন একটা মেসবাড়ি বলেই মনে হয়েছে। ইন্দ্র বলল, 'এটা একটা বাঈজি বাড়ি। আপনি কখনও বাঈজি বাড়িতে গিয়েছেন?'

'না।'

'আমরা এখানে গান শুনতে যাচ্ছি।'

ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকল। বাঁদিকে অন্ধকার অন্ধকার ভাঙাচোরা দরজা। সিঁড়িতে প্ল্যাস্টার নেই। দোতলা উঠতেই একটা লোক কপালে হাত ছোঁয়ালো, 'মাপ কিজিয়ে সাব, আজ হাউসফুল হ্যায়।'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'আমাদের বুকিং আছে। সাহাবুদ্দিন কোথায়?'

'ও আইয়ে আইয়ে।' লোকটা হঠাৎ বদলে গেল। যে ঘরে ওদের নিয়ে যাওয়া হল সেখানে তুমুল গান চলছে। ঘরের মেঝেতে বসেছে হারমোনিয়ামওয়ালা, তবলচি এবং বাঁশিওয়ালা। ওপাশে একটি উঁচু জায়গায় পা ছড়িয়ে বসে বাঈজি গান গাইছে, উমরাওজানের গান। এপাশে খাটের ওপর আধশোয়া অবস্থায় গান শুনছে দুজন। তাদের হাতে মদের গ্লাস। লোক দুটোর ভাল নেশা হয়েছে। তাদের একজনকে দেখেই চিনতে পারল সপ্তম। অফিসার। ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটা তাদের একবার দেখল, দেখে বিরক্ত হল। গান শেষ হওয়ামাত্র জড়ানো গলায় বলল, 'অ্যাই, এই ঘরে বাইরের লোক কেন? তুমি জানো না আমি কে? হু অ্যাম আই?

যে লোকটা ওদের এই ঘরে এনেছিল, তার ইশারা বুঝে গিয়ে বাঈজি বলল, 'আপনি হলেন ভ্রমর, ফুলের বুকে বসে মধু খাচ্ছেন। কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্য যদি দর্শক না দেখে তাহলে এর সার্থকতা কোথায়?' চটুল হাসি ছড়ানো তার মুখে।

ততক্ষণে ইন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে ঘরের কোণে বসে পড়েছে সপ্তম। অফিসার মাথা নেড়ে বলল, 'নো। আমার টাকায় অন্যরা আনন্দ করবে আমি অ্যালাউ করব না।'

এবার তার সঙ্গী বলল, 'না না, আমার টাকা। আমি আজ টাকা দিচ্ছি। আমি অ্যালাউ করব। অ্যাই তোমরা গান শোন, কিন্তু তার বদলে একটা গান গাইতে হবে।'

ইন্দ্র বলল, 'আপনি যা হুকুম করবেন, তাই হবে। আমরা গান ভালবাসি কিন্তু টাকা নেই।'

'টাকা নেই তো কী হয়েছে? আমি কি মরে গিয়েছি? সুভাষের সব কটা কেস এখন আমার হাতে। ডু ইউ নো সুভায?' লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করল।

'এই যে আপনার নেশা হয়ে গিয়েছে। প্রাইভেট কথা বলে দিচ্ছেন পাবলিককে।'

'ও, তাই নাকি! নো, নো মোর। গান হোক।' লোকটি আবার আধশোয়া হল।

বাঈজি গান ধরল, 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চিৎকার করল, 'কেয়া বাত, কেয়া বাত।'

ইন্দ্র ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার দিকে কয়েকবার তাকিয়েছে। মাথাটা আমার আড়ালে রাখুন।'

'ঠিক আছে।'

গান যত গাওয়া হতে লাগল ওদের নেশা তত বাড়তে লাগল। একটা সময় দেখা গেল অফিসার খাট থেকে নামার চেষ্টা করছে। বাঈজি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

'জলবিয়োগ করব। কোথায় যেন, ও, ওদিকে।'

'সঙ্গে কেউ যাবে?'

'নো। আমার দুটো পা আছে।' টলতে টলতে বেরিয়ে গেল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বলল, 'রিভলভার নিন। সাইলেন্সার লাগানো আছে। সোজা টয়লেট চলে গিয়ে ওর মাথায় ঝাড়বেন। তারপরেই নিচে নেমে আসবেন। আমি বাইকে স্টার্ট দিচ্ছি।' রিভলভার গছিয়ে দিল ইন্দ্র। তারপর উঠে দাঁড়াল, 'তাড়াতাড়ি—!'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ইন্দ্র সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হাতে রিভলভার কিন্তু প্যাসেজে কেউ নেই। ভেতরে গান চলছে। টয়লেট কোন দিকে? একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে সপ্তম জিজ্ঞাসা করতেই সে দরজা দেখিয়ে দিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই হতভম্ব হয়ে গেল সপ্তম। মেঝের ওপর পড়ে আছে অফিসার। তার পাঞ্জাবিতে লম্বা ছুরি মুছছে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একটি লোক। শব্দ শুনে সে পেছন ফিরে তাকাতেই সপ্তমকে দেখতে পেল। দেখে একটুও নার্ভাস না হয়ে হাসল দাঁত বের করে।

সপ্তম বুঝতে পারছিল না কী করবে! অফিসার মরে গেছে সে বুঝতে পারছিল। তার কি উচিত এই লোকটাকে গুলি করা? কিন্তু সেরকম কথা ছিল না। ততক্ষণে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সপ্তমের পাশে এসে বলল, 'ভাগ যাইয়ে। আউর ই ভি লে যাইয়ে।' ছুরিটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে পেল সপ্তম। খোলা দরজা, প্যাসেজ, সিঁড়ি ভেঙে সে ততক্ষণে রাস্তায়। তার এক হাতে ছুরি, অন্য হাতে রিভলভার।

ইন্দ্র বসেছিল বাইক চালু করে। কোনওমতে তার পেছনে উঠে বসতেই সে বাইক চালু করল, 'এ কি! আপনি খোলা রিভলভার নিয়ে বেরিয়ে এলেন? সবাই দেখল তো। ছুরি কোথায় পেলেন?'

কথা বলতে পারছিল না সপ্তম। তার পেটে খুব ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ইন্দ্র আর প্রশ্ন না করে সোজা চলে এল গঙ্গার ধারে। বাইক থামিয়ে বলল, 'ছুরিটা জলে ফেলে দিন। যত দূরে পারেন তত মঙ্গল।'

সপ্তম ছুঁড়তে যাচ্ছিল, ইন্দ্র বলল, 'দাঁড়ান। হাতলটা রুমালে ভাল করে মুছে ফেলুন। হ্যাঁ। এবার রুমালে ধরেই ছুঁড়ুন।' ইস্পাতের বস্তুটি জলে গিয়ে পড়ল।

'এবার রিভলভার দিন।' হাত বাড়াল সে।

সপ্তম রিভলভার দিল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা মরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কটা গুলি ছুঁড়েছেন?'

'গুলি করতে হয়নি। আমার আগেই একটা লোক ওকে ছুরি মেরেছে।'

'সেকি? কে লোক? কীরকম দেখতে?'

'মুখে বসন্তের দাগ, বেঁটে মতন।'

'যাক। আপনি বেঁচে গেলেন। মনে হচ্ছে নতুন পার্টি লোক দিয়ে খুন করিয়েছে ওকে। যে লোকটা আমাদের থাকতে বলেছিল, সে-ই নতুন পার্টি। আর ওর একটুও নেশা হয়নি, নেশার ভান করছিল। আপনাকে কোথায় নামালে হবে?'

'জানি না।'

হঠাৎ পকেট থেকে মোবাইল বের করে নিচু গলায় কথা বলে ওটা এগিয়ে দিল ইন্দ্র, 'নিন, কথা বলুন।' মোবাইল নিল সপ্তম।

রশিদের গলা, 'আপনার কপাল ভাল। এবার আপনি যেতে পারেন। তবে দয়া করে আর কখনও বৌবাজারে যাবেন না।'

ইন্দ্র যেখানে সপ্তমকে নামিয়ে দিল, সেখান থেকে তার বাড়ি বেশিদূরে নয়। মধ্যরাতের রাস্তায় একা একা হাঁটতে হাঁটতে সপ্তমের মনে হচ্ছিল, তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে সে। এখন আর তার হারাবার ভয়ডর নেই। মেঘে মাটিতে একাকার হয়ে গেলে যেমন হয়।

প্রায় মধ্যরাত পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকল সপ্তম। প্রতিটি বাড়িতে মানুষেরা এখন যে-যার বিছানায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। ভাবনাটা মাথায় এল এই প্রথম। কলকাতায়, সেই গড়িয়া থেকে বেলঘরিয়া পর্যন্ত কতগুলো বিছানা আছে? অবশ্য এক বিছানায় একাধিক মানুষ শুয়ে থাকে, কিন্তু বালিশ? বালিশ তো প্রত্যেকের মাথার নিচে আলাদা করে থাকে। কতগুলো বালিশ আছে এই কলকাতায়? কেউ এর হিসেব নেয়নি। সেই সব বালিশ যদি একত্রিত করা যেত তাহলে নিশ্চয়ই গড়ের মাঠ ভরে যেত।

ব্যাপারটা ভাবতে এত মজা লাগছিল যে, অন্য সব ভাবনা সপ্তমের মাথা থেকে উড়ে গিয়েছিল। সে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে বাড়িগুলো দেখছিল। ওপাশের তিনতলা বাড়ির ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কি জেগে আছে ওখানে? জেগে কী করছে? লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে হয়।

সে ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই তালাটাকে দেখতে পেল। বাড়ি অন্ধকার এবং দরজায় তালা ঝুলছে। অর্থাৎ মা বাড়িতে নেই। বুক ভারি হল সপ্তমের। সে মাথা নাড়ল, এটাই স্বাভাবিক। পুলিসের কাছে মা যা শুনে এসেছে তারপরে বিবাগী হয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বিবাগী না হয়ে হয়ত দিদির বাড়িতে চলে গিয়েছে।

কিন্তু সে বাড়িতে ঢুকবে কী করে? তার ব্যাগটা? যাচ্ছলে! সপ্তম মনে করার চেষ্টা করেও পারল না, সে কোথায় ওটাকে ফেলে এসেছে। এক জামাপ্যান্টে কতক্ষণ সে থাকবে? তা ছাড়া তার বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে। এই বাড়ির একটা ঘরে তার নিজস্ব বিছানা আছে। তালাটা ভেঙে ভেতরে ঢোকা যায়। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। মা নিশ্চয়ই প্রতিবেশীর বাড়িতে চাবি রেখে যাবে না। কিন্তু তালা ভাঙবে কী করে? সে তালাটাকে পরীক্ষা করল। বেশ মজবুত তালা। মায়ের কথায় এটাকে সে কিনে এনেছিল চাঁদনি থেকে। একটা লোহার শিক থাকলে—। সপ্তম আশেপাশে তাকাল। এবং তখনই তার মনে পড়ল। রশিদের ডেরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করা হয়েছিল। যার বাইকে সে বউবাজারে গিয়েছিল, সে তাকে মোবাইলটা ফেরত দিয়েছিল। ওটা যে পকেটে পড়ে আছে তা তার খেয়ালেই ছিল না। কিন্তু মোবাইল দিয়ে তো তালা ভাঙা যায় না।

সে মোবাইল বের করে দেখল তাতে অনেকগুলো মিস্‌ড কল রয়েছে। অর্থাৎ কেউ এই নাম্বারে বারবার ফোন করেছিল, কিন্তু মোবাইলে রিঙ হয়নি। তারপর তার চোখে সাইলেন্ট শব্দটা পড়ায়, না হওয়ার কারণ বুঝতে পারল। মাধবিকার দাদা নির্দেশ দিয়েছিল রশিদের দেখা পাওয়া মাত্র এই বোতমটা চেপে ধরতে। অর্থাৎ তিনি মোবাইলটাকে সেইভাবে সেট করে দিয়েছিলেন, যাতে বোতামে চাপ পড়তেই তাঁর ওখানে রিঙ শুরু হয়।

সপ্তম মাধবিকার নাম্বার ডায়াল করল। রিঙ হচ্ছে। তৃতীয়বারেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো।'

'মাধবিকা! তুমি এখনও জেগে আছ?'

'মাই গড! তুমি কোথায়?' মাধবিকার গলায় উদ্বেগ।

'আমার বাড়ির সামনে। দরজায় তালা দেওয়া। ঢুকতে পারছি না। এত রাত্রে তোমাকে ফোন করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু তুমি জেগে আছ কেন?'

'আমি কী করি না করি তা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার। তাই না?'

'অবশ্যই। ঠিকই।'

'কী চাও তুমি?'

'নাথিং। এখন আর আমার চাওয়ার কিছু নেই।'

'তোমার কলগার্ল বান্ধবীরা জায়গা দেয়নি?'

'আমার কোনও কলগার্ল বান্ধবী নেই। রাসেল আমাকে যখন ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, তখন জানতাম না কোথায় যাচ্ছি। তোমার দাদা জোর করে সেখানে পাঠিয়েছিল ওই রশিদের খবর আনতে। আচ্ছা, রাখছি। এখন আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

'দাঁড়াও। ফোনটা করেছ তুমি। করে আমাকে ডিসটার্ব করেছ। আমি না বলা পর্যন্ত তুমি লাইন কেটে দেবে না।'

'বেশ বল!' ক্লান্ত গলায় বলল সপ্তম।

'তুমি এখানে চলে এসো।'

'কী? তুমি কী বলছ?'

'ঠিকই বলছি। প্লিজ। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'এত সব শুনেও তুমি আমাকে যেতে বলছ?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সপ্তম। তার মনে হচ্ছিল আর-একটা রসিকতায় তাকে জড়ানো হচ্ছে।

'হ্যাঁ। বলছি। আমি এখন আমার দাদাকে বিশ্বাস করি না। কীভাবে আসবে তা তুমি জানো। বাড়ির কাছাকাছি এসে ফোন করলে দরজা খুলে দেব।' রিসিভার রেখে দিল মাধবিকা।

মুহূর্তেই ক্লান্তি যেন অনেকখানি কমে গেল। গলি দিয়ে বড় রাস্তায় চলে এল সপ্তম। শুনসান রাস্তা। মাধবিকার বাড়ি শহরের অন্য প্রান্তে। এখন সব যানবাহন বন্ধ, শুধু ট্যাক্সি ভরসা। কিন্তু কোনও গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়ছে না। মিনিট দশেক দাঁড়াবার পর সে একটা মারুতিকে ছুটে যেতে দেখল। কলকাতার রাস্তায় গিয়ার পাঁচ নম্বরে তুলে গাড়ি চালবার সুযোগ ড্রাইভার ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত হাঁটা শুরু করল সপ্তম। খানিকটা এগোলেই গ্রে স্ট্রিট-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রসিং। তারপরই সোনাগাছি। ওখানে অনেক সময় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে।

দূর থেকেই সপ্তম দেখতে পেল সোনাগাছির সামনে কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। সে হতাশ হয়ে চারপাশে তাকাতেই একজন সেপাই যেন আকাশ থেকে সামনে নেমে এল, 'আপনি কে?'

'আমি সপ্তম।'

'এত রাত্রে এখানে কী করছেন?'

'খুব জরুরি দরকার, তাই ট্যাক্সি খুঁজছি।'

'কোথায় থাকেন?'

'ওপাশের গলিতে।'

'এখানে ট্যাক্সি পাবেন না আজ। সোনাগাছিতে খুব বড় রেইড হয়েছে। ট্যাক্সির দরকার হলে নিমতলায় চলে যান। এখানে দাঁড়াবেন না। সেপাই উপদেশ দিল।'

'নিমতলা?'

'শ্মশান চেনেন না? ওখানে পাবেন।' লোকটা হাত নাড়ল।

একজন সাধারণ পুলিস কী ভদ্রভাবে কথা বলল! লোকটা ওর জামার কলার চেপে ভ্যানে তুললে তার কিছু করার থাকত না। তার বদলে ট্যাক্সি পাওয়ার হদিস বলে দিল।

নিমতলায় পৌঁছতে প্রায় মিনিট পনের লাগল সপ্তমের। রাস্তায় কিছু কুকুর তাকে বিব্রত করা ছাড়া অন্য কোনও অসুবিধে হয়নি। শ্মশানবাড়ির সামনে গিয়ে তার চক্ষুস্থির। যেন মেলা বসেছে। দোকানপাট খোলা। প্রচুর লোকজন। কানে চিৎকার এল, 'চলে আসুন দাদাভাই, গরম গরম কচুরি আর তরকারি। শেষ হয়ে যাওয়ার আগে চেখে নিন।' অমনি খিদেটা ফিরে এল প্রবলভাবে। কোনও চিন্তা না করে দোকানে ঢুকে পড়ল সে। এখানে অন্য কোনও মেনু নেই বোধহয়, বসামাত্র কচুরির প্লেট টেবিলে এসে গেল। খেতে গিয়ে খুব সুস্বাদু হওয়া সত্ত্বেও তিনটের বেশি খেতে পারল না সপ্তম। সে চা চাইল।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'কেমন খেলেন?'

'ভাল। আপনাদের দোকান সারারাত খোলা থাকে?'

'সারাদিন সারারাত। চিত্রগুপ্ত আর আমরা ঘুমাই না। কত নম্বরে?'

'মানে?'

'আপনাদের বডির কথা জিজ্ঞেস করছি।'

অস্বস্তিতে পড়ল সপ্তম, 'আমি ঠিক জানি না।'

'আজ সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। একজন প্রমোটারের ডেডবডি এসেছে। সঙ্গে শ'খানেক লোক। তারাই এখন শ্মশান কন্ট্রোল করছে।'

'কোথাকার প্রমোটার?'

'ভি আই পি-র দিকের। বেশি বয়স নয়। মার্ডার কেস!'

ধক্ করে উঠল বুক। রাসেল নয় তো? রাসেল নামটা শুনে অবশ্য হিন্দু না খ্রিস্টান তা বোঝা যায় না। কিন্তু প্রমোটার মার্ডারড হয়েছে যখন, তখন রাসেল ছাড়া অন্য কারও সম্ভাবনা কম। দাম মিটিয়ে সে শ্মশানবাড়ির সিঁড়িতে পা দিল। প্রচুর ছেলে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা হলঘরে তখন চারটে মৃতদেহ শায়িত। প্রত্যেকের পাশে আত্মীয়স্বজনরা মুহ্যমান হয়ে বসে। রাসেলকে দেখতে পেল সপ্তম। দেখামাত্র সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। চোখমুখে এক ফোঁটা বিকৃতি নেই। খুব শান্ত ভঙ্গিতে যেন ঘুমাচ্ছে সে।

লোকটা ভাল ছিল। তার সঙ্গে কতটুকুই বা আলাপ, তবু তার মধ্যে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। ওর শেষ কথা মনে এল, 'পালান, কলকাতা থেকে পালান।' অথচ তখন ও জানত না পালানোর দরকার ছিল ওর নিজেরই। রাসেল সতর্ক করতে চেয়েছিল তাকে, কিন্তু নিজে সকর্ত হয়নি!

'শুনুন!'

গলা শুনে পেছন ফিরতেই সে একটি গম্ভীর মুখের যুবককে দেখতে পেল। যুবক তার সামনে এগিয়ে এল, 'আপনি এখানে?'

'কেন?' কী বলবে ঠাওর করতে পারল না সপ্তম।

'কী দেখতে এসেছেন? মরে যাওয়ার পর মানুষটাকে কেমন দেখায়, তাই?'

'কী বলছেন আপনি? রাসেল আমার বন্ধু ছিলেন।'

'আপনি এখান থেকে চলে যান। আমরা গুণ্ডা-বদমাশ নই। কিন্তু ওর মৃত্যুটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।' যুবক অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তার কথা শুনতে আরও কয়েকজন এগিয়ে এসেছিল। তারা এবার হিংস্র চোখে তাকাল সপ্তমের দিকে।

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' সপ্তম মিনমিন করল।

'আপনি ওকে হোটেল শাজাহানে যাওয়ার কথা বলেননি?' সুভাষদার জায়গাটা যে দখল করেছে তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার কথা বলেননি? যুবক তাকাল।

'না। কখনই না।' সজোরে মাথা নাড়ল সপ্তম।

'রাসেল সেই কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, আর ওর ডেডবডি পাওয়া গেল ক্যামাক স্ট্রিটের গাড়ির মধ্যে। ও সুভাষদার সহকর্মী ছিল বলে ওকে সরিয়ে দিল ওরা। আপনি এখান থেকে চলে যান।' যুবক বলা মাত্র একটা ঘুষি এসে পড়ল সপ্তমের ঘাড়ে। সে মাটিতে পড়ে গেল। চার-পাঁচটা হাত তখন প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই যুবক ওদের বাধা দিল। জোর করে সরিয়ে দিল। তারপর সপ্তমকে তুলে বলল, 'চলে যান এখান থেকে।'

নিজের শরীরের রক্ত আঙুল দিয়ে দেখল সপ্তম। গাল ফেটে গিয়েছে। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সামনে। দরজা খুলে উঠে পড়ল সে। ড্রাইভার মিটার ডাউন করে বলল, 'কোথায় যেতে হবে?'

'সাউথ ক্যালকাটা।' কোনওমতে বলল সে।

'কুড়ি টাকা এক্সট্রা লাগবে।'

কোনও কথা না-বলে মাথা দু'হাতে চেপে বসে রইল সপ্তম। গাড়ি চলছে। এখন রাতের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রুমালে ক্ষতস্থান মুছল সে। তার পরেই খেয়াল হল। সপ্তম ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি হোটেল শাজাহান চেনেন?'

'চিনি।'

'প্রথমে ওখানে চলুন।'

পনের মিনিটের মধ্যে নিউ মার্কেটের আশেপাশে একটা গলিতে ট্যাক্সি ঢুকে যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তার গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলছে, হোটেল শাজাহান। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে সে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। আশপাশের সব বাড়ির মত হোটেলও অন্ধকার। মূল দরজা বন্ধ। তবু বেল টিপল সে। রাতের নির্জনতা খান খান করে বেল বাজছে। দ্বিতীয়বারের পর ভেতরের আলো জ্বলল। একজন ঘুম-চোখে দরজা খুলে চিৎকার করল, 'কী চাই?'

'ঘর চাই।'

'এখন হোটেল বন্ধ। সকালে আসুন।'

'হোটেল কখনই বন্ধ হতে পারে না। ঝামেলা না করে একটা ঘর দিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল, 'আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?'

'আমি মালেকভাই-এর লোক।'

লোকটা চমকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, 'ওই নামের কাউকে আমি চিনি না।'

'খুব ভাল করে চেনেন। ওর রুমে ফোন করুন।'

'পাগল নাকি। এখন ফোন করলে আমার লাশ পড়ে যাবে।'

'আমার নাম বলবেন। বলবেন আপনার লোক রুম চাইছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এগার নাম্বার রুমে চলে যান। দোতলায় উঠেই বাঁদিকের প্রথম দরজা। কাল সকালে খাতা পাঠিয়ে দেব। উঃ যত্ত সব ঝামেলা।'

'দাঁড়ান, স্যুটকেস নিয়ে আসি।'

লোকটা মাথা নাড়তেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল সপ্তম। ট্যাক্সির দরজা খুলে মোবাইলের সেই নাম্বারটা বের করে বোতাম টিপল। রিঙ হচ্ছে। হচ্ছে তো হয়েই যাচ্ছে। এদিকে লোকটা তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে। শেষ পর্যন্ত গলা পেল সপ্তম, 'হ্যালো কে?'

'আমি সপ্তম। কলকাতার ডনকে যদি ধরতে চান তাহলে নিউ মার্কেটের পাশে হোটেল শাজাহানে চলে আসুন। এখনই।' সপ্তম দ্রুত বলল।

'কে ওখানে? রশিদ?'

'মালেক। কুইক।'

ওদিকে লোকটা চেঁচাল, 'কী হল?'

জানলা দিয়ে মুখ বের করে সপ্তম বলল, 'চেঞ্জ দিতে পারছে না।'

'কত?'

'পাঁচশ।'

লোকটা ঘুরে ভেতরে যাওয়ামাত্র সপ্তম বলল, 'গাড়ি ঘোরান।'

ড্রাইভার অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'অ্যাঁ।'

'গাড়ি ঘোরান, চটপট।' লোকটাকে আবার দেখা গেল।

সপ্তম জানলা দিয়ে মুখ বের করল, 'পাঁচ মিনিট, লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে চেঞ্জ করিয়ে আসছি। যাব আর আসব।'

গাড়ি ততক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকে চলেছে। সেখানে পৌঁছে একটা ছায়া-ছায়া জায়গায় গাড়িটাকে রাখতে বলল সে। এবার ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মতলব কী বলুন তো? তখন থেকে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছেন।'

'উপায় নেই। এখনই পুলিস আসবে। এলেই আমরা চলে যাব।' সপ্তম বলল।

'পুলিস?' ড্রাইভার হতভম্ব, 'দাদা, আপনি নেমে যান। আমি কোনও ঝামেলায় পড়তে চাই না।'

'আমি থাকলে আপনার কোনও ঝামেলা হবে না।' সপ্তম বলতে বলতেই দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেল। দু-দুটো গাড়ি এগিয়ে এসে হোটেল শাজাহানের গলিতে ঢুকছে। গাড়ি দুটো পুলিসের।

সপ্তম মাথা নাড়ল। 'চলুন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরুন।'

এই সময় সপ্তমের পকেট রাখা মোবাইল শব্দ করে উঠতেই বোতাম টিপল সে। মাধবিকার দাদার গলা, 'তুমি কোথায়?'

'কেন?'

'শাজাহান হোটেলের কত নম্বরে আছে লোকটা? এই সময় সব রুম সার্চ করা ঠিক হবে না।'

'যে লোকটা দরজা খুলেছে, তাকে রগড়ালেই রুম নাম্বার জেনে যাবেন।'

'তুমি এখন কোথায়?' চিৎকার শোনা গেল।

'জাহান্নামে।'

ওপাশ থেকে লাইন কেটে দেওয়া হল।

মাধবিকার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ওকে ফোন করতেই সে রিসিভার তুলল, 'তুমি এসে গিয়েছ?'

'হ্যাঁ। প্রায়।'

'ট্যাক্সিতে?'

'হ্যাঁ।'

'ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হেঁটে এসো।'

আদেশ মান্য করল সপ্তম। ইমরানের দেওয়া টাকায় ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এল মাধবিকার বাড়ির সামনে। তখন আকাশ পরিস্কার হতে চলেছে। অন্ধকার রয়েছে বড় বড় বাড়িগুলোর গায়ে গায়ে।

একটু পরেই মাধবিকাকে দেখতে পেল সে। ওর শরীরে রাতের পোশাক। হাতে একটা বড় ব্যাগ। সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা সপ্তমের হাতে তুলে দিল মাধবিকা।

'কী আছে এতে?'

'যা তোমার এখন প্রয়োজন। এখনই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে যাও। ভোরবেলায় ফলকনামা এক্সপ্রেস ছাড়ে। টিকিট কেটে উঠে পড়বে। ভাইজাগ স্টেশনে নেমে সোজা সমুদ্রের ধারে চলে যাবে। ওখানে গঞ্জালেসের গেস্টহাউসে গিয়ে আমার নাম বলবে। অন্তত তিন মাস তোমাকে ওখানে থাকতে হবে। ভুলেও শহরে যাবে না। এই তিন মাসে এখানকার হাওয়া ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। আর দেরি করো না।' মাধবিকা দ্রুত বলে গেল।

'গঞ্জালেস তোমাকে চেনে?'

'হ্যাঁ। বুড়ো আমাকে খুব স্নেহ করে। আমি একটু পরেই ফোন করে ওকে বলে দেব।'

'কিন্তু এতদিন থাকার টাকা—'

'আঃ। আর দেরি করো না যাও।' বিরক্ত হল মাধবিকা। তারপর ভেতরে ঢুকে গেল। আলো ফুটছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ট্যাক্সি পেয়ে গেল সপ্তম।

ভোরের ফলকনামা এক্সপ্রেস হাওড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সদর্পে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিড়জমাট কামরায় কোনওমতে বসার জায়গা পেয়েছিল সপ্তম। সে জানলা দিয়ে বাইরের চেনা পৃথিবীটাকে ক্রমশ অচেনা হতে দেখল। তার কোলের ওপর মাধবিকার ব্যাগ। ওই ব্যাগে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। দশ হাজারের পাঁচটা বাণ্ডিল। একটা তোয়ালে, টুথব্রাশ, সাবান, পেস্ট। চোখ বন্ধ করল সে। এত টাকা এককথায় দিয়ে দিল মাধবিকা।

সে যে নির্বাসনে চলেছে তা এই পৃথিবীর আর কেউ জানবে না। মাধবিকা জানল। যেন আকাশের মেঘ নিচু হয়ে পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করে থাকল। এটুকুই ভরসা।